মুসলিম সাহিত্য সমাজ-এর বার্ষিক অধিবেশন

সভাপতিদের অভিভাষণ

হাবিব রহমান সম্পাদিত

মুসলিম সাহিত্য সমাজ-এর বার্ষিক অধিবেশন : সভাপতিদের অভিভাষণ

বিশের দশকের শেষ দিকে ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয় 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' (১৯২৬)। বাঙালি মুসলমান সমাজে প্রগতিশীল ও আধুনিক চিন্তাধারা বিকাশের ক্ষেত্রে সংগঠনটি পথিকৃতের ভূমিকা পালন করে। 'মুক্ত বুদ্ধির চর্চা' মুসলিম সাহিত্য সমাজ তার আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে। সমাজের সভ্যরা 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলন গড়ে তোলেন। আবুল হুসেন, কাজী আবদুল ওদুদ, কাজী মোতাহার হোসেন, আনোয়ারুল কাদির, মোতাহের হোসেন চৌধুরী, আবুল ফজল, আবদুল কাদির, শামসুল হুদা প্রমুখ মনীষী ছিলেন এ আন্দোলনের প্রাণপুরুষ। সাহিত্য সমাজের আয়ুষ্কাল ছিল দশ বছর (১৯২৬-১৯৩৬)। একাল পরিসরে সমাজের দশটি বার্ষিক অধিবেশনের অভ্যর্থনা সমিতির ও সাধারণ সভাপতির অভিভাষণ সংকলিত হয়েছে এ গ্রন্থে। সমাজ, সাহিত্য, শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে সে কালের বাংলার মুসলিম বুদ্ধিজীবী মহলের প্রাগ্রসর ধ্যান-ধারণা ও সর্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় মেলে এসব অভিভাষণে।

www.pathagar.com

হাবিব রহমান যশোর জেলার চৌগাছার জগদীশপুর গ্রামে ১৯৫৩-তে জন্মগ্রহণ করেন। খুলনা সরকারি বি. এল. কলেজ থেকে ১৯৭৭-এ বি. এ. অনার্স (বাংলা) এবং রাজশাহী বিশবিদ্যালয় থেকে ১৯৭৯-তে এম. এ. (বাংলা) পাস করেন। 'মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলীর চিন্তাধারা' শীর্ষক গবেষণা-অভিসন্দর্ভ রচনা করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচ. ডি. ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভগের সহযোগী অধ্যাপক। হাবিব রহমান, একজন গবেষক। বাংলার সামাজিক ইতিহাস এবং বাঙালি মুসলমান সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীদের জীবন ও চিন্তাধারা তাঁর গবেষণার বিষয়। প্রকাশিত গ্রন্থ : মোতাহের হোসেন চৌধুরী (১৯৯২), বাংলা ছন্দ ও অলঙ্কার (১৯৯৪) ও মোহম্মদ বরকতুল্লাহর জীবন ও সাহিত্যসাধনা (১৯৯৯)।

গসা
৪

www.pathagar.com

মুসলিম সাহিত্য সমাজ-এর বার্ষিক অধিবেশন
সভাপতিদের অভিভাষণ

www.pathagar.com

www.pathagar.com

মুসলিম সাহিত্য সমাজ-এর বার্ষিক অধিবেশন
সভাপতিদের অভিভাষণ

হাবিব রহমান
সম্পাদিত

বাংলা একাডেমী ঢাকা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

আমার গবেষণা-তত্ত্বাবধায়ক
কবি-গীতিকার-গবেষক
মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান
শ্রদ্ধাস্পদেষু

www.pathagar.com

www.pathagar.com

কথামুখ

বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী ও মোহম্মদ বরকতুল্লাহ সম্পর্কে পি-এইচ. ডি গবেষণা করতে গিয়ে মুসলিম সাহিত্য সমাজের দুটি বার্ষিক অধিবেশনে (নবম ও অষ্টম) প্রদত্ত তাঁদের সভাপতির অভিভাষণ পড়ে আমি মুগ্ধ ও অভিভূত হই। আমার মনে তখনই সাহিত্য সমাজের বাকি আটটি বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতিদের ভাষণ পড়ার প্রবল ইচ্ছা জাগে এবং আমি নানা সূত্র থেকে সে-সব ভাষণ সংগ্রহ করি। একই সঙ্গে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিদের ভাষণ যা পাই তাও সংগ্রহ করে রাখি। গবেষণা শেষ করে মুসলিম সাহিত্য সমাজের চিন্তা-দর্শনের আলোকে ভাষণগুলি নিয়ে সমীক্ষাধর্মী একটি প্রবন্ধ রচনার পরিকল্পনা করি এবং এ বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক আমার সতত শুভার্থী ড. সৈয়দ আকরম হোসেনের সঙ্গে কথা বলি। তিনি আমাকে প্রবন্ধটি লিখতে উৎসাহ দিয়ে পরামর্শ দেন যে ভাষণগুলি যখন সংগ্রহ করা হয়েছে তখন এগুলি সংকলন করে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হবে। কেননা পাঠক কেবল ভাষণগুলি পড়ারই সুযোগ পাবেন না, এগুলি বিলুপ্তির হাত থেকেও রক্ষা পাবে। তাঁর এ পরামর্শ আমার কাছে খুবই মূল্যবান মনে হয় এবং সে-লক্ষ্যে কাজ শুরু করি। অকুণ্ঠভাবে স্বীকার করব আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন সৈয়দ আকরম হোসেনের পরামর্শের ফসল এ বই। তিনি পরামর্শ না দিলে ভাষণগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশের চিন্তা আমার মাথায় কখনো আসত কি না জানি না। এই সুযোগে তাঁকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাই।

সংকলনের প্রারম্ভে মুসলিম সাহিত্য সমাজের জন্মেতিহাস ও চিন্তা-দর্শন সম্পর্কে পাঠককে একটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু অত্যাবশ্যক ধারণা দিতে চেষ্টা করেছি এবং তারই আলোকে ভাষণগুলি সমীক্ষার প্রয়াস পেয়েছি। সমীক্ষাটি সংকলনের শেষে যোজিত হয়েছে।

অভিভাষণগুলির প্রথম পাঁচটি সংগ্রহ করেছি 'শিখা' থেকে। ষষ্ঠ অধিবেশনের অভ্যর্থনা সভাপতির ভাষণ আবুল হুসেন রচনাবলী (১ম খণ্ড) ও সভাপতির ভাষণ আবদুল কাদির সম্পাদিত 'জয়ন্তী' পত্রিকা থেকে পেয়েছি। সপ্তম বর্ষের অভ্যর্থনা-সভাপতির ভাষণ সংগ্রহ করা যায় নি, সভাপতির ভাষণ অসমাপ্ত অবস্থায় পাওয়া গেছে 'বুলবুল' পত্রিকায়। অষ্টম বর্ষেরও অভ্যর্থনা-সভাপতির ভাষণ পাওয়া যায় নি, সভাপতির ভাষণটি নেওয়া হয়েছে বাংলা একাডেমী প্রকাশিত মোহম্মদ বরকতুল্লাহ রচনাবলী থেকে। নবম বর্ষের অভ্যর্থনা সভাপতির ভাষণ আংশিক পাওয়া গেছে 'বুলবুল'-এ, আর সভাপতির ভাষণ মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলীর রচনাবলী থেকে গৃহীত হয়েছে। দশম বর্ষের উভয় সভাপতির ভাষণ নেওয়া হয়েছে 'বুলবুল' থেকে।

ঢাকার বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন সম্পর্কে 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ : সমাজচিন্তা ও সাহিত্যকর্ম' নামে প্রকাশিত একটি শ্রমসাধ্য, বিস্তৃত ও উল্লেখযোগ্য গবেষণা করেছেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক আমার শিক্ষক ড. খোন্দকার সিরাজুল

www.pathagar.com

হক। বিশিষ্ট পণ্ডিত শিবনারায়ণ রায় তাঁর 'A new Renaissance' গ্রন্থের 'The sikha movement
(1927-32) : A note on the Bengali muslim intelligentsia in search of modernity' শীর্ষক প্রবন্ধে মন্তব্য করেছেন যে, এ আন্দোলন নিয়ে আরও কাজ করার অবকাশ ও প্রয়োজন এখনো রয়েছে। আমি এ মন্তব্যের সঙ্গে সহমত পোষণ করি এবং কিছুটা দ্বিধার সঙ্গে দাবি করি আমাদের এ কাজটি ঐ প্রয়োজন কিছুটা হলেও হয়তো মেটাবে।

শেষে আরেকটি ঋণ স্বীকার না করলে অপরাধবোধে পীড়িত হব। ষষ্ঠ বর্ষের সভাপতির ভাষণটি 'জয়তী' পত্রিকা থেকে আমাকে দিয়েছিলেন কবি আবদুল কাদিরের পুত্র প্রফেসর সিকান্দার দারাশিকোহ। তিনি সাহায্য না করলে এ ভাষণটি সংগ্রহ করা আমার পক্ষে হয়তো সম্ভব হতো না। তাকে আমার ধন্যবাদ জানাই।

চিন্তার ক্ষেত্রে প্রথাগত আমাদের এই সমাজে যুক্তি ও বুদ্ধিনির্ভর দৃষ্টিভঙ্গি গঠনে এ বই যদি কিছুটা ভূমিকা রাখতে পারে তবে এর প্রকাশনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলের শ্রম সফল হবে।

বাংলা বিভাগ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়
কুষ্টিয়া।

হাবিব রহমান

www.pathagar.com

সূচিপত্র

মুসলিম সাহিত্য সমাজ : জন্মেতিহাস ও চিন্তা-দর্শন ১১
প্রথম বার্ষিক অধিবেশনের অভ্যর্থনা-সভাপতির অভিভাষণ ৩৯
প্রথম বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতির অভিভাষণ ৪৩
দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনের অভ্যর্থনা-সভাপতির অভিভাষণ ৫২
দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতির অভিভাষণ ৫৪
তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশনের অভ্যর্থনা-সভাপতির অভিভাষণ ৬৬
তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতির অভিভাষণ ৭১
চতুর্থ বার্ষিক অধিবেশনের অভ্যর্থনা-সভাপতির অভিভাষণ ৮১
চতুর্থ বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতির অভিভাষণ ৮৩
পঞ্চম বার্ষিক অধিবেশনের অভ্যর্থনা-সভাপতির অভিভাষণ ৯৭
পঞ্চম বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতির অভিভাষণ ১০১
ষষ্ঠ বার্ষিক অধিবেশনের অভ্যর্থনা-সভাপতির অভিভাষণ ১০৭
ষষ্ঠ বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতির অভিভাষণ ১১১
সপ্তম বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতির অভিভাষণ ১১৪
অষ্টম বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতির অভিভাষণ ১২১
নবম বার্ষিক অধিবেশনের অভ্যর্থনা-সভাপতির অভিভাষণ ১২৯
নবম বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতির অভিভাষণ ১৩০
দশম বার্ষিক অধিবেশনের অভ্যর্থনা-সভাপতির অভিভাষণ ১৪১
দশম বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতির অভিভাষণ ১৪৪
অভিভাষণ সমীক্ষা ১৫১

www.pathagar.com

www.pathagar.com

মুসলিম সাহিত্য সমাজ : জন্মেতিহাস ও চিন্তা-দর্শন

মুসলিম বুদ্ধিবৃত্তিক চিন্তার ইতিহাসে ঢাকার 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ'-এর একটি বিশেষ ও স্বতন্ত্র স্থান আছে। আর বাঙালি মুসলমানের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসে সংগঠনটির রয়েছে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। ঢাকায় এটি সত্যিই ছিল 'a new school of thought.'[১] ঐতিহাসিক তাই সঙ্গতভাবেই বিবেচনা করেছেন, " The establishment of the Muslim Sahitya Samaj in Dacca in 1926 was a memorable event in the history of the advancement of Bengali Muslim society."[২] এই সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা ইসলাম ধর্মে বিশ্বাস স্থাপন করেই ইসলাম ও মুসলমান সমাজের যেসব বিধি-বিশ্বাস-প্রথা-সংস্কার তাদের নিজেদের সম্প্রদায়ের এবং একই সঙ্গে সমাজ ও দেশের উন্নতি-প্রগতির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছিল সেগুলিকে যুক্তি ও বুদ্ধির আলোয় বিচার-বিশ্লেষণ করে দূর করতে চেয়েছিলেন। তারা বিশ্বাস করতেন এ না হলে মুসলমান সমাজের কোনো উন্নতি তো হবেই না, উপরন্তু ইসলামের মতো একটি বিপ্লবমূলক ধর্ম নির্দিষ্ট ঘেরাটোপের মধ্যে গতিহীন হয়ে পড়ে থাকবে।

মোতাজেলা সম্প্রদায়ের উদ্ভবের পর থেকে অদ্যাবধি যে-সমস্ত বুদ্ধিনির্ভর চিন্তাবিদ ইসলাম ও মুসলমানের কল্যাণচিন্তা করেছেন তাদের ভাবনা মূলত ঐ একই ধারায় প্রবাহিত হয়েছে। প্রসিদ্ধ দার্শনিক আল-রাজি (৮৬৫-৯২৫), জামাল উদ্দীন আফগানী (১৮৩৯-১৮৯৭), মুফতি মুহম্মদ আবদুহ (১৮৪৯-১৯০৫), ভারতবর্ষের সৈয়দ আমির আলী (১৮৪৯-১৯২৮), স্যার সৈয়দ আহমদ (১৮১৭-১৮৯৮), মওলানা আবুল কালাম আজাদ (১৮৮৮-১৯৫৮), ড. মুহম্মদ ইকবাল (১৮৭৩-১৯৩৮) প্রমুখ চিন্তাবিদ যুক্তি ও বুদ্ধির সাহায্যে ইসলামকে বুঝতে চেয়েছেন এবং সেই আলোকে তাকে যুগানুগ করে মুসলমান সম্প্রদায়ের উন্নতির সম্ভাবনা দেখেছেন। ঢাকার মুসলিম সাহিত্য সমাজের কর্ণধার ও প্রধান লেখক যারা ছিলেন তাদের চিন্তাও প্রায় ঐ একই খাতে প্রবাহিত ছিল।

তবে অন্তত দুটি ক্ষেত্রে ঢাকার চিন্তাবিদদের স্বতন্ত্র বিশেষত্ব ছিল। প্রথমত তারা কেবল শাস্ত্রকেন্দ্রিক চিন্তাভাবনা করেন নি, বরং "...শাস্ত্রের কথা ও শাস্ত্র-নিরপেক্ষ বাণী উভয়কেই তারা মর্যাদা দিয়েছিলেন মানববাদের মাপকাঠিতে বিচার করে।"[৩] দ্বিতীয়ত যে-চিন্তা তারা করেছিলেন, তার দ্বারা সমাজ রূপান্তরের সম্ভাবনার ক্ষেত্রে তারা সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার আত্যন্তিক প্রয়োজন বোধ করেছিলেন। সেই লক্ষ্যে গঠিত হয়েছিল এই সমাজ। সংগঠনের নেতৃবৃন্দ তাদের চিন্তা উপলব্ধিকে আন্দোলনের রূপ দিয়ে সমাজ-মানসে প্রবিষ্ট করাতে চেয়েছিলেন। এই আন্দোলনের নাম তারা দিয়েছিলেন বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন। অন্তত এক দশক কাল পর্যন্ত তারা তাদের প্রচেষ্টা নানা প্রতিকূলতার মধ্যে অব্যাহত রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। বাংলার বাইরে আর কোথাও ইসলামের মূল ভিত্তি আল্লার একত্ব, রসুল ও প্রেরিতত্ব-এর উপর বিশ্বাস বজায় রেখে মুসলিম সমাজের যুগোপযোগী রূপান্তরের সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা হয় নি।

www.pathagar.com

মুসলিম সাহিত্য সমাজ দশ বছরের কিছু অধিককাল টিকে ছিল। এই সময়সীমার মধ্যে এর পঞ্চাশটির অধিক সাধারণ অধিবেশন ও দশটি বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়।[৪] অধিবেশনগুলিতে বিভিন্ন বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ, পঠিত প্রবন্ধের উপর আলোচনা, আবৃত্তি, গান ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হতো। বার্ষিক অধিবেশনে শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ও সাধারণ সভাপতির দায়িত্ব পালনের জন্য আহ্বান জানানো হতো। তাদের বক্তৃতার সঙ্গে থাকত প্রবন্ধ পাঠ ও আলোচনা। এসব বক্তৃতা ও প্রবন্ধ, বার্ষিক কার্যবিবরণী ইত্যাদি সাহিত্য সমাজের বার্ষিক মুখপত্র 'শিখা'য় প্রকাশ করা হতো। আর্থিক সামর্থ্যের অভাবে 'শিখা'র পাচঁটির বেশি সংখ্যা প্রকাশ করা সম্ভব হয় নি।

বর্তমান আলোচনায় মুসলিম সাহিত্য সমাজের বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও চিন্তা-দর্শনের মোটামুটি একটি পরিচয় তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে এবং এই চিন্তা-দর্শনের আলোকে সভাপতিদের ভাষণসমীক্ষার প্রয়াস পাওয়া হয়েছে অন্য আলোচনাটিতে। বিংশ শতাব্দীর বিশ ও ত্রিশের দশকে সাহিত্য সমাজের লেখক-কর্মীরা যা ভেবেছিলেন এবং যা করতে চেয়েছিলেন তার প্রয়োজন আজও ফুরিয়ে যায় নি। এবং অনেক ক্ষেত্রে সে-প্রয়োজন বড় বেশি দেখা যাচ্ছে বলে আমাদের ধারণা। সাহিত্য সমাজের কর্মী ও লেখক আবুল ফজলের (১৯০৩-১৯৮৩) এ প্রসঙ্গে উক্ত একটি সত্যগর্ভ মন্তব্য এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে :

> সাহিত্য সমাজের জন্ম থেকে প্রায় চল্লিশ বছর গত হতে চল্লো এর মধ্যে দেশের উপর দিয়ে ওলট-পালটের কত হাওয়াই না বয়ে গেছে। আমূল পরিবর্তন ঘটেছে রাজনীতি ক্ষেত্রে, অবিশ্বাস্যভাবে রদবদল হয়েছে সামাজিক জীবনে, খুলে গেছে সুযোগ-সুবিধার এন্তার পথ। তবুও চিন্তার ক্ষেত্রে আমাদের কি অগ্রগমন হয়েছে? ঘটেছে কি কোনো পরিবর্তন? সাহিত্যেও এমন কোনো রচনা কি লেখা হয়েছে যাতে প্রতিফলন ঘটেছে নতুন চিন্তার? বিশেষত প্রগতিশীল আধুনিক সমাজ গঠনের জন্য যে গতিশীল চিন্তা আর দুঃসাহসিক পদক্ষেপ প্রয়োজন তা তো আজ দুর্নিরীক্ষ্য। চিন্তায় ও ভাবে গতানুগতিক আর সনাতনী অথচ বাহ্যিক জীবন যাপনে আধুনিক ও প্রগতিশীল। ... আমাদের সমাজ আজো এ এক স্ববিরোধিতার শিকার নয় কি? মুসলিম সাহিত্য সমাজ চেয়েছিল সমাজকে স্ববিরোধিতার হাত থেকে বাঁচাতে, চিন্তার ক্ষেত্রেও তাকে আধুনিক ও গতিশীল করে তুলতে।[৫]

আবুল ফজল এই কথাগুলি লিখেছিলেন আজ থেকে পয়ত্রিশ বছর আগে। তখনো চিন্তার ক্ষেত্রে মুসলিম-মানসের কোনো অগ্রগমন ঘটে নি, অন্তত আশাব্যঞ্জক কোনো পরিবর্তন লক্ষণীয় হয়ে ওঠে নি। জীবনযাত্রায় ও জীবন-চেতনায় তারা তখনো স্ববিরোধিতার শিকার। সাহিত্য সমাজের জন্মের পৌনে এক শতাব্দী পর আবুল ফজলের এই উপলব্ধি আজ কি আরও বেশি মাত্রায় সত্য নয়? অথচ এর মধ্যে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ব বাংলায় ঘটে গেছে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে নয়া উপনিবেশবাদী পাকিস্তানী দুঃশাসনের অবসান ঘটিয়ে অর্জিত হয়েছে স্বাধীন বাংলাদেশ। কিন্তু দুঃশাসনের অবসান কি ঘটেছে? আত্মসর্বস্ব, দলকেন্দ্রিক, জ্ঞান ও প্রজ্ঞাহীন রাজনীতির যে-স্বাভাবিক ও অনিবার্য পরিণতি ঘটে তারই চিহ্ন দেশের সর্বক্ষেত্রে দৃশ্যমান। লোভ, সন্ত্রাস, পৈশাচিকতা, মিথ্যাচার, অনৈতিকতা প্রভৃতি তামসিকতা সমাজের একটি ক্ষুদ্র শ্রেণীকে সকল কিছুর নিয়ন্ত্রক করে তুলেছে, আর অন্যদিকে ব্যাপক জনগোষ্ঠির জীবন হয়ে পড়েছে মূল্যহীন। তাদের কোনো আশা নেই, স্বপ্ন নেই, নিরাপত্তা নেই। ব্যক্তিগত শূন্যতাবোধ ও নাগরিক জীবনের নানাবিধ

www.pathagar.com

টানাপোড়েনে স্বভাবতই যা ঘটে, বিভিন্ন রকম টেনশনের সঙ্গে লড়াইয়ের মাধ্যমে হয়ে ওঠে ধর্ম—এ দেশের ব্যাপক জনগোষ্ঠির ক্ষেত্রেও তা–ই ঘটছে, পুনরুত্থিত হচ্ছে ধর্মের আবেগাশ্রিত এক আদল।[৬] একে ব্যবহার করতে সতত সচেষ্ট রয়েছে ধর্মকেন্দ্রিক রাজনৈতিক ও অন্য বহুবিধ সংগঠন। আর তাতে মদদ যোগাচ্ছে আধিপত্যবাদী বৈদেশিক শক্তি।

এ অবস্থায় মানুষের চৈতনিক পরিচর্যার ক্ষেত্রে বিবেকবান লেখক–বুদ্ধিজীবীদের যে–ভূমিকা রাখা উচিত এ দেশে তার শোচনীয় অভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আমাদের লেখক–বুদ্ধিজীবীরাও সাধারণভাবে আদর্শহীনতার স্রোতে ভাসমান। অনেকেই সত্যোচ্চারণে সাবধানী, তাই কুণ্ঠিত। যাদের মধ্যে যথেষ্ট সাহসিকতা ছিল ও আছে তাদের কেউ কেউ গঠনমূলক বক্তব্য প্রকাশের চেয়ে এমন এমন কথা বলেছেন যা প্রতিক্রিয়াশীলদের ঐক্যবদ্ধ ও শক্তি সঞ্চয়ে সাহায্য করেছে। বাস্তবতাকে এরা অনুধাবন করতে পেরেছেন বলে মনে হয় না।

আদর্শবর্জিত দিকদেশহীন আজকের বাংলাদেশে আদর্শভিত্তিক প্রগতিশীল বৌদ্ধিক চিন্তার গুরুত্ব যে–কোনো শুভবোধসম্পন্ন মানুষ স্বীকার করবেন। এই জরুরি প্রয়োজনের ক্ষেত্রটিতে মুসলিম সাহিত্য সমাজের চিন্তাধারা অনেকখানি আলোক সম্পাতের কাজ করতে পারে বলে আমাদের বিশ্বাস। আমাদের বর্তমান প্রয়াসের সেটিই লক্ষ্যবিন্দু।

দুই

১৯২৬ সালের ১৯শে, মতান্তরে ১৭ই জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলিম হল ইউনিয়ন কক্ষে কতিপয় শিক্ষক–ছাত্রের উদ্যোগে মুহম্মদ শহীদুল্লাহর (১৮৮৫–১৯৬৯) সভাপতিত্বে মুসলিম সাহিত্য সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়।[৭] সভায় পাঁচজন ব্যক্তির উপর সাহিত্য সামাজের পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। এরা হলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি ও বাণিজ্য বিভাগের অধ্যাপক আবুল হুসেন (১৮৯৭–১৯৩৮), মুসলিম হলের ছাত্র এ. এফ. এম আবদুল হক, ঢাকা ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজের ছাত্র আবুয্‌যোহা নূর আহমদ (১৯০৭–১৯৭৩), ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজের ছাত্র আনোয়ার হোসেন ও আবদুল কাদির (১৯০৬–১৯৮৪)।[৮] এরাই ছিলেন প্রথম বছরের কর্মী–সংসদের সদস্য। উল্লেখ্য যে এই সংগঠনের কোনো সভাপতি ছিলেন না, তবে সম্পাদক ছিলেন। প্রথম বছর আবুল হুসেনকে সম্পাদকের দায়িত্ব দেয়া হয়। এছাড়া এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন ও সবরকম দায়িত্ব পালন করতেন ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজের অধ্যাপক কাজী আবদুল ওদুদ (১৮৯৪–১৯৭০), কাজী আনোয়ারুল কাদির (১৮৮৭–১৯৪৮) এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেন (১৮৯৭–১৯৮১)। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক শ্রেণীর ছাত্র আবুল ফজলও (১৯০৩–১৯৮৩) প্রথম থেকে এই সংগঠনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন।

মুসলিম সাহিত্য সমাজের সূচনা সভায় যারা বক্তব্য রেখেছিলেন তারা সবাই সমাজের অগ্রগতির জন্য সাহিত্যচর্চার আবশ্যকতার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। সাহিত্য সমাজের ভাবযোগী বলে অভিহিত কাজী আবদুল ওদুদ সাহিত্যচর্চায় শক্তিমান হওয়ার জন্য জ্ঞানচর্চার প্রতি বিশেষ জোর দেন।[৯] সমাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা পরে নানা উপলক্ষে এর

www.pathagar.com

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন। সংগঠনের অন্যতম কর্ণধার আবুল হুসেন বলেন, "এই সমাজের প্রধান উদ্দেশ্য চিন্তা চর্চা ও জ্ঞানের জন্য আকাঙ্ক্ষা ও রুচি সৃষ্টি এবং তদুদ্দেশ্যে জাতিধর্ম নির্বিশেষে নবীন পুরাতন সর্ব প্রকার চিন্তা ও জ্ঞানের সমন্বয় ও সংযোগ সাধন।"[১০]

প্রথম দিকে সাহিত্য সমাজের কোনো গঠনতন্ত্র ছিল না। ১৯৩০ সালের সেপ্টেম্বরে সংগঠনটির চৌদ্দটি নিয়ম প্রবর্তন করা হয়। দুই নম্বর নিয়মে প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়—সত্যপ্রীতি ও সাহিত্যচর্চা।[১১] সাহিত্য সমাজের উদ্দেশ্য সম্পর্কে এ সব বক্তব্য ও তথ্য থেকে বোঝা যায় সাহিত্যকে তারা নান্দনিক অর্থে গ্রহণ না করে একটি বৃহত্তর অর্থে গ্রহণ করেছিলেন, যাতে নিহিত ছিল সর্বাঙ্গীণ কল্যাণবোধ।

মুসলিম সাহিত্য সমাজের জন্ম কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়। জীবন-বাস্তবতার অনিবার্য তাগিদে বাঙালি মুসলমান সমাজ হিন্দু সমাজের তুলনায় দেরিতে হলেও এক সময় জেগে ওঠার প্রয়োজন বোধ করে। উনিশ শতকের শেষ চতুর্থাংশ থেকে তাদের সেই জাগরণ প্রয়াসের শুরু। জেগে উঠে আত্মোন্নয়ন ও সমাজোন্নয়নের জন্য তারা যা-যা করণীয় ভেবেছেন তার অন্যতম হচ্ছে মাতৃভাষায় সাহিত্যচর্চা করা। সাহিত্যচর্চা বলতে সবাই অবশ্য একরকম বোঝেন নি। কেউ চেয়েছেন ইসলামের ধর্মতত্ত্ব ও গৌরবময় ইতিহাসের ব্যাখ্যান ও বিবরণ, কেউ চেয়েছেন রসসৃষ্টি, আবার কেউ-বা চেয়েছেন খোলা দৃষ্টিতে যুক্তি ও বুদ্ধির আলোয় জগৎ-জীবনকে অধ্যয়ন-পর্যবেক্ষণ ও তার সহজবোধ্য রূপায়ন। সাহিত্য সমাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা মোটের উপর ছিলেন এই শেষোক্ত মতাদর্শের অনুসারী, যদিও তাদের কেউ কেউ সৃজনশীল রসসাহিত্যের চর্চাও করেছিলেন। ঢাকায় এরা যে সংঘবদ্ধ হতে পেরেছিলেন তার প্রধান কারণ ছিল ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা।

যারা সাহিত্য সমাজের প্রাণস্বরূপ ছিলেন তারা সকলেই চাকরিসূত্রে ঢাকা এসেছিলেন। এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যক্তিরাও ঢাকার বাইরে থেকে এসেছিলেন। কিন্তু যেখান থেকেই আসুন শিক্ষিত বাঙালি মুসলমানের অনেকেই তখন মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় উৎকণ্ঠ। আবুল ফজল ঢাকার মুসলিম অধ্যাপকদের সম্পর্কে লিখেছেন, "ঢাকায় তখন যে-সব মুসলমান অধ্যাপক ছিলেন তাঁরা প্রায় সবাই ছিলেন স্ব-সমাজ সম্বন্ধে সচেতন—সাহিত্যের ভিতর দিয়ে সমাজ সংস্কার আর সামাজিক উন্নতি সাধনই ছিল তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য।"[১২] তাদের অনেকেই মুসলিম সাহিত্য সমাজের সঙ্গে নানাভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। অন্যান্য পেশাজীবী শিক্ষিত মুসলমানও এই প্রতিষ্ঠানের সাধারণ ও বার্ষিক অধিবেশনে উপস্থিত হতেন। তাদের কেউ কেউ প্রবন্ধ পড়েছেন, কেউ-বা অংশ নিয়েছেন আলোচনায়। আর ছাত্র সমাজ যে বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনে কৌতূহল ও আকর্ষণ বোধ করবে তা খুবই স্বাভাবিক। কাজী মোতাহার হোসেন লিখেছেন মুসলিম সাহিত্যসমাজ, আল মামুন সমিতি [১৩] এই দুই সংগঠনের সভায় মুসলিম সমাজের অনেক ধ্যান-ধারণার বিরুদ্ধে 'গরম গরম' প্রবন্ধ পড়া হতো। চিন্তাশীল ছাত্ররা স্বভাবতই এতে উৎসাহী হয়ে ওঠে।[১৪]

মুসলিম সমাজের কল্যাণকামী শিক্ষিত শ্রেণী ও নব জীবনের স্বপ্নে আকুল তরুণ ছাত্রদের নিয়ে সংঘবদ্ধ হওয়ার জন্য প্রয়োজন ছিল সংগঠকের। সাহিত্য সমাজের কর্মযোগী বলে অভিহিত আবুল হুসেনের মধ্যে ছিল অমিত সংগঠনশক্তি। বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি ও বাণিজ্য বিভাগে অধ্যাপনার চাকরি নিয়ে ১৯২১ সালে তিনি ঢাকা এসেছিলেন। ঢাকা আসার

www.pathagar.com

বছর চারেকের মধ্যে ১৯২৫ সালের জুনে তিনি প্রকাশ করেন 'তরুণ পত্র' নামে একটি পত্রিকা, যার উদ্দেশ্য ছিল জাতিধর্ম নির্বিশেষে বাংলার তরুণ সমাজের কল্যাণসাধন। কল্যাণ প্রতিষ্ঠার জন্য চাই সত্যনিষ্ঠা ও নির্ভয়চিত্ত। 'তরুণ পত্র'-এর ১ম সংখ্যার সম্পাদকীয় নিবন্ধে বলা হয়, "মানুষের যথার্থ কল্যাণ হয় জ্ঞানে। কেহ কেহ বলিবেন ধর্মে। কিন্তু জ্ঞানহীন ধর্ম অর্থবিহীন। সুতরাং বলিব, মানুষের মুক্তি হয় জ্ঞানে। এই জ্ঞান প্রচারেরই সংকল্পে তরুণ পত্রের সৃষ্টি।"[১৫]

অনতিকাল পরে আবুল হুসেন রক্ষণশীলদের পক্ষে উত্তেজক ও বিস্ফোরক যে-সব বক্তব্য সাহিত্য সমাজকে আশ্রয় করে প্রকাশ করেছিলেন তার সূত্রপাত ঘটেছিল 'তরুণ পত্রে'ই। ২য় সংখ্যায় 'সত্য' শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি লেখেন :

সাধনার দ্বারা তুমি মুহম্মদের মত কেন, তাঁর চেয়েও বড় হতে পার। কারণ খোদা আলীউল আযীম। তা ভুলো না। মুহম্মদ মানুষের বিপুল বিকাশের একটা চমৎকার আদর্শ মাত্র। তিনি যে একান্ত করে বড় হয়েছেন এবং তাঁর মত কেউ হতে পারে না, এ-কথা স্বীকার করলে তোমার আত্মা চিরকালই ছোট হয়ে থাকবে।[১৬]

'তরুণ পত্র' বেশি দিন প্রকাশ হতে পারে নি। চারটি সংখ্যা বেরনোর পর আবুল হুসেন এর ব্যয়ভার বহন ছেড়ে দিলে এটি বন্ধ হয়ে যায়।[১৭] তাহলেও এর লক্ষ্য ও মতাদর্শ যে সাহিত্য সমাজের জন্মের উদ্দীপক শক্তি হিসেবে কাজ করেছিল তাতে সন্দেহ নেই।

মুসলিম সাহিত্য সমাজের বার্ষিক মুখপত্র 'শিখা' (চৈত্র ১৩৩৩) প্রকাশের কয়েক মাস আগে ভাদ্র মাসে 'অভিযান' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এ পত্রিকার সঙ্গেও আবুল হুসেন ও আবদুল ওদুদ সম্পৃক্ত ছিলেন। আবদুল ওদুদের বিতর্কিত 'সম্মোহিত মুসলমান' ও আবুল হুসেনের 'নিষেধের বিড়ম্বনা' ও 'শতকরা পয়তাল্লিশ'-এর সাপ্তাহিক 'মোহাম্মদী'কৃত সমালোচনার উত্তর 'শতকরা পয়ঁতাল্লিশের জের' প্রবন্ধ তিনটি এ পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটির নামকরণ করেন কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৪) এবং এর জন্য 'অভিযান' নামে একটি কবিতাও তিনি লিখে দেন।[১৮] মাত্র দুটি সংখ্যা প্রকাশের পর এটি বন্ধ হয়ে যায়। 'শিখা' প্রকাশের এক বছর পর ঢাকায় 'জাগরণ' নামে আরেকটি মাসিক পত্রিকার প্রকাশ ঘটে। এটি প্রকাশের পেছনেও আবুল হুসেনের অবদান ছিল।[১৯] সাহিত্য সমাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অনেকের রচনাই এতে প্রকাশিত হতো। এর মোট সাতটি সংখ্যা বেরিয়েছিল। 'তরুণ পত্র' 'অভিযান' ও 'জাগরণ'কেও 'শিখা'র সঙ্গে সাহিত্য সমাজের মুখপত্র হিসেবে গণ্য করা যায়।

সাহিত্য সমাজের জন্মের পেছনে দেশের ও বিশ্বের ঐতিহাসিক একটি প্রেক্ষাপট ক্রিয়াশীল ছিল। আবদুল হক (১৯১৮-১৯৯৭) সেই প্রেক্ষাপটকে চিহ্নিত করেছেন এভাবে—

... বলতে গেলে বহির্বিশ্বের এবং এই উপমহাদেশের কতকগুলি ঘটনা-পরম্পরার স্বাভাবিক পরিণতি ছিল 'সাহিত্য-সমাজ'। বহির্বিশ্বের ঘটনাবলীর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে রুগ্ন তুরস্কের মধ্যযুগীয় খেলস ত্যাগ, খেলাফতের অবসান এবং ধর্মনিরপেক্ষ নবীন তুর্কী রাষ্ট্রের সবল আত্মপ্রতিষ্ঠা। রক্ষণশীল পাঠানদেশ আফগানিস্তানে বাদশা আমানুল্লাহর সমাজ-সংস্কার-প্রচেষ্টাও প্রায় সমসাময়িক ঘটনা। সারা মুসলিম জাহানেই তখন শোনা যাচ্ছিল নব-জাগরণের কল-কল্লোল। সে-যুগের পাক-ভারতের[২০] দিকে তাকালে দেখতে পাই, 'সাহিত্য-সমাজ' গঠিত হওয়ার অল্প কয়েক বছর আগে সারা পাক-ভারতে হিন্দু-মুসলমান মিলিতভাবে সংগ্রাম করেছে। দৃষ্টি আরেকটু সংকুচিত করলে দেখা যায় বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে তখন একটা নতুন পর্যায়ের সূচনা হয়েছে : নজরুল তাঁর চোখ-ঝলসানো দীপ্তি নিয়ে আবির্ভূত হয়েছেন। এবং

www.pathagar.com

বিশেষভাবে মুসলিম সমাজের মূল্যবোধগুলোকে নূতন দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখে কাজী ইমদাদুল হক তাঁর "আবদুল্লাহ" উপন্যাস রচনা করেছেন, বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন লিখেছেন তাঁর সামাজিক প্রবন্ধগুলো। সৈয়দ আমীর আলী লিখিত "দি স্পিরিট অব ইসলাম" আরও আগে প্রকাশিত। পার্শ্ববর্তী হিন্দু-সমাজের সারা উনিশ শতক এবং বিশ শতকের প্রথম পাদ ব্যাপী নব-জাগরণ-সাধনার দৃষ্টান্ত তো সকলের সামনেই ছিল দেদীপ্যমান। রাজনীতি, সমাজ ও সাহিত্য-ক্ষেত্রের এতগুলো ঘটনার অত্যন্ত স্বাভাবিক পরিণতি 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ'।[২১]

সাহিত্য সমাজ প্রতিষ্ঠার পেছনে উল্লিখিত ঘটনাবলী ও ব্যক্তিত্বের প্রভাব ছাড়া সমসাময়িক ও দূরতর আরো কিছু ঘটনা ও ব্যক্তিত্বের প্রেরণাসঞ্চারী উপাদান কার্যকর ছিল। আবদুল ওদুদ লিখেছেন, "দৃশ্যত এর প্রেরণা এসেছিল মুস্তফা কামালের উদ্যম থেকে, কিন্তু তারও চাইতে গূঢ়তর যোগ এর ছিল বাংলার বা ভারতের একালের জাগরণের সঙ্গে আর সেই সূত্রে মানুষের প্রায় সর্বকালের উদার জাগরণ-প্রয়াসের সঙ্গে।"[২২] শেষোক্ত বাক্যে প্রভাব বা প্রেরণার বিষয়টি বিশেষের গণ্ডি অতিক্রম করে নির্বিশেষে পৌঁছেছে। বস্তুত বাংলার নবজাগরণকামী ব্যক্তিদের সঙ্গে ইসলাম প্রবর্তক হযরত মুহম্মদ (সাঃ), মোতাজেলাবাদ, খলিফা আল মামুন, শেখ সাদী (১১৭৫-১২৯২), গ্যেটে (১৭৪৯-১৮৩২), রোমা রোলাঁ (১৮৬৮-১৯৪৪) প্রমুখ ব্যক্তি ও চিন্তা-দর্শন থেকে সাহিত্য সমাজ প্রেরণা লাভ করেছিল।

এই সংগঠনের নামের সঙ্গে মুসলিম শব্দটি যুক্ত থাকলেও এটি ছিল ধর্মনিরপেক্ষ অসাম্প্রদায়িক উদার একটি প্রতিষ্ঠান। মূলত যুগের প্রয়োজনে বাস্তবতার দিকে লক্ষ্য রেখে তারা 'মুসলিম' শব্দটি গ্রহণ করেছিলেন। কেননা উদার চিন্তা ও মুক্ত বুদ্ধির প্রয়োজনীয়তা সে-সময় মুসলমান সমাজের কাছে তুলে ধরা বিশেষভাবে দরকার ছিল। আবদুল ওদুদ তার ডায়রিধর্মী লেখায় বলেছেন যে, তিনি যে কেবল মুসলমানের মঙ্গল চান তা নয়, মোটের উপর সমস্ত মানুষের মঙ্গল চান। হিন্দু সেই কল্যাণের পথে কিছুদূর হলেও এগিয়েছে, কিন্তু মুসলমান এক পাও এগোয় নি। তাই মুসলমানের জন্য তার অতখানি দরদ। তারা বড় দুস্থ।[২৩] কাজী মোতাহার হোসেনও লিখেছেন :

আমাদের প্রতিষ্ঠানটির নাম "মুসলিম সাহিত্য সমাজ" হইলেও, কার্যত ইহা সাম্প্রদায়িক নহে। আমরা সকল সাহিত্য-সেবীকেই জাতি ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে মেম্বররূপে গ্রহণ করিয়া থাকি। হিন্দু ও মুসলমান ভাবধারার সংমিশ্রণে পুষ্টতর এবং পূর্ণাঙ্গ সাহিত্য-গঠনে সহায়তা করাও আমাদের একটি উদ্দেশ্য, ...[২৪]

সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা যায় সাহিত্য সমাজ কেবল মুসলমানের সংগঠন ছিল না। সেজন্য দেখা যায় অনেক বিশিষ্ট হিন্দু এই সংগঠনের বিভিন্ন অধিবেশনে যোগ দিয়ে প্রবন্ধ পড়েছেন, আলোচনায় অংশ নিয়েছেন, আবৃত্তি করেছেন, গান গেয়েছেন, এমনকি সভা পরিচালনাও করেছেন। ১ম বর্ষের ১ম সাধারণ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন চারু বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৭৭-১৯৩৮), আর এর শেষ বার্ষিক অর্থাৎ ১০ম বার্ষিক অধিবেশনে সাধারণ সভাপতি হিসেবে বৃত হন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬-১৯৩৮)। ৩য় বার্ষিক অধিবেশনে মোহিতলাল মজুমদার (১৮৮৮-১৯৫২) পাঠ করেন 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' নামে একটি প্রবন্ধ। ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজের অধ্যক্ষ সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র সমাজের প্রায় সমুদয় সভায় উপস্থিত থাকতেন। তিনি আবদুল ওদুদকে সাহিত্য সমাজের মস্তিষ্ক, আবুল হুসেনকে দেহ ও কাজী মোতাহার হোসেনকে হৃদয় বলে অভিহিত করেন।[২৫] বক্তৃতা করা ছাড়া তিনি সাধারণ সভা পরিচালনাও করেছেন। বিশিষ্ট হিন্দুদের মধ্যে আর যারা সাহিত্য সমাজের অনুষ্ঠানে

www.pathagar.com

আসতেন তারা হলেন রমেশচন্দ্র মজুমদার (১৮৮৮-১৯৮০), সুশীল কুমার দে (১৮৮৯-১৯৬৮), কালিকারঞ্জন কানুনগো, নীলিনীকান্ত ভট্টশালী, হেমলতা দাস, লীলা নাগ প্রমুখ। রাজনৈতিক নেতা হেমন্তকুমার সরকার ও বিপিনচন্দ্র পালও সাহিত্য সমাজের সভায় উপস্থিত হয়েছিলেন।

সাহিত্য সমাজ প্রতিষ্ঠাকালে ঢাকায় শিক্ষিত মুসলমানের সংখ্যা ছিল নগণ্য। তারা অধিকাংশই ছিলেন ঢাকার বাইরের লোক। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে মুসলিম ছাত্রের সংখ্যাও ছিল কম। এরাও বেশির ভাগ ঢাকার বাইরে থেকে এসেছিল। ঢাকার স্থানীয় লোকদের, যারা কুট্টি নামে পরিচত, শিক্ষার প্রতি আগ্রহ ছিল না। আগ্রহ যাতে না জন্মে সে-ব্যাপারে ঢাকার নবাবদের গোপন চেষ্টাও ছিল।[২৬] তথাপিও সাহিত্য সমাজের চিন্তা ও কর্মকাণ্ড ঢাকার মুসলিম সমাজে একটি তরঙ্গের সৃষ্টি করে। কোনো কোনো অধিবেশনে যথেষ্ট লোক সমাগম হয়।[২৭] অনেক সময় মহিলারাও আসতেন।[২৮] ফজিলাতুন্নেসার উচ্চ শিক্ষার্থে বিদেশ গমন উপলক্ষে বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করে এক সন্ধ্যায় তাকে অভিনন্দন জানানো হয়।[২৯] বিভিন্ন অধিবেশনে যারা গান শোনাতেন তাদের মধ্যে হিন্দু গায়ক-গায়িকা ছাড়াও কাজী মোতাহার হোসেন, মহম্মদ হোসেন, আবদুস সালাম খাঁ, রফিক উদ্দীন আহমদ, জোয়াদুল করিম, আবুল মনসুর প্রমুখ মুসলিম গায়ক ছিলেন। এমনকি মোতাহার হোসেনের দুই কন্যা (নামোল্লেখ নেই), মিস জিয়াউন্নাহার ও মিস জোবেদা এই চারজন মুসলিম মেয়ে সাহিত্য সমাজের অধিবেশনে গান গেয়েছেন।[৩০] কাজী মোতাহার হোসেন লিখেছেন সাহিত্য সমাজ প্রতিষ্ঠার আগে ঢাকায় এসব কল্পনা করা যেত না।[৩১] সাহিত্য সমাজের এই ভূমিকার প্রভাব সম্পর্কে তিনি আরো লিখেছেন—

> অল্প দিনের মধ্যেই সুধী সমাজে এর প্রসার হ'ল, কিন্তু সম্প্রদায়বাদীদের কাছ থেকে প্রবল বিরুদ্ধতার সৃষ্টি হ'ল। যা' হোক পাঁচ ছয় বছরের মধ্যে ক্রমশঃ এই আদর্শের মর্ম্মবোধের ব্যপ্তি হতে লাগল, এর সঙ্গে সঙ্গে হয়ত তাদের অভিভাবকদের কিছুটা চোখ খুলে গেল।[৩২]

কিন্তু সমগ্র মুসলিম সমাজে মুক্তবুদ্ধিসম্ভূত চিন্তা কখনোই স্বচ্ছন্দ ও বাধাহীন হতে পারে নি। "মুসলমান সমাজে মূর্খ চিরকালই পণ্ডিতকে শাসাইয়া আসিয়াছে ; আল্-মামুন-ইবনে-রুশদ-আকবর-দারা শিকোহ্‌র পরাজয় মুসলমান জনসাধারণের হাতে চিরকালই ঘটিয়াছে।"[৩৩] বলা বাহুল্য ঢাকার মুসলিম সাহিত্য সমাজের ভাগ্যেও নতুন কিছু ঘটে নি। তাদের ধর্ম, সমাজ ও রাজনীতিসংক্রান্ত মতামত, বিশেষত আবদুল ওদুদ ও আবুল হুসেনের কিছু বক্তব্য নিয়ে পত্র-পত্রিকায় বিতর্ক সৃষ্টি হয়, তাদের ইসলামদ্রোহী আখ্যা দেয়া হয়, আবুল হুসেনকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিস্কারের সুপারিশ করা হয়, এমনকি তাদের হত্যারও হুমকি দেয়া হয়।[৩৪]

প্রথম বিতর্ক শুরু হয় আবুল হুসেনের 'শতকরা পঁয়তাল্লিশ' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ নিয়ে। প্রবন্ধটি সাহিত্য সমাজের ১ম বর্ষের ২য় অধিবেশনে (২১ ফেব্রুয়ারি ১৯২৬) পাঠ করা হয়। সরকারি চাকরিতে মুসলমানদের জন্য শতকরা পঁয়তাল্লিশ ভাগ কোটা সংরক্ষণের বিরোধিতা করা হয় এতে। লেখকের মূল যুক্তি ছিল এই যে কনসেসন মানসিক দিক দিয়ে মানুষকে ক্ষুদ্র করে, তার মনে কোনো আকাঙ্ক্ষার জন্ম হতে দেয় না। এই যুক্তি কেউ কেউ সমর্থন

www.pathagar.com

করলেও এর বিরোধিতাও করা হয়। এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এ ৩য় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র জনৈক আবদুল অদুদ লেখককে আনপ্রাকটিকাল ও সেন্টিমেন্টাল বলে মন্তব্য করে।[৩৫]

প্রবন্ধটি পরে সাপ্তাহিক 'মোহাম্মদী' পত্রিকায় বেরোলে কবি গোলাম মোস্তফা (১৮৯৭-১৯৬৪) একই পত্রিকায় লেখকের বক্তব্যের প্রতিবাদ করেন ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তার চাকরি লাভ সম্পর্কে কটাক্ষ করেন। প্রত্যুত্তরে আবুল হুসেন রচনা করেন 'শতকরা পঁয়তাল্লিশের জের'। গোলাম মোস্তফার ব্যক্তিগত আক্রমণের ফলে তীক্ষ্ণ আত্মমর্যাদাশীল আবুল হুসেন ১৯২৭-এর ১৩ই জুলাই বিশ্ববিদ্যালয়ের নিশ্চিত ও আরামের চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে ঢাকা জজকোর্টে আইনের ব্যবসায়ে যোগ দেন।[৩৬] এম. এ. ডিগ্রির সঙ্গে তখন তার বি. এল. ডিগ্রিও ছিল।

দ্বিতীয় বিতর্ক সংঘটিত হয় কাজী আবদুল ওদুদের 'সম্মোহিত মুসলমান' ও আবুল হুসেনের 'নিষেধের বিড়ম্বনা' রচনা দুটিকে কেন্দ্র করে। দুটি প্রবন্ধই মাসিক 'অভিযান'-এ প্রকাশিত হয় ভাদ্র ১৩৩৩-এ (আগস্ট-সেপ্টেম্বর ১৯২৬)। 'সম্মোহিত মুসলমান' একই বছরে 'নব পর্যায়' (১ম খণ্ড) গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়। মাসিক 'মোহাম্মদী'র চারটি সংখ্যায় (ফাল্গুন, চৈত্র ১৩৩৪ ও বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৫) ধারাবাহিকভাবে 'নব পর্য্যায় না নব পর্য্যয়' নামে গ্রন্থটির বিরূপ সমালোচনা লেখেন মওলানা আকরম খাঁ (১৮৬৮-১৯৬৮)। তাতে লেখকের কিছু কিছু অভিমতকে যুক্তির হিসেবে অপ্রামাণ্য, ইতিহাসের হিসেবে ভিত্তিহীন ও ধর্মের হিসেবে মারাত্মক বলে মত প্রকাশ করা হয়। বিশেষ ভাবে 'সম্মোহিত মুসলমান' সম্পর্কে বলা হয়, " ... প্রবন্ধটি বিশেষ মনোযোগ সহকারে পড়িয়াছি—এবং পড়িয়া এই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, কাজী ছাহেব নব-পর্য্যায়ের নামে বস্তুত এছলামের বিপর্য্যয় সাধন করারই চেষ্টা করিয়াছেন।"[৩৭]

আবুল হুসেনের 'নিষেধের বিড়ম্বনা' সম্পর্কেও সাপ্তাহিক 'মোহাম্মদী' ও দৈনিক 'ছোলতান' পত্রিকায় বিরূপ আলোচনা হয়। মাসিক 'জাগরণ'-এর প্রথম দুই সংখ্যায় (বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৫) দুই কিস্তিতে লেখক 'সব জানতা' নামে বিরুদ্ধবাদীদের বক্তব্যের জবাব দেন।[৩৮] ধর্ম নিয়ে পত্র-পত্রিকায় এসব বিতর্ক ও বাদ-প্রতিবাদের ফলে ঢাকার রক্ষণশীল মুসলিম সম্প্রদায় অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে ওঠে। তাদের পক্ষ থেকে কিছু জোরজবরদস্তিরও সূচনা হয়।[৩৯] এমতাবস্থায় ঢাকার বলিয়াদীর জমিদার খান বাহাদুর কাজেম উদ্দীন আহমদ সিদ্দীকির উদ্যোগে তার বাসভবনে আবদুল ওদুদ ও আবুল হুসেনের সঙ্গে এক আলোচনার ব্যবস্থা হয়। আলোচনাটি ছিল উত্তর-প্রত্যুত্তরমূলক। কাজী মোতাহার হোসেন জানিয়েছেন মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ও আপোষরফার জন্য চেষ্টা করেছিলেন।[৪০] কাজেম উদ্দীনের বাড়িতে একাধিক দিন উভয় পক্ষের আলোচনা হয়। শেষে 'তিক্ত-বিরক্ত' হয়ে অভিযুক্ত আবদুল ওদুদ ও আবুল হুসেন ১৯২৮ সালের ২০শে আগস্ট দুটি 'ঘোষণাপত্র' লিখে দেন। কোরান ও রসুলের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাসের কথা ব্যক্ত করে আবদুল ওদুদ তার ঘোষণাপত্রে বলেন—

মুসলমান সমাজের উন্নতি আমি কামনা করি আর সে সম্বন্ধে যতটুকু আমার ধারণা আসে, ভাষায় তা প্রকাশ করতে চেষ্টা করি। দুঃখের বিষয় আমার ভাষা বর্ত্তমানে অনেকেরই কাছে অদ্ভুত ঠেকেছে, এবং অনেকের নিকট এমন অর্থ জ্ঞাপন করছে যা লিখবার সময় আমার স্বপ্নেরও অগোচর কথা। এর জন্য বিশেষ ব্যস্ত হওয়ার কারণ ছিল না। কিন্তু ঘটনাক্রমে আমার লেখা মুসলমান সমাজে এক বিষম অসন্তোষ ও মনঃক্ষোভের সৃষ্টি করেছে। এর জন্য কি কথা বলে যে আমি নিজের দুঃখ, লজ্জা ও ব্যথা প্রকাশ করব তা ভেবে পাই না,

www.pathagar.com

খোদার দরগায় প্রার্থনা করি, যদি অজ্ঞাতসারেও আমাদের ধর্ম্ম সম্বন্ধে এমন কোনো কথা আমার কলম থেকে বার হয়ে থাকে যা সত্য ও মুসলমান সমাজের কল্যাণের পরিপন্থী তবে খোদাওন্দ করিম আমার গোনাহ মাফ করে আমাকে "সিরাতুল মুস্তাকীমে" পৌঁছে দিন।[৪১]

আবুল হুসেনও ইসলামে তার বিশ্বাসের কথা ব্যক্ত করে বলেন—

আমার ব্যবহৃত ভাষার জন্য আমার মনের কথা যদি সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পাইয়া না থাকে এবং তাহা যদি আমার মুসলিম ভ্রাতৃবৃন্দের মনে দুঃখ পয়দা করিয়া থাকে, তজ্জন্য আমি আন্তরিক দুঃখিত। সেজন্য আমি খোদার নিকট মাফ চাই, এবং সমাজের নিকটও আশা করি আমার অপরাধ মার্জ্জিত হইবে। হজরত মুহাম্মদ (দঃ) ও ইসলামের রওনক নিজের জীবনে ও আধুনিক মুসলিম সমাজে ফুটাইয়া তুলাই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য। আজকার দিন, আমি এই মজলিসে, খোদার নিকট প্রার্থনা করি, হে খোদা ! তুমি আমাকে সেই রওনক ফুটাইয়া তুলিবার জন্য শক্তি দান কর, এবং প্রকৃত সত্য পথে (সিরাতুল মুসতাকিমে) চালিত কর।[৪২]

আবুল হুসেন এই ঘোষণাপত্র লিখে দেয়া ছাড়াও মাসিক 'জাগরণ'–এ একটি 'কৈফিয়ৎ' প্রকাশ করেন। ইসলামের প্রতি তার দৃঢ় বিশ্বাসের কথা পুনর্ব্যক্ত করে নিজের যৌক্তিক ও প্রাগ্রসর মতের প্রকাশ তিনি এখানেও করেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও ঘোষণাপত্রের মতো এ লেখায়ও তাকে ক্ষমা প্রার্থনা করতে দেখা যায়। এমনকি সাহিত্য সমাজ সম্পর্কেও তিনি এই স্বীকারোক্তি করেন যে—

এই 'সমাজের' কতিপয় সভ্য স্বাধীনতার নামে Licence–এর স্রোতে গা ঢেলে দিয়েছেন। সেজন্য 'সমাজের' দুর্নাম হয়েছে। এজন্য 'সমাজ' নিতান্ত লজ্জিত। সমাজের তরফ থেকে তাঁদের হুশিয়ার করে দেওয়া দরকার। তাঁদের মত Licence প্রিয় সভ্য নিয়ে এ 'সমাজ' কোনো কাজই করতে পার্ব্বে না।"[৪৩]

এই স্বীকারোক্তি ও ক্ষমাপ্রার্থনায় মাসিক 'মোহাম্মদী' স্বভাবতই সন্তোষ প্রকাশ করে এবং লেখে যে এই শুভদিনের আশায় তারা ব্যক্তিগত আক্রমণাত্মক অনেক লেখা তাদের পত্রিকায় প্রকাশ করেন নি। এখন থেকে আবুল হুসেনের সঙ্গে তাদের আর কোনো বিরোধ নেই। এই আলোচনা থেকে জানা যায় নূরর রহমান নামে জনৈক ব্যক্তি মোকদ্দমা করেছিলেন, ঢাকায় কাজে ও কলমে কতকগুলি ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল।[৪৪]

কিন্তু 'মোহাম্মদী'র সন্তুষ্টি বেশি দিন বজায় থাকে নি। সাহিত্য সমাজের ২য় বর্ষের ১ম সাধারণ অধিবেশনে (২৪ জুলাই, ১৯২৭) আবুল হুসেন 'আদেশের নিগ্রহ' নামে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। এটি ঢাকার 'শান্তি' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ১৩৩৬ সালের আশ্বিন (সেপ্টেম্বর–অক্টোবর ১৯২৯) সংখ্যায়। পরে সাপ্তাহিক 'বাংলার বাণী'তে লেখাটির কিয়দংশ 'শান্তি' থেকে পুনর্মুদ্রিত হয়। এই লেখাটুকু পড়েই 'মোহাম্মদী' আবার কূপিত হয়ে ওঠে।[৪৫] আবুল হুসেনের আগের কৈফিয়ৎ বা 'তওবা'র প্রসঙ্গ উল্লেখ করে লেখা হয় যে এত অল্প সময়ের মধ্যে লেখক কি আগের কথা ভুলে গেছেন, না আবার তিনি স্বরূপ প্রকাশ করেছেন অথবা নিজের অগোচরে ইসলাম–বিরুদ্ধ বক্তব্য প্রকাশ করেছেন তা তাদের জানা নেই। তবে এতে ইসলামকে যেভাবে আক্রমণ করা হয়েছে তাতে আর্যসমাজী ও খৃস্টান মিশনারীরাও তার কাছে হার মানবে। এসব বক্তব্যকে হিন্দু নবজাগরণবাদীদের প্রভাবের ফল হিসেবে বিবেচনা করে লেখা হয়—

... হিন্দুরা বলিল মন্দির ভাঙ্গ—ইহারা ভাবিল, তাই ত, একটা কিছু না বলিলেও ত নয়। তাই মসজিদ পোড়াইবার জন্য ইহারা শিখা জ্বালাইয়া দিল।[৪৬] হিন্দুরা বলিল, অন্ধকার যুগের শাস্ত্র আমরা মানি না, ইহারা লাফ দিয়া বলিয়া উঠিল—মরুভূমির শরিয়ত আমরা মানি না।[৪৭]

www.pathagar.com

এসব মনগড়া বিকৃত বক্তব্যের প্রতিবাদে আবদুল কাদির রচনা করেন 'শাস্ত্রবাহকের হুমকী' প্রবন্ধ, যা 'শান্তি'র অগ্রহায়ণ ১৩৩৬ সংখ্যায় ছাপা হয়। ১৯২৭ সালের ২৪ জুলাই যেদিন 'আদেশের নিগ্রহ' পাঠ করা হয় সেদিন এর আলোচনা করতে গিয়েও কেউ কেউ নিজেদের ক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট মনোভাব প্রকাশ করেন। আলোচক আবদুল আজিজ বলেন যে তার অন্তরে আঘাত লেগেছে বলেই তিনি প্রতিবাদ করতে উঠেছেন। তার মতে লেখক ইসলামকে ভাঙতে চেষ্টা করেছেন, গড়বার কোনো উপায় নির্দেশ করেন নি। নাজির উদ্দীন আহমদের মতে লেখক মুসলমান সমাজের মন্দ দিকটাই দেখেছেন ও দেখিয়েছেন, ধর্ম সম্পর্কে তার অনেক মত-ই সত্য নয়।[৪৮] কিন্তু এ প্রবন্ধের প্রতিক্রিয়া কেবল মৌখিক বক্তব্য ও লেখালেখির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে নি, তা জবরদস্তি—এমনকি হত্যার হুমকি পর্যন্ত গড়ায়। আবুল হুসেনের ছাত্র বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী আতাউর রহমান খান এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছিলেন যে খান বাহাদুর আবদুল হাফিজ নামে ঢাকার এক সমাজপতি একদিন পিস্তল নিয়ে আবুল হুসেনের রায় সাহেব বাজার রোডের বাসায় হাজির হন। তিনি প্রথমে আপত্তিকর লেখার জন্য তাকে ভর্ৎসনা করেন এবং বলেন যে তিনি যদি এ জাতীয় লেখা বন্ধ করার প্রতিশ্রুতি না দেন তাহলে তাকে গুলি করা হবে। আবুল হুসেনের নাবালক সন্তানরা তখন পিতার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। তাদের মুখের দিকে চেয়ে তিনি অবশেষে প্রতিশ্রুতি দিতে বাধ্য হন।[৪৯]

এসব ঘটনার পর ১৯২৯ সালের ৮ ডিসেম্বর সন্ধ্যা সাতটায় নবাববাড়ি 'আহসান মঞ্জিল'-এর আঞ্জুমান অফিসে আবুল হুসেনের বিচারসভা বসে। তিনি তখন ঢাকার জজকোর্টের উকিল। তার লেখার বক্তব্য বিকৃত করে উর্দুভাষীদের মধ্যেও প্রচার করা হয়। ফলে তারাও ক্ষেপে ওঠে।

ঢাকা-জীবনের নানা ব্যাপারে নবাববাড়ির তখনো যথেষ্ট প্রভাব ছিল। অনেকগুলি পঞ্চায়েতে বিভক্ত ঢাকা শহর মূলত তাদের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হতো।[৫০] "মহল্লা সরদার থেকে পুলিশের বড়কর্তা, এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভোস্ট ভাইস চ্যান্সেলার পর্যন্ত তাঁদের কথায় ওঠা-বসা করত।"[৫১] ফলে তাদের আহূত সভায় আবুল হুসেন হুমকির মুখে এই বলে 'ক্ষমাপত্র' লিখে দিতে বাধ্য হন যে, "ঐ প্রবন্ধের ভাষা দ্বারা মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দের মনে যে বিশেষ আঘাত দিয়াছি, সেজন্য আমি অপরাধী।"[৫২]

মুসলিম সাহিত্য সমাজের তখন চতুর্থ বর্ষ চলছিল। আবুল হুসেন ছিলেন সে-বছরের সম্পাদক। আহসান মঞ্জিলের অপমানকর ও বেদনাদায়ক ঘটনার পরদিনই (৯ ডিসেম্বর) তিনি ঐ পদ ত্যাগ করেন এবং মাসিক 'সঞ্চয়' সম্পাদককে একটি চিঠি লেখেন। চিঠিটি 'একখানি পত্র' নামে ঐ পত্রিকার পৌষ ১৩৩৬ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। সাহিত্য সমাজের সম্পাদকত্ব ত্যাগ ও নিজের লক্ষ্য ব্যাখ্যা করে ঐ চিঠিতে তিনি লেখেন—

"সাহিত্য সমাজের" মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল চিন্তা চর্চা করা। কিন্তু বর্ত্তমান মুসলমান সমাজে চিন্তা চর্চা করা অসম্ভব বলে মনে করি। আর সম্ভব হইলেও যে উপায়ে চিন্তা চর্চা করলে বর্ত্তমান মুসলমান সমাজের বাহবার পাত্র হওয়া যায় তাতে প্রকৃতপক্ষে চিন্তাচর্চ্চার মূল উদ্দেশ্যটী সার্থক হয় না বরং তাতে চিন্তাচর্চ্চাই রুদ্ধ হয়। সম্প্রতি আমার 'আদেশের নিগ্রহ' নিয়ে যে আন্দোলন হয়েছে তাতে আমি এটুকু বুঝতে পেরেছি যে, সমাজের প্রকৃত কল্যাণাকাঙ্ক্ষী দার্শনিকের কথায় কেউ কর্ণপাত করবে না বরং তার কথার উল্টা অর্থ কর চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করবে। আমার Position ঠিক দার্শনিকের নয়, আমার Position কতকটা কল্যাণপিপাসু সামান্য কর্মীর।

www.pathagar.com

কর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করাই আমার সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য। সে জন্যই আমার চিন্তাচর্চ্চা করা। এখন আমার চিন্তার ফল যদি জনসাধারণকে কর্মের প্রতি আগ্রহান্বিত না করতে পারে বরং তার প্রতি আরও বেশী উদাসীন করে তোলে তা হলে আমার উদ্দেশ্যটী ব্যর্থ হবে।

বিচারসভার সমবেত ব্যক্তিবর্গ তার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনেন যে ইসলামকে নিয়ে তিনি উপহাস করেছেন, অন্য সম্প্রদায়ের নিকট মুসলমান সমাজকে ঘৃণ্য বলে প্রতিপন্ন করার জন্য 'আদেশের নিগ্রহ' প্রবন্ধটি লিখেছেন ; তা না হলে লেখাটি হিন্দু সম্পাদিত 'শান্তি'তে প্রকাশিত হবে কেন? তিনি ইসলামের শত্রু, সুতরাং অপরাধী। এই রায় সম্পর্কে চিঠিতে তিনি লেখেন—

এই রায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা নিরর্থক। কালই ইহার পুনর্ব্বিচার করবে। তবে এখন বর্ত্তমান মুসলমান সমাজের মধ্যে থেকে যখন আমি কাজ করতে চাই তখন বাধ্য হয়ে আমাকে এই রায় মাথা পেতে নিতে হবে এবং আমি নিয়েছি। আমি বলেছি—আমি অপরাধী (?)। এর পর আমি আর "সাহিত্য সমাজের" সম্পাদক থাকা ত দূরের কথা, সভ্য থাকাও আমি সঙ্গত মনে করি না। বর্ত্তমান মুসলমান সমাজকে নিয়ে কি উপায়ে কল্যাণের পথ প্রশস্ত করা যায় তারই চিন্তা করা ছাড়া গত্যন্তর কি?[৫৩]

আবুল হুসেনের পদত্যাগের পর ১৯৩০ সালের ১৮ ও ১৯ এপ্রিল অনুষ্ঠিত চতুর্থ বর্ষের বার্ষিক অধিবেশন পর্যন্ত আবদুর রশিদ বি. টি. সাহিত্য সমাজের ঐ অসমাপ্ত বর্ষের সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। এর দ্বিতীয় সাধারণ সভায় পূর্ববর্তী সম্পাদকের পদত্যাগের প্রতিক্রিয়ায় প্রস্তাব নেয়া হয় : "এই সভা অসাধারণ ও অক্লান্ত কর্মী এবং সদস্য উৎসাহী শ্রীযুক্ত আবুল হুসেন সাহেবকে এই সভার (অর্থাৎ সাহিত্য সমাজের—হা. র) ৪র্থ বর্ষের সম্পাদক (পদে) ইস্তফা দিতে দেখিয়া বড়ই মর্ম্মাহত হইয়াছে এবং দুঃখ প্রকাশ করিতেছে।"[৫৪]

তবে সাহিত্য সমাজের সম্পাদকের দায়িত্ব ত্যাগ করলেও আবুল হুসেন সংগঠনের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন নি। এর পরও একাধিক অধিবেশনে তিনি প্রবন্ধ পাঠ করেছেন, ষষ্ঠ বার্ষিক অধিবেশনে দায়িত্ব পালন করেছেন অভ্যর্থনা সভাপতির। তবে আগের দুঃসাহসিক ভূমিকা অনেকখানি পরিহার করে তিনি সমাজ–সংস্কারের কিছু গঠনমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

সাহিত্য সমাজে প্রথম থেকেই মধ্যপন্থী লোকেরাও স্থান পেয়েছিলেন। আবুল হুসেনের সম্পাদকের দায়িত্ব ত্যাগ করার পর সংগঠনের কণ্ঠে এই মধ্যপন্থীদের সুর প্রধান হয়ে ওঠে। এ প্রসঙ্গে আবদুল কাদির লিখেছেন :

গোড়া থেকেই সাহিত্য–সমাজের 'মুখ্য উদ্দেশ্য' ছিল স্বাধীনভাবে 'চিন্তা চর্চা করা' ; অতঃপর তার উদ্দেশ্য হয় "সত্যপ্রীতি ও সাহিত্যচর্চা।" এই পরিবর্তনের স্বাভাবিক ফল সাহিত্য–সমাজের পঞ্চম বর্ষের সাধারণ অধিবেশনগুলিতে ও বার্ষিক সম্মেলনে ক্রমে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ... মোদ্দা কথা, আবুল হুসেনের কর্ণধারত্ব ত্যাগের পর সাহিত্য–সমাজ চিন্তার ক্ষেত্রে প্রধানতঃ গ্রহণ করে মধ্যপন্থা এবং সাহিত্যচর্চা বলতে বিশেষতঃ বোঝে রসচর্চা।[৫৫]

কিন্তু তা সত্ত্বেও তখনো আবুল হুসেনেরই তত্ত্বাবধানে ও অর্থানুকূল্যে 'শিখা' প্রকাশিত হয়। 'শিখা' বন্ধ হয়ে যায় তার ঢাকা ত্যাগের পর।

১৯৩২ সালের মার্চে সাহিত্য সমাজের ষষ্ঠ বার্ষিক অধিবেশন হয়। আবুল হুসেন ছিলেন সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি। ততদিনে তিনি এম. এল ডিগ্রি অর্জন করেছেন।

www.pathagar.com

ধারণা হয় এর পরই তিনি ঢাকা ত্যাগ করে কলকাতা হাইকোর্ট বার-এ যোগ দেন।[৫৬] তাই 'শিখা'র ষষ্ঠ বার্ষিক সংখ্যাও আর বেরোতে পারে নি।

১৯৩৬ সালের ৩১ জুলাই সাহিত্য সমাজের দশম বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই বর্ষের কর্মসংসদের সেক্রেটারি (সম্ভবত অভ্যর্থনা সমিতির) মুসলিম হলের ছাত্র আজহারুল ইসলামের একটি লেখা থেকে জানা যাচ্ছে যে ঐ অধিবেশনে আবদুল ওদুদ বলেন, "সাহিত্য-সমাজের যা বলার তা বলা হয়েছে। এখন কাজ চাই। সমিতির কাজ শেষ হয়েছে।"[৫৭] সাহিত্য সমাজের প্রধান লেখক-কর্মীদের মধ্যে কেবল আবদুল ওদুদ ও কাজী মোতাহার হোসেন তখন ঢাকায় অবস্থান করছেন, আর সকলেই কর্মোপলক্ষে ঢাকার বাইরে। বোঝা যায় সাহিত্য সমাজ আগের মতো ততখানি আর শক্তিসম্পন্ন নেই। তাই আবদুল ওদুদের উক্তি অনুসারে দশম বার্ষিক অধিবেশনকে সাহিত্য সমাজের শেষ অধিবেশন বলে গ্রহণ করা যেতে পারে।[৫৮]

সাহিত্য সমাজের এক দশককাল স্থায়ীত্বের মধ্যে ঢাকার শিক্ষিত-মানসে যে একটি আলোড়ন ও স্পন্দন সৃষ্টি হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। সেই স্পন্দনেরই বহিঃপ্রকাশ 'তরুণ পত্র', 'অভিযান', 'শিখা' ও 'জাগরণ' প্রভৃতি পত্রিকার প্রকাশ এবং 'এন্টি পর্দা লীগ' ও 'আল-মামুন ক্লাব' সংগঠনের জন্ম। দুটি সংগঠনই প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯২৭ সালে। প্রথমটি ছিল মূলত মুসলিম হল-কেন্দ্রিক ও দ্বিতীয়টির প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন আবুল হুসেন। এ দুটি সংগঠনকে সাহিত্য সমাজের অঙ্গ-প্রতিষ্ঠানরূপে বিবেচনা করা যায়।[৫৯]

তিন

মুসলিম সাহিত্য সমাজের সঙ্গে 'সাহিত্য' শব্দটি যুক্ত থাকলেও এটি প্রচলিত অর্থে সাহিত্য সংগঠন ছিল না, এটি মূলত ও প্রধানত ছিল একটি চিন্তাচর্চা কেন্দ্র বা প্রতিষ্ঠান। সাহিত্যচর্চা এই সংগঠনের দৃষ্টিতে ছিল জীবনচর্চার নামান্তর। এ বিষয়ে সমাজের সংগঠকরা পূর্ণ মাত্রায় সচেতন ছিলেন। তাই 'শিখা'র প্রথম সংখ্যায় (চৈত্র ১৩৩৩) প্রকাশকের নিবেদনে বলা হয়, " 'শিখার' প্রধান উদ্দেশ্য বর্ত্তমান মুসলমান সমাজের জীবন ও চিন্তাধারার গতির পরিবর্ত্তন সাধন। 'শিখার' প্রথম সংখ্যায় আমরা যে প্রবন্ধগুলি সন্নিবেশ করেছি তার প্রত্যেকটি সমাজের দারুন অভাবের এক একটি দিক লক্ষ্য করে লিখিত হয়েছে।" বস্তুত আধুনিক জগতের চিন্তাধারার পরিপ্রেক্ষিতে জ্ঞান ও যুক্তির আলোকে বাঙালি মুসলমান সমাজের তৎকালিন সমাজচিন্তা, ধর্মচিন্তা ও মূল্যবোধগুলির বিচার করে তাকে আধুনিক জীবনপ্রবাহের সঙ্গে সংযোগ ঘটানো ছিল সাহিত্য সমাজের লক্ষ্য। এস. এম. আলী এ প্রসঙ্গে লিখেছেন—

The main problem before the Muslim intellectuals was how to become a part of the modern world while remaining Muslims? They fully accepted the need of a change in the outlook of the Bengali Muslims.[৬০]

মুসলিম সাহিত্য সমাজ যে একটি মামুলি সাহিত্য সংগঠন ছিল না তা সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত নন এমন অনেকেও বুঝেছিলেন। তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশনে যোগদানের আমন্ত্রণপত্র পেয়ে কবি জসীম উদ্দীন একটি চিঠিতে লেখেন—

www.pathagar.com

আপনাদের সাহিত্য সমাজকে আমি সাহিত্য সমাজ হিসেবেই ধরি নে। মানুষের দুর্দ্দিনের ইতিহাসের পশ্চাতে মানুষের মুক্তির দেবতা শবসাধনা করেন। আজ বঙ্গ মুসলিমের সমাজ আঙিনায় শ্মশানের প্রেতযোগিনীর তাণ্ডবনৃত্য আরম্ভ হয়েছে। কোন্ দেবতা আজ এই ঘোর অমানিশার অন্ধকারে কুহেলি কুহরে জাতির মুক্তিমন্ত্র রচনা করছেন তাকে আমরা দেখিনি। তবু মনে হয় আপনাদের ভিতর যেন সেই দেবতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছেন। তাকে যেন আপনারা চিনেছেন। একদিন আপনাদের আহ্বানে সেই দেবতা এসে আমাদের মধ্যে আবির্ভূত হবেন। আমরা সেই দিনের অপেক্ষায় পীড়নের, দুঃখের, বেদনার মন্দির সাজিয়ে বসে থাকি।[৬১]

বোঝা যায় যে জীবনকে, বিশেষত বাঙালি মুসলমানের জীবনকে সুন্দর, প্রেমময় ও কল্যাণময় করে গড়ে তোলাই ছিল মুসলিম সাহিত্য সমাজের মূল লক্ষ্য। এই লক্ষ্য সাধনে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় কিছু বোধ-বিশ্বাস-সংস্কার প্রভৃতি নানা ধরনের প্রতিবন্ধকতা ছিল। তবে সাহিত্য সমাজের ভাবুকেরা প্রধান প্রতিবন্ধক হিসেবে ধর্মীয় কিছু ধ্যান-ধারণা-সংস্কার তথা দৃষ্টিভঙ্গিকে চিহ্নিত করেছিলেন। তারা ভেবেছিলেন এই সংস্কার ও প্রগতিবিমুখ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বাঙালি মুসলমানকে মুক্ত করতে পারলে অন্য সমস্যাগুলির সমাধান সহজ হতে পারবে। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায় মুসলিম জাতীয়তাবাদ ও বিশ্বমুসলিমবাদী চিন্তা-চেতনা থেকে মুক্ত হতে পারলে তারা স্বদেশের কল্যাণ ভাবনায় সঠিক পথের সন্ধান পাবে, সুদ সম্পর্কে তাদের নেতিবাচক মনোভাব দূর হয়ে আর্থিক সমস্যার কিছুটা সমাধান হতে পারবে, ললিতকলার চর্চায় আরোপিত বিধি-নিষেধ অতিক্রম করে জীবনকে সুন্দর ও রুচিশীল করে গড়ে তুলতে সক্ষম হবে ইত্যাদি। সেজন্য তারা ইসলামের বিধি-বিধান-রীতি-পদ্ধতি ও মুসলমানের বোধ-বিশ্বাস-ধ্যান ধারণা ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংস্কারের উপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন এবং এসব ক্ষেত্রেই তারা বিতর্কিত হয়েছিলেন, প্রথাগত প্রতিষ্ঠানের শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন।

যুগ ও জীবনের প্রয়োজনে মুসলিম সাহিত্য সমাজের লেখক-ভাবুকেরা, বিশেষত আবুল হুসেন ও কাজী আবদুল ওদুদ ইসলামী বিধি-বিধান ও ধর্মাচরণ সম্পর্কে যে-সব কথা বলেছিলেন, তাদের উপলব্ধ ইসলামের যে-স্পিরিটের কথা লিখেছিলেন, তার প্রেরণা তারা পেয়েছিলেন ইসলামী ধর্ম-দর্শন, হযরত মুহম্মদের জীবন ও মুসলিম চিন্তার ইতিহাস থেকে। কোরানে মানুষকে চিন্তা, অনুধাবন ও চিন্তা দ্বারা উপলব্ধির কথা পুনঃ পুনঃ বলা হয়েছে। এ বিষয়ে হাদিসও নীরব নয়। সাহিত্য সমাজের মধ্যপন্থী লেখক আবদুর রশীদ 'আমাদের নবজাগরণ ও শরিয়ত' নামের একটি লেখায় শরিয়তে তার বিশ্বাস ব্যক্ত করেই ইসলামের যুগানুগ পরিবর্তনের কথা বলেন। এ বক্তব্যে তিরমিযি শরিফের একটি হাদিসকে তিনি প্রধান যুক্তি-প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করেন, যাতে বলা হয়েছে, "তোমরা এমন এক যুগে বাস করিতেছ যে যদি এই সময় বিধি-বিধানের এক দশমাংশও ছাড়িয়া দাও তবে ধ্বংস হইবে। ইহার পর এমন এক যুগ আসিবে যখন কেহ আদিষ্ট বিধি-বিধানের এক দশমাংশও পালন করিলেও সে মুক্তি পাইবে।"[৬২]

জীবনের প্রয়োজনে নতুন নতুন সমস্যার সমাধানে বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগের দৃষ্টান্ত হযরত মুহম্মদের জীবনকাল থেকে অদ্যাবধি অনেক আছে। মুহম্মদের জীবনের এ সম্পর্কিত একটি সুবিদিত দৃষ্টান্ত এই যে মাআদ বিন জাবালকে ইয়েমেনের শাসনকর্তা হিসেবে প্রেরণের সময় তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করেন কীভাবে তিনি শাসনকার্য চালাবেন? মাআদ বলেন কোরানের বিধান অনুযায়ী। মুহম্মদ পুনরায় জিজ্ঞাসা করেন যদি তাতে সব সমস্যার সমাধান

www.pathagar.com

না পাওয়া যায়? মাআদের উত্তর : রসূলের সুন্নাহ অনুযায়ী। পুনরায় মুহম্মদের প্রশ্ন : যদি তাতেও না হয়? মাআদ তখন বলেন নিজের বিচার–বুদ্ধি অনুযায়ী। মুহম্মদ এই উত্তরে খুশি হন এবং তাকে ইয়েমেনে প্রেরণ করেন।

তাছাড়া এ–ও দেখা যায় যে পয়গম্বরের মৃত্যুর কয়েক বছরের মধ্যেই দ্বিতীয় খলিফা ওমর কোরান ও সুন্নাহর কিছু বিধান পরিবর্তনে সচেষ্ট হন। ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের কথা বিবেচনা করে চুরির জন্য হাত কাটার বিধান তিনি রদ করেন, কোরান ও সুন্নাহর বিধানে ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও 'মুয়াল্লাফাতুল কুলুব'–এর জন্য জাকাত প্রদান বন্ধ করেন,[৬৩] আবার অন্যদিকে তিন তালাকের প্রথা মুহম্মদ কর্তৃক নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও 'পরিপ্রেক্ষিতের পুনর্বিচারে' তিনি তা পুনঃ প্রচলন করেন।[৬৪] পরবর্তীকালেও কয়েকজন ইমাম পরিবর্তিত সময়ানুযায়ী আইনের পরিবর্তন সাধনের প্রয়োজন উপলব্ধি করেন। আর ইসলামের সুবিখ্যাত চার ইমাম তো রয়েছেনই, যাদের প্রত্যেকের রয়েছে অনুসারী। এদের মধ্যে ইমাম আবু হানিফা, যার আইনের ধারা ভারতবর্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ অনুসরণ করে, বলেন যে তার দুজন শিষ্যের চিন্তাধারা যদি তার থেকে ভিন্নগামী হয় তবে তার একার কথার চেয়েও বরং বিবেচনা করে দেখতে হবে ঐ দুজনার কথাই। ইসলামের অনুগামীরা ক্ষেত্রবিশেষে ইমামের বক্তব্যের চেয়ে বরং তাদের কথাই মান্য করবে।[৬৫]

কিন্তু জীবনের বহুবিধ প্রয়োজন সাধনে এককালের বিধি–বিধানের পরিবর্তন ও নতুন বিধি প্রবর্তনের যে–স্বীকৃতি ও দৃষ্টান্ত ইসলামে রয়েছে, ধর্মীয় পরিভাষায় যাকে ইজতিহাদ বলা হয়, তা স্বচ্ছন্দ ও কার্যকর থাকার ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশে ও কালে বাধাগ্রস্ত হয়েছে। আসগর আলি ইনজিনিয়ার লিখেছেন যে সব ধর্মেই পুরোহিতরা যে–ভূমিকায় দেখা দিয়েছে ইসলামেও তার ব্যতিক্রম ঘটে নি। এ কথা দ্বারা তিনি ইসলামের 'উলেমা মডেল'–এর কথা বোঝাতে চেয়েছেন।[৬৬] সৈয়দ আমীর আলী বোধকরি একেই বলছেন 'বুদ্ধিবাদ বিরোধী যাজকতান্ত্রিক ভাব' (anti-rationalistic patristicism)।[৬৭] তাছাড়া সব ধর্মেই এই সাধারণ সত্যটি লক্ষ্য করা যায় যে তা এক পর্য্যায়ে এসে আচার–পরায়ণ ও সামন্ততান্ত্রিক হয়ে ওঠে। তাই যে–ইজতিহাদ ইসলাম ও মুসলমানকে যুগানুগ করে সৃষ্টি করার একটি শক্তিশালী ও কার্যকর উপায়, তা কার্যত সামন্ততন্ত্রের অর্থাৎ উলেমাদের হাতে বন্দি হয়ে পড়ে।

তাহলেও মুসলিম মনীষীরা এই বাধা যে নির্বিবাদে মেনে নিয়েছেন তা নয়। সেকালের ও একালের ইতিহাস থেকে এমন বেশ কজন মনীষীর নাম উল্লেখ করা যায় যারা যুগের প্রয়োজনে যুক্তি ও বুদ্ধির আলোকে ইসলামের পুনর্ব্যাখ্যা দিতে চেয়েছেন ও মুসলিম সম্প্রদায়কে যুগের সাথে পা মিলিয়ে চলতে আহ্বান জানিয়েছেন ও সেই লক্ষ্যে কাজ করেছেন। কেবল ভারতবর্ষের দিকে যদি তাকাই তবে স্যার সৈয়দ আহমদ, বদরুদ্দীন তায়েবজী, সৈয়দ আমীর আলী, মুহম্মদ ইকবাল, মওলানা আবুল কালাম আজাদ প্রমুখের নাম আমরা পাই। ইকবাল তো স্পষ্টই লিখেছেন—

> আমার মতে, আধুনিক কালের উদারনৈতিক মুসলিম চিন্তাবিদেরা যে নিজ অভিজ্ঞতা ও পৃথিবীর পরিবর্তিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামী আইনের মূলনীতিসমূহের পুনর্ব্যাখ্যা দাবী করেছেন, তাতে অযৌক্তিক কিছুই নেই। কুরআনের শিক্ষা এই যে, ক্রমবিকাশশীল সৃষ্টি–প্রচেষ্টাতেই হ'ল জীবনের অভিব্যক্তি। প্রত্যেক যুগে মানুষের নিজ নিজ সমস্যা সমাধানের যোগ্যতা এ থেকেই প্রতিপন্ন হচ্ছে। পূর্ব–পুরুষের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা তার পথে আলোকপাত করতে পারে, কিন্তু বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারে না।[৬৮]

www.pathagar.com

সাম্প্রতিককালেও শরিয়ার অপরিবর্তনীয়তা সম্পর্কে মুসলিম মনোভাবের সমালোচনা করে বলা হয়েছে—

সমস্ত মুসলমানই বিশ্বাস করেন কুরান বিধাতা-প্রণীত এক গ্রন্থ। ফলে সিদ্ধান্ত এই যে এর প্রতিটি শব্দই আল্লাহর, প্রতিটি শব্দই তাই চিরন্তনভাবে সিদ্ধ। আর এই সাধারণ বিশ্বাসের সূত্রেই মানুষজন একথাও মনে করেন—শারিয়াহ কুরানের ভিত্তিতেই গড়ে উঠেছে এবং সুন্নাহ হল পরম, অপরিবর্তনীয়। এইসব বিশ্বাস যথেষ্ট সরলীকৃত। কুরানের এমন অনেক অংশই আছে যা বর্ণনাপ্রাসঙ্গিক। এই পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যায় তারা সমূহই অতিপ্রাকৃতভাবে প্রাপ্ত। বিষয়ানুষঙ্গ থেকে তাদের ছিন্ন করা খুবই অন্যায়ের হবে। অনুরূপভাবে, শারিয়াহর অনেকানেক বিধান বিষয়ানুষঙ্গেই প্রাসঙ্গিক হয়ে গড়ে উঠেছে। দিনকাল পরিবর্তিত হয়েছে এবং সেই কারণেই যান্ত্রিকভাবে এর প্রয়োগ করা পরিবর্তিত পরিপ্রেক্ষিতে অবিচারই হয়, সন্দেহ নেই।[৬৯]

ইসলামের মর্মানুভব, আচারসর্বস্বতা, স্বাধীন চিন্তার অসাড়তা ও প্রতিবন্ধকতা, যুগানুবর্তিতা, বৈজ্ঞানিক চিন্তা ইত্যাদি বিষয়ে যারা বিচারশীল দৃষ্টিতে আলোচনা করেছেন ও মুসলিম সমাজের উন্নতির জন্য কাজ করেছেন তাদের অনেকের জীবনে দুর্বিপাক নেমে এসেছে, তাদের হতে হয়েছে নিন্দিত ও ফতোয়ার শিকার। সাতান্ন বছর বয়সসীমায় শতাধিক মূল্যবান গ্রন্থরচয়িতা ইবনে সিনার (৯৮০-১০৩৭) পক্ষে কোথাও সুস্থির ও শান্তির সঙ্গে অবস্থান করে জ্ঞানচর্চা করা সম্ভব হয়নি। মোল্লাতন্ত্র তাকে একস্থানে বেশি দিন থাকার সুযোগ দেয়নি। নিপীড়ন তাকে দেশ থেকে দেশান্তরে তাড়িত করেছে। আর ইবনে রুশদকে (১১২৬-১১৯৮) স্বাধীন চিন্তার জন্য রাজকীয় চিকিৎসকের পদ থেকে চ্যুৎ হয়ে নির্বাসিত হতে হয়।[৭০] মুতাজিলাদের ভাগ্যে নেমে এসেছিল আরো করুণ পরিণতি। এমনকি ইসলামের জন্য 'ইখওয়ান-উস-সাফা'র[৭১] প্রশংসনীয় কার্যাবলী সত্ত্বেও সাধারণ মুসলমানরা তাদের আদর্শ ও ধ্যান-ধারণাকে সমর্থন করে নি। গোঁড়া মুসলমানদের হাতে তারাও নিগৃহীত হয়েছেন। একালে মিশরের বিশ্রুত পণ্ডিত তাহা হোসাইনকে (১৮৮৯-১৯৭৩) স্বাধীন চিন্তার কারণে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চাকরিচ্যুত হতে হয়। সেই চাকরি ফিরে পেতে তাকে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়।[৭২]

ভারতীয় উপমহাদেশে স্যার সৈয়দ আহম্মদ খান মুসলমান সমাজের কিছু সংস্কারের প্রস্তাব এনেছিলেন। জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় ধর্মপ্রবক্তা ও রক্ষণশীলদের বিরোধিতা করে তিনি বলেন যে, আল্লাহর বাণীর সঙ্গে আল্লাহসৃষ্ট প্রকৃতিকে নিয়ে বিজ্ঞানচর্চার কোনো বিরোধ নেই। তিনি আরো বলেন আল্লাহর বাণী পবিত্র, কিন্তু তার টীকাভাষ্য তা নয়। স্যার সৈয়দ পাশ্চাত্য ধ্যান-ধারণায় প্রবলভাবে আকৃষ্ট ছিলেন। তিনি মনে করতেন বৌদ্ধিক দিক দিয়ে প্রাচ্যের তুলনায় পাশ্চাত্য অনেক বেশি উন্নত। তাই তিনি চাইতেন ভারতীয় মুসলমানরা সব দিক দিয়ে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও চিন্তাচেতনার সমকক্ষ হতে চেষ্টা করুক। তার এসব মতের বিরুদ্ধে মুসলিম সামন্ততান্ত্রিক আধিপত্যবাদী নেতৃত্ব প্রবলভাবে রুখে দাঁড়িয়েছিল।[৭৩]

বিখ্যাত ইসলামী পণ্ডিত ও রাজনীতিবিদ মওলানা আবুল কালাম আজাদের উদার ধর্মমত তার ভাগ্যকে আরো বেশি অপ্রসন্ন করে তুলেছিল। কোরানের বক্তব্যের সঙ্গে সাযুজ্য রক্ষা করে তিনি তার 'ওয়াদত-এ-দীন' (ধর্মীয় সংহতি) তত্ত্বে যা বলেন তার সারকথা হলো এক ধর্ম থেকে অন্য ধর্মের যে পার্থক্য তা 'দীন' বা মূলতত্ত্বের পার্থক্য নয়, পার্থক্য ঐ মূলতত্ত্ব কার্যকর করার উপায় নিয়ে অর্থাৎ বিভিন্নতা ধর্মের মূলতত্ত্বে নয়, বাহ্যরূপে।[৭৪] মওলানা আজাদের এই তত্ত্বের সঙ্গে ইবনে রুশদ-এর দর্শনের ঐক্য লক্ষ্য করা যায়। ইবনে রুশদও

www.pathagar.com

সত্যের একত্বের ধারণায় বিশ্বাসী ছিলেন। তার মতে সত্যের প্রকাশ ও বিকাশ ঘটে বিভিন্ন ও বিচিত্র উপায়ে, কিন্তু এর মূল রূপ ও নির্যাস একই।[৭৫] যা-ই হোক, মওলানা আজাদ তার উদার ধর্মমত ও কংগ্রেস-রাজনীতির কারণে 'কাফের', 'ইসলামের অসাধু বিশ্বাসঘাতক', 'হিন্দুদের ভাড়াটে দালাল' ইত্যাদি অপআখ্যায় নিন্দিত হন। এমনকি অনেক দিনের প্রথা অস্বীকার করে তার ইমামতিতে ঈদের নামাজ পড়তে অস্বীকৃতি জানানো হয়।[৭৬]

মুসলিম বুদ্ধিবৃত্তিক চিন্তার এই সংক্ষিপ্ত পরিচয়ের প্রেক্ষাপট থেকে যে কেউ বুঝতে পারবেন যে যারা মনে করেন জীবনের যাবতীয় সমস্যার সমাধান ইসলাম করে দিয়েছে এবং তার সমস্ত বিধি-বিধান অপরিবর্তনীয় ও অলঙ্ঘনীয়, বহু চিন্তাবিদ এই ধারণার সঙ্গে একমত নন। কেননা তারা জানেন ইসলামের আবির্ভাব হয়েছিল একটি নির্দিষ্ট দেশ-কালে, কিন্তু জীবন ও সময় বিশাল ও অনন্ত। পৃথিবীর সব দেশের মানুষের জীবন একরকম নয়, ভবিষ্যতেও তা একরকম থাকবে না। কত ধরনের পরিবর্তন, কত নতুন নতুন সমস্যা যে মানব-জীবনে দেখা দেবে তা আগে থেকে বলা সম্ভব নয়। সুতরাং বিধি-বিধানের যুগানুগ পরিবর্তন ঘটবেই। না হলে জীবন স্থবির হয়ে যায়। এই চিন্তা যে কেবলই বুদ্ধি ও যুক্তিপ্রসূত তা নয়, ইসলামেও তার স্বীকৃতি আছে। সেজন্য দেখা যায় পৃথিবীর অনেক দেশে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইসলামী বিধি-বিধানের বেশ কিছু পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে। চিন্তার জড়তায় স্থবির বাঙালি মুসলমান সমাজের কল্যাণকামী মুসলিম সাহিত্য সমাজও একই ধারণায় বিশ্বাসী ছিল। কাজী আবদুল ওদুদ তার বিতর্কিত 'সম্মোহিত মুসলমান' প্রবন্ধে এ প্রসঙ্গে লেখেন :

... আমাদের চিত্তে বল সঞ্চার করুক এই নব বিশ্বাস যে, মানুষের চলার জন্য বাস্তবিকই কোনো বাধানো রাজপথ নেই,—জগৎ যেমন একস্থানে বসে নেই মানুষও তেমনি তার পরিবর্তনশীল পরিবেষ্টনকে নিয়ে একস্থানে স্থির হয়ে নেই—আর এই পরিবর্তনশীল পরিবেষ্টনের ভিতর দিয়ে পথ করে যাওয়ার জন্য প্রয়োজন অন্ধ অনুবর্তিতার নয়, সদাজাগ্রতচিত্ততার।[৭৭]

আবুল হুসেনও তার বিস্ফোরণমূলক 'আদেশের নিগ্রহ' প্রবন্ধে ভিন্ন ভাষায় ও ভঙ্গিতে মূলত একই বক্তব্য প্রকাশ করেছেন :

... দেশ-কালের প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য যে ধর্ম-বিধিসমূহ সৃষ্টি হয়েছিল তা কখনও সনাতন হতে পারে না। সে বিধি-বিধান কালের পরিবর্তনের সঙ্গে পরিবর্তন লাভ করতে বাধ্য, নতুবা এই পরিবর্তন সুলভ (?) মানবের নব নব প্রয়োজন তাতে মিটতে পারে না।[৭৮]

মুসলিম সাহিত্য সমাজের লেখকদের, বিশেষত সমাজের দুই প্রধান ভাবুক আবদুল ওদুদ ও আবুল হুসেনের ধর্মপালনসংক্রান্ত মতামতে দেখা যায় তারা ধর্মের বাহ্যিক আচরণের চাইতে তার অন্তর্নিহিত লক্ষ্যের প্রতি অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। আবুল হুসেনের 'নিষেধের বিড়ম্বনা' প্রবন্ধটি যে তাকে বিপদগ্রস্ত করেছিল তার মূল কারণ ছিল এখানে। ঐ প্রবন্ধে তিনি প্রশ্ন উত্থাপন করেন যে ইসলামে যে সব ধর্মীয় আচার রয়েছে তা পালন করে মুসলমানরা যদি সৎ, সুন্দর, নীতিবান ও মহৎ হতে না পারে তবে ঐ সব আচার পালনের প্রয়োজন ও সার্থকতা কোথায়? সন্দেহ নেই, ঐ প্রবন্ধে আবুল হুসেন তার অন্তরের বিক্ষোভকে চেপে রাখতে পারেন নি ; ফলে তার ভাষা কোথাও কোথাও হয়তো রূঢ় হয়েছে, কিন্তু সুস্থির চিত্তে যদি ভেবে দেখা হয় তাহলে তার উত্থাপিত প্রশ্নের গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় না। তিনি এবং আবদুল ওদুদও, মুহম্মদের বিখ্যাত একটি বাণী—আল্লাহর গুণে বিভূষিত হও—উল্লেখ করে আন্তরিকভাবে চেয়েছেন মুসলমানরা এই বাণীকে তাদের জীবনে সার্থক করুক। তারা

www.pathagar.com

গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন মুসলমানের জীবনে এ যদি সার্থক হয়ে উঠতে পারে তাহলে তারা সত্যিকারভাবে উন্নত হতে পারবে।

ধর্মীয় আচার-বিধি পালন সম্পর্কে আবদুল ওদুদের মতও আবুল হুসেনের মতের অনুরূপ। যেমন নামাজ সম্পর্কে তিনি বলেছেন যে নামাজ অর্থাৎ আল্লাহর উদ্দেশ্যে পূর্ণাঙ্গ নতি তখনই সার্থক হয় যখন তা জ্ঞান ও মনুষ্যত্ব সাধনের সহায় হয়। না হলে তা আচার পালনের চাইতে বেশি কিছু নয়। অধিকাংশ মানুষ যে ধর্ম পালন বলতে মুখ্যত ধর্মের আচার-অনুষ্ঠান পালন বোঝেন তার কারণ সম্পর্কে আবদুল ওদুদের বক্তব্য হচ্ছে :

সেকালে ধর্ম-ব্যবস্থার লক্ষ্য শুধু আদর্শ পালন ছিল না। ধর্ম বলতে সামাজিক রীতি-নীতি পালনও বোঝা হতো, বরং সেইটি বোঝা হতো বেশি করে। তার কারণ, সমাজশৃঙ্খলা পালন সর্বযুগেই মানুষের প্রাথমিক কর্তব্য বলে বিবেচিত হয়েছে। কিন্তু একালে জীবন-ব্যবস্থা নানা ভাগে ভাগ করে দেখা হয়। যেমন, আত্মরক্ষার দিক, শাসন-শৃঙ্খলার দিক, ব্যবসা-বাণিজ্যের দিক, আর আদর্শের আনুগত্যের দিক। ইসলামের প্রাথমিক যুগে দেখা যায় যিনি নামাযে নেতৃত্ব করতেন তিনি সেনাপতিও হতেন যুদ্ধক্ষেত্রে। কিন্তু বর্তমানে এমন ব্যবস্থার কথা ভাবা যায় না, কেননা কালে কালে যুদ্ধ এক ব্যাপক শিক্ষাসাপেক্ষ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। তেমনি রাজনীতি আর সমাজ-শৃঙ্খলার দিকও—সেখানেও বিশেষজ্ঞতার প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছে। কাজেই ধর্মের আচার-অনুষ্ঠান পালন সেকালে ব্যাপক জীবন-ক্ষেত্রে যেমন অর্থপূর্ণ ছিল একালে তেমন অর্থপূর্ণ নয়।[৭৯]

একালের মানুষ আবদুল ওদুদ ধর্ম বলতে তাই মুখ্যভাবে বুঝতে চান জ্ঞান ও মনুষ্যত্ব সাধনাকে। ধর্মের আচার-অনুষ্ঠানের দিক তার তুলনায় গৌণ। আজকের জটিল জীবনায়োজনের দিনে মানুষের কাছে কোনটি মুখ্য আর কোনটি গৌণ এই বিচার যেন কখনো শিথিল হয়ে না পড়ে সে বিষয়ে তিনি সচেতন থাকতে পরামর্শ দিয়েছেন। বুঝতে অসুবিধা হয় না যে মুসলিম সাহিত্য সমাজ মানব-জীবনের যে বিষয়টির প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছিল সেটি হলো মনুষ্যত্ব সাধনা। এই সাধনার মূলে রয়েছে স্বাধীনভাবে জ্ঞান ও বুদ্ধিচর্চা। তাই তাদের মুখপত্র 'শিখা'র মুখবাণী হিসেবে মুদ্রিত হতো এই শাশ্বত সত্য-বাণীটি : জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ বুদ্ধি সেখানে আড়ষ্ট মুক্তি সেখানে অসম্ভব। মুক্তি শব্দটিকে তারা মানসিক ও জাগতিক বহুবিধ সংকট-সমস্যা থেকে মুক্তি—এই উভয় অর্থেই বুঝিয়েছিলেন।

মুসলিম সাহিত্য সমাজের কোনো কোনো লেখকের বিরুদ্ধে সমকালে ইসলাম-দ্রোহিতা ও মুসলিম-বিদ্বেষিতার অভিযোগ উঠেছিল। পরবর্তীকালেও তাদের কর্মকাণ্ডকে 'almost an anti-religious movement' হিসেবে দেখা হয়েছে।[৮০] কিন্তু আসলে এ আন্দোলন ধর্মদ্রোহী ছিল না, মুসলমানদের প্রতিও সংশ্লিষ্টদের কোনো বিদ্বেষিতা বা অবজ্ঞা ছিল না। বরং ইসলাম ধর্মে তাদের যথেষ্ট আস্থা ছিল এবং তারা আন্তরিকভাবে মুসলমানদের কল্যাণ চাইতেন। বিরুদ্ধপক্ষের অভিযোগের উত্তরে তাই অনেকবার তাদের নিজেদের অবস্থান ব্যাখ্যা করতে হয়েছিল।

তবে একথা সত্য যে জীবনোন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক কিছু ধর্মীয় ও ধর্মকেন্দ্রিক ধ্যান-ধারণার বিরুদ্ধে, আন্তরিক বিশ্বাসশূন্য ধর্মাচার পালনের বিরুদ্ধে তারা আঘাত হেনেছিলেন। সে আঘাতের বাণী কোথাও কোথাও হয়তো রূঢ় হয়েছিল কিন্তু তা অস্বাভাবিক ছিল না। আবুল ফজল নিজের অভিজ্ঞতালব্ধ উপলব্ধি থেকে লিখেছেন বাঙালি মুসলমানের জীবনের নানা ক্লেদ আর গ্লানি তখনকার তরুণ লেখক-মানসকে অস্বস্তির সঙ্গে যেন একটি খোঁচা দিত। তাই হয়তো না চটে তাদের উপায় ছিল না। সেজন্য কলমের সংযম অনেক সময়

www.pathagar.com

তাদের পক্ষে রক্ষা করা সম্ভব হয় নি।[৮১] এ ব্যাপারে তারা যে একেবারে অসচেতন ছিলেন তা নয়। তাই আঘাতের পক্ষে আত্মপক্ষ সমর্থন করে তারা বলতেন সত্যিকার যে আত্মীয় সেই তো আঘাত দিতে পারে।[৮২]

চার

মুসলিম সাহিত্য সমাজের লেখক-চিন্তকেরা যে সমস্ত কথা বলেছিলেন তা সম্পূর্ণ নতুন কথা ছিল না। এর আগে বিভিন্ন দেশের ভাবুকেরা এসব কথা বিভিন্নভাবে বলেছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আবুল হুসেনের সহকর্মী সাহিত্য সমাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ড. মাহমুদ হুসেনের একটি উক্তি এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে :

These fundamental questions are by no means new to the world, nor even to the muslim world. But this was the first time such questions were openly and, perhaps unbiasedly sought to be thrashed out in the Bengali language in the teeth of opposition from the orthodox.[৮৩]

মাহমুদ হুসেনের উক্তির শেষাংশটি অবশ্য সম্পূর্ণ সত্য নয়। সাহিত্য সমাজ প্রতিষ্ঠার আগে থেকেই মুসলিম লেখকদের কেউ কেউ পর্দা প্রথা, সুদ, ললিতকলার চর্চা, মাদ্রাসা শিক্ষা ইত্যাদি ধর্মীয় বিশ্বাস ও আবেগের সঙ্গে সম্পৃক্ত বিষয়াদি নিয়ে মুক্ত ও যৌক্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা শুরু করেছেন। এমনকি মহাপুরুষদের প্রেরিতত্ব ও ধর্মশাস্ত্রের ঐশিতা নিয়েও প্রশ্ন তোলা হয়েছে।[৮৪] তবে একথা সত্য—আবদুল হক যেমন বলেছেন—যে এককভাবে দু-একটি দুঃসাহসিক উক্তি এ শতাব্দীর আরো কোনো কোনো মুসলিম লেখক করলেও জীবন ও সমাজ সম্পর্কে কতকগুলি সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট ধারণা নিয়ে সংঘবদ্ধভাবে নিষ্ঠার সঙ্গে দুঃসাহসিক চিন্তা সাহিত্য সমাজের লেখকেরাই করেছেন।[৮৫]

কেবল এদিক থেকে নয়, অন্য একটি দিক থেকেও মুসলিম সাহিত্য সমাজের চিন্তার বিশেষত্ব আছে। এর লেখকেরা কেউ ধর্মতাত্ত্বিক বা দার্শনিক ছিলেন না, তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল সামাজিক উন্নতি ও প্রগতির লক্ষ্যে চিন্তাচর্চা করা ও তা সমাজ-মানসে সঞ্চারিত করে দেয়া। মাসিক 'সঞ্চয়'-এ প্রকাশিত আবুল হুসেনের পূর্বোদ্ধৃত চিঠিতে নিজের অবস্থান ব্যাখ্যাসংক্রান্ত বক্তব্যটি এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে, যেখানে তিনি বলেছেন—"আমার position ঠিক দার্শনিকের নয়, আমার position কতকটা কল্যাণপিপাসু সামান্য কর্মীর। কর্মের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করাই আমার সর্বপ্রথম কর্তব্য। সে জন্যই আমার চিন্তাচর্চা করা।" বস্তুত এটিই ছিল সাহিত্য সমাজের লেখকদের মুখ্য করণীয় ; আর এ লক্ষ্যেই তারা মুসলমান সম্প্রদায়ের সেইসব ধর্মীয় ও ধর্মকেন্দ্রিক বোধ-বিশ্বাস-আচার-আচরণের সংস্কার ও পরিবর্তন চেয়েছিলেন যেগুলি ছিল উন্নতি-প্রগতির প্রতিবন্ধক। ধর্মে বিশ্বাস স্থাপন করেই তারা ছিলেন ধর্মনিরপেক্ষতা নীতির সমর্থক। সেজন্য তারা ওহাবিদের মতো ইসলামের আদি বিশুদ্ধতায় ফিরে যাওয়ার কথা ভাবেন নি, জামাল উদ্দীন আফগানীর মতো বিশ্বমুসলিমবাদ (pan-Islamism) প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেন নি, এমনকি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কথাও তারা বলেন নি। ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মীয় আচরণাদি ব্যক্তিগত জীবনে সীমাবদ্ধ রেখে রাষ্ট্র, সমাজ, শিক্ষা প্রভৃতি জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রকে ধর্মীয় প্রভাবমুক্ত রাখার পক্ষপাতী ছিলেন তারা। এদিক থেকে তাদেরকে 'কামালপন্থী' বলা অযথার্থ নয়।

www.pathagar.com

মুসলিম সাহিত্য সমাজের এই চিন্তা-দর্শন ও কর্মকাণ্ডকে তাই কিছুটা সীমিত অর্থে হলেও রেনেসাঁস বলতে আপত্তি থাকার কারণ আছে বলে মনে হয় না। রেনেসাঁসের কয়েকটি প্রধান লক্ষণ—যুক্তি ও বুদ্ধি দ্বারা চালিত হওয়া, অসীম জ্ঞানতৃষ্ণা, পৃথিবীর মানস-সম্পদ আহরণ করে জাতীয় জীবনকে সমৃদ্ধ করা, ললিতকলা চর্চার মাধ্যমে জীবনকে সুন্দর করা ইত্যাদি মনোভঙ্গির পরিচয় তাদের মধ্যে পাই আমরা। সাহিত্য সমাজের অন্যতম লেখক মোতাহের হোসেন চৌধুরীর (১৯০৩-৫৬) বক্তব্য এ প্রসঙ্গে খুবই গুরুত্বপূর্ণ :

রিনেসাঁসে বড় হয়ে উঠেছিল যে জীবন—পরকালমুখী ধর্ম সাধনা নয়, ইহকালমুখী জীবন সাধনা, মানে জীবনের সর্বাঙ্গীন বিকাশের প্রয়াস, সাহিত্য সমাজেরও লক্ষ্য ছিল তাই। জীবন সুন্দর হোক, ঐশ্বর্য্যময় হোক, তার বিকাশের অন্তরায় দূরীভূত হোক, এ-ই ছিল তার অন্তর্নিহিত কামনা। জ্ঞান, প্রেম ও বুদ্ধির সন্নিপাতে জীবনের যে ঐশ্বর্যময় জয়যাত্রা তার স্বপ্নে সমাজের নেতৃস্থানীয়দের চিত্ত আন্দোলিত হয়েছিল। সে জন্য কোনো ইজমের তাবিজে বিশ্বাসী না হয়ে গভীর জীবনানুভূতির আশ্রয় গ্রহণই এঁরা কল্যাণপ্রদ মনে করেছিলেন।

... রিনেসাঁসের অপর লক্ষণ যে মিলনপ্রয়াস, ঐতিহ্যে ঐতিহ্যে মিলন সাধনের শুভ চেষ্টা, সেও এই আন্দোলনের বিষয়বস্তু। ছুৎমার্গী বৈশিষ্ট্যের বাণী প্রচার না করে তা মিলনের বাণীই প্রচার করেছিল। বুদ্ধি, অনুভূতি ও কল্পনার দ্বার খুলে দিয়ে দেশকে প্রেমের ও কল্যাণের উপর প্রতিষ্ঠিত করাই ছিল এর লক্ষ্য।[৮৬]

ইহকালমুখী জীবন-সাধনা ও মানব-মহিমার স্বীকৃতি—এ দুই বোধকরি রেনেসাঁসের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য। সাহিত্য সমাজের প্রধান লেখক আবদুল ওদুদ তাই ধর্ম বলতে মুখ্যত বোঝাতে চেয়েছেন জ্ঞান ও মনুষ্যত্ব সাধনাকে ; আর আচার-অনুষ্ঠানকে দেখেছেন সে-তুলনায় গৌণ দিক হিসেবে। শুধু তা-ই নয়, ইসলাম প্রবর্তক হযরত মুহম্মদ সম্পর্কে সাহিত্য সমাজের মনোভাবে গুরুত্ব পড়েছে তার প্রেরিতত্বের উপর নয়, মানব-মহিমার উপর। কাজী মোতাহার হোসেন মুহম্মদ সম্পর্কে লিখতে গিয়ে তার রচনার নাম দিয়েছেন 'মানুষ মোহাম্মদ'। সাহিত্য সমাজের পঞ্চম বর্ষের প্রথম সাধারণ অধিবেশনে যখন এই প্রবন্ধটি এবং মোক্তার আহমদ সিদ্দিকীর মুহম্মদ বিষয়ে আরেকটি রচনা পাঠ করা হয় তখন আলোচনাপর্বে কাজী আবদুল ওদুদ বলেন :

হজরত মোহাম্মদ শেষ পয়গম্বর কিনা, কোরান ফেরেস্তার মারফৎ অহিরূপে নাজেল হয়েছিল কিনা, আজিকার দিনে এসব আমাদের বড় সমস্যা নয়—আমাদের সমস্যা হচ্ছে এই যুগে এই আবহাওয়া ও পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে দাঁড়িয়ে হজরত মোহাম্মদের জীবন ও কোরান থেকে আমরা আমাদের জীবনে কতখানি পাথেয় সংগ্রহ করতে পারি। হজরত মোহাম্মদের বিরাট ব্যক্তিত্ব যেন আমাদের চোখ ঝলসে না দেয়। হজরত মোহাম্মদের জীবনের কোন সাধনা যদি আমরা আমাদের জীবনে না নিতে পারি—তাহা পরিহার করতে যেন আমাদের এতটুকু দ্বিধা না হয়।

আবুল হুসেনও এ আলোচনায় অংশ নেন। তার আলোচনাটিও বর্তমান প্রসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বলে উদ্ধৃত করা জরুরি বিবেচনা করি। তিনি বলেন—

হজরতের জীবনের প্রত্যেক ব্যাপারকে justify করে মুসলমানদের আর কোন লাভ নেই, তাঁকে বিচার করতে হবে একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি হিসাবে—ইতিহাসে এক অতীত যুগে ভিন্ন আবেষ্টনে তিনি জন্মেছিলেন, সেখানে বসে তিনি যে জীবন যাপন করেছেন, যে শিক্ষা দিয়েছেন, তার থেকে এই যুগে এই দেশে বসে আমরা কতটুকু আলো পাই আমাদের জীবন চলার পথে আমরা তাই শুধু নেব। তা না করে যদি আমরা পদে পদে তাঁকে justify করতে যাই তাহলে তাঁকেও বুঝা হবে না, আমরা নিজেরাও শুধু বিড়ম্বিত হব। কোন একটা আদর্শের প্রতিমাকে আঁকড়ে ধরে থাকা ইসলামের শিক্ষার খেলাপ। মুসলমানের জীবনে প্রতিমা ভঙ্গের শিক্ষা যে শুধু মাটির প্রতিমা ভঙ্গের শিক্ষা নয়—আদর্শের প্রতিমা ভঙ্গেরও বটে। কোন আদর্শের পাষাণ বলে যেন আমাদের পথ আগলে না দাঁড়ায়—আমাদের চলতে হবে আদর্শ হতে আদর্শান্তরে।[৮৭]

www.pathagar.com

কাজী মোতাহার হোসেনের প্রবন্ধে ও উদ্ধৃত আলোচনাদুটিতে যে দৃষ্টিকোণ প্রতিফলিত হয়েছে তাকে নিঃসন্দেহে রেনেসাঁসি দৃষ্টিকোণ বলা যাবে।

বাঙালি মুসলমান সমাজে সাহিত্য সমাজ যে একটি রেনেসাঁস বা নবজাগরণ ঘটাতে চেয়েছিল সে ব্যাপারে সমাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যক্তিরা তো সচেতন ছিলেনই, পরেও অনেকে তাদের আন্দোলনকে সেভাবে মূল্যায়ন করেছেন। মনীষী অন্নদাশংকর রায় একে অভিহিত করেছেন বাংলার দ্বিতীয় রেনেসাঁস বলে।[৮৮] বাঙালি মুসলমানের জীবনে আধুনিকতা-সন্ধানী একজন গবেষক মন্তব্য করেছেন,

...the 'Emancipation of the intellect movement' of the Muslim Sahitya Samaj can be termed as a collective endeavour for an extention of the nineteenth century renaissance among the Bengali Muslim in the 20th century.[৮৯]

আর সাম্প্রতিককালে কথাসাহিত্যিক আবুল বাশার সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহর (১৯২২-৭১) 'লাল সালু' উপন্যাস সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে মুসলিম সাহিত্য সমাজের আন্দোলন সম্পর্কে যে-মন্তব্য করেছেন তা-ও এ প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য : "এ ছিল স্বল্পায়ু, সীমাবদ্ধ গতি এবং কাল-বিঘ্নিত, তবু একেই বলতে হবে পিছিয়ে থাকা বাঙালি মুসলমানের যুগ-আনুকূল্যহীন রেনেসাঁস।"[৯০]

এছাড়া সাহিত্য সমাজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা আবদুল কাদির এর চারিত্র্যকে তুলনা করেছেন হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও (১৮০৯-৩১) প্রতিষ্ঠিত 'একাডেমিক এসোসিয়েশন'-এর সঙ্গে। এক সাক্ষাৎকারে এ সম্পর্কে তিনি বলেন :

... তৎকালীন কলকাতার 'ইয়ং বেঙ্গল' দল এবং শতবর্ষ পরে ঢাকার 'শিখা' গোষ্ঠী প্রায় একই রকম ভূমিকা পালন করে। ইয়ং বেঙ্গল দলের মুখপত্র ছিল 'Parthenon Enquirer' ও 'জ্ঞানান্বেষণ' এবং মুসলিম সাহিত্য-সমাজের মুখপত্র ছিল 'শিখা' 'জাগরণ' ও 'জয়তী'। এ সকল পত্রিকার লক্ষ্য ছিল স্ব স্ব সমাজের গতানুগতিক চিন্তাধারার প্রতি আঘাত দিয়ে জনগণের মনের জাগরণ ও প্রগতিমুখিতা। ইয়ং বেঙ্গল দলের চিন্তা-চেতনায় প্রাধান্য পেয়েছিল পাশ্চাত্যের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ; আর মুসলিম সাহিত্য সমাজের অধিকাংশ সদস্যের আদর্শ ছিল নবমানবতা বা উদার মানবিকতা এবং কোনো কোনো সদস্যের মনে ছায়া ফেলেছিল সমাজতান্ত্রিক মানবিকতা।[৯১]

রেনেসাঁস-বিশেষজ্ঞ বাঙালি পণ্ডিত অন্নদাশংকর রায়, শিবনারায়ণ রায় প্রমুখ আরো অনেকেই এ তুলনা করেছেন। শিবনারায়ণ রায় তার 'The Sikha (1927-32) movement' প্রবন্ধে লিখেছেন :

During its brief life Sikha became the centre of a unique intellectual movement which both in the scope and vigour of its inquiry and in the intensity of opposition which it generated among powerful sections of the community in Bengal was reminiscent of another movement which had taken place in calcutta exactly a hundread years earlier.[৯২]

তবে আমাদের বিবেচনায় অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে মুসলিম সাহিত্য সমাজের চারিত্র্যগত অন্তর্গূঢ় একটি সাদৃশ্য থাকলেও অন্যান্য দিক থেকে এই দুই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অমিলও যথেষ্ট আছে। কালগত একটি ব্যবধান তো রয়েছেই, তদুপরি পরিসর ও লক্ষ্যের দিক দিয়েও এ দুই প্রতিষ্ঠান এক নয়। পরিসরের দিক থেকে উনিশ শতকের কোলকাতাকেন্দ্রিক রেনেসাঁসের সঙ্গেও ঢাকার রেনেসাঁসের দৃষ্টিভঙ্গির সীমাবদ্ধতাগত একটি লক্ষ্যযোগ্য তফাত আছে। কোলকাতাকেন্দ্রিক রেনেসাঁসের হিন্দু নায়করা তাদের প্রতিবেশি মুসলিম সম্প্রদায়ের কথা ভাবেন নি,[৯৩] কিন্তু মুসলিম সাহিত্য সমাজের সঙ্গে 'মুসলিম' শব্দটি যুক্ত থাকলেও এটি কেবল মুসলমানদেরই সংগঠন ছিল না।

www.pathagar.com

নানা কারণে সৃষ্ট সমকালীন বাংলার দাহ্যধর্মী হিন্দু-মুসলিম সমস্যা নিয়ে সাহিত্য সমাজের নায়কেরা যথেষ্ট ভাবিত ছিলেন। এ ক্ষেত্রে তাদের কিছু কিছু মত স্বসম্প্রদায়ের কাছে নিন্দিত-সমালোচিত হয়। এর অর্থ এই যে তাদের সে-সব মত মুসলিম স্বার্থের পরিপন্থী ও হিন্দু স্বার্থের অনুকূল বলে মুসলিম স্বাতন্ত্র্যবাদীদের কাছে বিবেচিত হয়েছিল।

মুসলিম সাহিত্য সমাজের চিন্তা-দর্শনকে অবশ্য ভিন্ন যুক্তির আলোকেও দেখা হয়েছে। চিন্তাশীল প্রাবন্ধিক আহমদ শরীফ অভিমত প্রকাশ করেছেন যে সাহিত্য সমাজের প্রধান লেখকেরা যে কথা বলতে চেয়েছিলেন তাতে ধর্মের 'জারকরস' মেশানো উচিত হয় নি ; "কেননা তাঁদের আবেদন ছিল বাস্তব সমস্যার ভিত্তিতে মানুষের বুদ্ধি, শ্রেয়ঃচেতনা, বিচারশক্তি তথা যুক্তিবোধের কাছে। এরূপ ক্ষেত্রে ধর্মীয় মোড়কে পরিবেশিত তত্ত্ব প্রায়ই লক্ষ্যভ্রষ্ট করে এবং কেবল নতুন গোঁড়ামীর জন্ম দেয়, যা আরো ক্ষতিকর হয়, অগ্রাহ্যও হয়।'[৯৪] উদ্ধৃতির প্রথমাংশের সঙ্গে দ্বিমত প্রকাশের কারণ নেই কিন্তু শেষাংশে তা আছে বলে আমাদের মনে হয়। আবুল হুসেন ও আবদুল ওদুদের এতদসংক্রান্ত লেখা পড়লে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে ধার্মিকতা বলতে তারা বুঝেছেন নীতিবান, বিবেকবান, হৃদয়বান, চরিত্রবান, বিচারপ্রবণ প্রভৃতি গুণান্বিত হওয়া। এসব কথা তারা যাদেরকে বোঝাতে চেয়েছিলেন তারা ছিলেন বিশেষভাবে ধর্মকাতর কিন্তু প্রকৃত ধর্মবোধশূন্য অথবা সেই বোধের কম-বেশি অভাব তাদের মধ্যে ছিল। ফলে তাদের কল্যাণ চাইতে গিয়ে সাহিত্য সমাজের লেখকদের ধর্ম নামক ব্যাপারটিকে সম্পূর্ণ অন্তরালে রেখে কিছু বলা বা করা সম্ভব ছিল বলে মনে হয় না। তাছাড়া মুসলমান সমাজের অনেকগুলি সমস্যা ছিল ধর্মবিশ্বাসসম্পৃক্ত। তাই কেবল শ্রেয়ঃচেতনা আর যুক্তিবোধের কাছে—যা তাদের অধিকাংশের ছিল না—আবেদন পেশ করলেই তাদের উদ্দেশ্য সফল হতো এমন কথা নিশ্চয় করে বলা সম্ভব নয়। কেননা মুসলিম-মানস তার উপযোগী ছিল না। সাহিত্য সমাজ প্রথমে সে-কাজটিই করতে চেয়েছিলেন।

'শিখা'র মুখবাণী তথা সাহিত্য সমাজের চিন্তা-দর্শনের সারাৎসার—জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ বুদ্ধি সেখানে আড়ষ্ট মুক্তি সেখানে অসম্ভব—এর জ্ঞান ও বুদ্ধিচর্চা 'নিতান্ত সীমিত তাৎপর্যে ব্যবহৃত' বলে আহমদ শরীফ মনে করেন। কেননা, তার মতে, "... অধ্যাত্ম ও অলৌকিক অদৃশ্য আসমানী বিশ্বাসকে বিশুদ্ধ ও অবিকৃত রাখাই এঁদের লক্ষ্য। কাজেই ... মুক্তবুদ্ধি এ নয়, ডিগদড়ি দেয়ার বিশ্বাসের পরিসর স্বচ্ছ ও কল্যাণকর করাই এ জ্ঞান-বুদ্ধি অর্জনের ও প্রয়োগের লক্ষ্য।"[৯৫] প্রমাণবহির্ভূত অলৌকিক শক্তিতে ও অপৌরুষেয় বাণীতে বিশ্বাস-যুক্তি-বুদ্ধিকে সীমিত করে সত্য, কিন্তু অপৌরুষেয় বাণীর অমোঘতা ও চিরন্তনতা সম্পর্কে সাহিত্য সমাজের, বিশেষত আবদুল ওদুদ ও আবুল হুসেনের মতামত বিচার করলে একথা জোর দিয়ে বলা যাবে না যে তাদের 'বিশ্বাস' 'বিশুদ্ধ ও অবিকৃত' থেকেছে। সুতরাং তাদের জ্ঞান ও বুদ্ধিচর্চার বিষয়টি নিতান্ত সীমিত তাৎপর্যে ব্যবহৃত হয়েছে এ অভিমত স্বীকার করা যায় না, তবে তা কিছুটা যে সীমিত হয়ে পড়েছে সেকথা অবশ্য সত্য। এর ফলে তাদের বিশ্বাস ও বক্তব্যে যে বৈপরীত্য ঘটেছে তা-ও সত্য। তবু একথা অস্বীকার করা যাবে না যে তাদের বক্তব্যে বিশ্বাসের চেয়ে জোর ও গুরুত্ব পড়েছে যুক্তি-বুদ্ধির উপর।

প্রশ্ন উঠতে পারে সাহিত্য সমাজের উদ্দেশ্য তবে সফল হলো না কেন? আহমদ শরীফের মতে তাদের ব্যর্থতার বীজ নিহিত ছিল প্রাচীনের প্রতি আন্তরিক আনুগত্যে।[৯৬] কিন্তু আবুল

www.pathagar.com

হুসেন, আবদুল ওদুদ প্রাচীনের প্রতি 'আন্তরিক অনুগত' যে ছিলেন না তা তাদের লেখা পড়লে বোঝা যায়। তা যদি তারা থাকতেন তাহলে তাদের বিরুদ্ধে ইসলাম-বিরোধিতার অভিযোগ উঠবে কেন? আহমদ শরীফ তার প্রাগুক্ত লেখার আরেক স্থানে বলেছেন সমকালে তাদের মত অনুকূল ছিল না মানুষের মূঢ়তার জন্য।[৯৭] সাহিত্য সমাজের আন্দোলনের ব্যর্থতার একটি বড় কারণ রয়েছে বরং এখানেই। এই রক্ষণশীল মূঢ়তা কিভাবে তাদের বাধাগ্রস্ত করেছে তা আমরা দেখেছি। এমনকি যে-মুসলিম হলে সাহিত্য সমাজের জন্ম সেখানেও একদিন লিখিতভাবে তাদের অধিবেশন বন্ধ করে দেয়া হয়। সে নিষেধাজ্ঞার ভাষায় যে-ইঙ্গিত রয়েছে তাতে মনে হয় এতে নবাব-বাড়ির হাত ছিল।[৯৮] তাছাড়া সাহিত্য সমাজের স্থিতিকাল ছিল কিঞ্চিদধিক দশ বছর মাত্র। একটি চিন্তাদীন রুদ্ধগতি সমাজকে আধুনিকতার পথে চলিষ্ণু করে তুলতে দশ বছর সময় বলা চলে কিছুই নয়। তা-ও শেষের দিকে সংগঠনের প্রধান লেখক-কর্মীদের অনেকেই নানা কারণে ঢাকার বাইরে চলে যান। ফলে স্বাভাকিভাবেই সংগঠনের কর্মকাণ্ড কিছুটা কমজোর হয়ে পড়ে এবং একদিন বিলুপ্ত হয়ে যায়।

তবে বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন যে বিশেষ সাফল্য ছাড়াই বন্ধ হয়ে যায় এবং পরেও তা যে মুসলিম সমাজে তেমন কোনো প্রভাব রাখতে পারে নি তার প্রধানতম কারণ, আমাদের মনে হয়, মোতাহের হোসেন চৌধুরী সঠিকভাবে চিহ্নিত করতে পেরেছেন। তিনি বলেছেন, "এর আরব্ধ কাজ শেষ হতে পারে নি রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের আবির্ভাবে।"[৯৯] এই ক্ষুদ্র বাক্যটি অত্যন্ত তাৎপর্যবাহী। রাজনৈতিক 'দ্বন্দ্ব'ই উনিশ শতকের নবজাগরণেরও শক্তিহীন হয়ে পড়ার মূল কারণ। ক্ষমতালোভী স্বার্থান্ধ রাজনীতির নানাবিধ দূষণ দেশ-মানসকে আবিলতায় ভরে দিয়েছে। পরিপ্রেক্ষিতের পরিবর্তনে কিছুটা রূপান্তরের মধ্য দিয়ে একই রাজনীতি অদ্যাবধি বহমান। এ মন্তব্য বিভক্ত বাংলার উভয় প্রান্ত সম্পর্কে কম-বেশি সত্য।

বহু প্রাণ, বহু ত্যাগ আর বহু ক্ষতির বিনিময়ে বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করেছে। কিন্তু স্বাধীনতার ত্রিশ বছর সময়ের মধ্যেও তাকে অর্থবহ করা যায় নি। আমাদের সবচেয়ে বড় অভাব শুভবুদ্ধির। দেশে মুক্তবুদ্ধির মানুষ হয়তো অনেক আছেন কিন্তু শঙ্কাজনক অভাব দেখা দিয়েছে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের। তাই যাবতীয় তামস মনোবৃত্তি রাষ্ট্রযন্ত্রের তাবৎ অঙ্গকে গ্রাস করে ফেলেছে। দেশগঠনের মূল দায়িত্ব যাদের সেই রাজনীতিবিদদের প্রতি মানুষের আস্থা রাখার সঙ্গত কারণ আছে বলে মনে হয় না। বুদ্ধিজীবীরাও তাদের দায়িত্ব পালনে পরাঙ্মুখ। সন্ত্রাস, নিরাপত্তাহীনতা, আকাশচুম্বী শ্রেণীবৈষম্য, নীরন্ধ্র দারিদ্র্য ব্যাপক সংখ্যক মানুষকে অমারাত্রির অন্ধকারের মতো গভীর হতাশায় নিমজ্জিত করেছে। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলাদেশে এ অবস্থার অনিবার্য পরিণাম হিসেবে ধর্মের পুনরুত্থান ঘটছে। তাকে নিয়ে চলছে রাজনীতি আর ব্যবসা। মানুষ অতিমাত্রায় নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে অপৌরুষেয় শক্তির প্রতি, যা তাকে অনেকখানি অদৃষ্টবাদী করে তুলছে। জীবন ও জগৎ অনেকের কাছে পরিগণিত হচ্ছে 'মায়া' বলে, আর এ সবকিছুর জন্য কাজ করে চলেছে নানা ধরনের সঙ্ঘশক্তি। এমতাবস্থায় সুস্থ ও শুভ চিন্তার অভাব তো লক্ষিত হয়ই, তার চেয়ে বেশি যা ঘটে তা হচ্ছে সুস্থ ও শুভ চিন্তা মানুষের অন্তরগোচর হতে চায় না।

তবে সাহিত্য সমাজের আরব্ধ কাজ যদি শেষ হতে পারত তাহলে বাঙালির জীবনে তা সোনা ফলাতে পারত—এ বিশ্বাসও ব্যক্ত করেছেন মোতাহের হোসেন চৌধুরী। তিনি আরও

www.pathagar.com

বলেছেন যদি কখনো মুসলিম সমাজে সত্যিকার রেনেসাঁসের আবির্ভাব হয় তবে উপলব্ধ হবে যে মুসলিম সাহিত্য সমাজই তার প্রাথমিক ভিত্তি রচনা করেছিল। এ মন্তব্য শিরোধার্য করেই আমরা এ আলোচনার ইতি টানতে চাই।

তথ্যসূত্র

১. Dr. Mahmud Husain, 'The Cultural Life of Old Dacca', *Pakistan Quarterly*, vol. VIII, No. 1, Spring, 1957 ; উদ্ধৃত, আবদুল হক, 'ঢাকার মুসলিম সাহিত্য সমাজ', সাহিত্য ঐতিহ্য মূল্যবোধ, মুক্তধারা, দ্বি-স ১৯৭৬, পৃ. ১৩৯

২. Soumitra Sinha, The Quest for Modernity and the Bengali Muslims (1921-47), Minerva Associates pvt. Ltd. Calcutta, 1995, p. 108

৩. আনিসুজ্জামান, 'কাজী আবদুল ওদুদ', *পরিক্রম*, আষাঢ়-পৌষ ১৩৭৭, পৃ. ৪২১-২২

৪. সম্প্রতি প্রকাশিত সাহিত্য সমাজের বিস্তারিত কার্যবিবরণী থেকে এতদিনের অজানা কিছু নতুন তথ্য পাওয়া যাচ্ছে। একাধিক হস্তাক্ষরে লিখিত কার্যবিবরণীটির খাতা কাজী আবদুল ওদুদের কন্যা বেগম জেবুন্নেসা ও জামাতা সাহিত্য সমাজের অন্যতম কর্মী অধ্যাপক শামসুল হুদার কাছে রক্ষিত ছিল। আহমদ নূরুল ইসলাম এটি সংগ্রহ ও সম্পাদনা করে 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' শিরোনামে প্রকাশ করেছেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা সাহিত্য সমিতির পত্রিকা 'পাণ্ডুলিপি'র ষোড়শ খণ্ডে (১৯৯৫)। পৃ. ৯৭-২০৬

৫. *রেখাচিত্র*, বইঘর, তৃ-স ১৯৮৫, পৃ. ১৪৯-৫০

৬. দ্র. মুম্বাইয়ের 'ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক স্টাডিজ'-এর অধ্যক্ষ বিশিষ্ট লেখক ও চিন্তাবিদ আসগর আলী ইঞ্জিনিয়ারের প্রবন্ধ সংকলন 'ইসলাম ও আধুনিকতা', প্রতিক্ষণ পাবলিকেশন্স প্রা. লি. কর্তৃক অনূদিত ও প্রকাশিত, কোলকাতা, ১৯৯৮, পৃ. ২৮

৭. আহমদ নূরুল ইসলাম সাহিত্য সমাজের প্রাগুক্ত কার্যবিবরণী অনুসরণে জানিয়েছেন যে সাহিত্য সমাজ ১৯ নয়, ১৭ জানুয়ারি (৩ মাঘ ১৩৩২) রোববার প্রতিষ্ঠিত হয়। কার্যবিবরণীর খাতায় প্রথমে ১৯ জানুয়ারি লেখা ছিল। পরে তা লাল কালিতে কেটে ১৭ করা হয়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে এর আগে সাহিত্য সমাজ প্রতিষ্ঠার বাংলা তারিখ কেউ উল্লেখ করেন নি। কার্যবিবরণীতে উল্লিখিত ৩ মাঘ ১৩৩২ বঙ্গাব্দ ইংরেজি বর্ষপঞ্জিতে ১৭ জানুয়ারি ১৯২৬ সাল হয়। প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮-৯৯

৮. আবদুল কাদির দাবি করেছেন যে প্রধানত তারই উদ্যোগে মুসলিম সাহিত্য সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। দ্র. সাক্ষাৎকার, মাসিক 'বই', কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৩৮১, পৃ. ২৪২ ; *কাজী আবদুল ওদুদ*, বাংলা একাডেমী, ১৯৭৬, পৃ. ১৬। কিন্তু এ দাবি যথার্থ নয়, বাস্তবসম্মতও নয়। কেননা ইন্টারমিডিয়েট শ্রেণিতে পড়া অল্প বয়সি একজন ছাত্রের মূল উদ্যোগে এ জাতীয় প্রতিষ্ঠান গঠন অত্যন্ত কঠিনসাধ্য। আসলে আবদুল কাদির সাহিত্য সমাজের জন্মের সাথে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন কিন্তু এর মূল প্রবর্তক ও প্রাণশক্তি ছিলেন আবুল হুসেন। ওয়াকিল আহমদও এই ধারণা ব্যক্ত করেছেন। 'মুসলিম সমাজ ও বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন', *ওদুদ-চর্চা*, সাঈদ-উর রহমান সম্পাদিত, একাডেমিক পাবলিশার্স, ১৯৮২, পৃ. ২২

৯. আহমদ নূরুল ইসলাম, পৃ. ১০৭-৮

১০. 'বার্ষিক বিবরণী', *শিখা*, ১ম বর্ষ, চৈত্র ১৩৩৩, পৃ. ২২

১১. আহমদ নূরুল ইসলাম, পৃ. ১৬০-৬১

১২. *রেখাচিত্র*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৭

১৩. ১৯২৭ সালে আবুল হুসেনের উদ্যোগে 'আল-মামুন ক্লাব'-এর প্রতিষ্ঠা ঘটে। এই সংগঠনেরও উদ্দেশ্য ছিল জ্ঞানচর্চা ও মুক্তবুদ্ধির প্রসার।

www.pathagar.com

১৪. 'আমার সাহিত্যিক জীবনের অভিজ্ঞতা', প্রবন্ধগুচ্ছ, আবদুল হক সম্পাদিত *কাজী মোতাহার হোসেন রচনাবলী (১ম খণ্ড)*, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৪, পৃ. ২০৪। এরপর 'কামোহোর' নামে নির্দেশিত হবে।

১৫. উদ্ধৃত, আবদুল কাদির, 'তরুণ পত্র', পরিশিষ্ট, আবদুল কাদির সম্পাদিত *আবুল হুসেন রচনাবলী (১ম খণ্ড)*, নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৬৮, পৃ. ৪২০। এরপর 'আহুর' নামে উল্লেখ করা হবে।

১৬. উদ্ধৃত, ঐ, পৃ. ৪২৩

১৭. মোহাম্মদ আবদুল মজিদ, *আবুল হুসেন*, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৮, পৃ. ৩১

১৮. আবদুল কাদির, 'অভিযান : একটি স্বল্পায়ু পত্রিকা', *পূর্বাচল*, শ্রাবণ-ভাদ্র ১৩৮৩, পৃ. ১২

১৯. আবদুল কাদির, 'তরুণপত্র', *আহুর*, পৃ. ৪২৬

২০. লেখক অসচেতনভাবে 'পাক-ভারত' শব্দটি ব্যবহার করেছেন বলে মনে হয়।

২১. 'ঢাকার "মুসলিম সাহিত্য" ', *সাহিত্য ঐতিহ্য মূল্যবোধ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৬

২২. 'নিবেদন', *শাশ্বত বঙ্গ*, ব্র্যাক প্রকাশনা, ১৯৮৩

২৩. 'নানা কথা', আবদুল হক সম্পাদিত *কাজী আবদুল ওদুদ রচনাবলী* (২য় খণ্ড), বাংলা একাডেমী, ১৯৯০, পৃ. ৩১৩। এরপর 'কাআওর' নামে উল্লেখ করা হবে।

২৪. 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ-এর ৩য় বার্ষিক বিবরণী', আবুল আহসান চৌধুরী সম্পাদিত *'কামোহোর' (৩য় খণ্ড)*, বাংলা একাডেমী, ১৯৯২, পৃ. ১০৩

২৫. ঐ, পৃ. ৩১-৩২

২৬. উনিশ শতকের শেষ দশকে নবাব আবদুল গনি ছেলে আহসানউল্লাকে একটি চিঠি লেখেন। কামরুদ্দিন আহমদ তার 'বাংলার মধ্যবিত্তের আত্মবিকাশ' (১ম খণ্ড, ১৩৮২) গ্রন্থে ঐ চিঠির বক্তব্য নিজের ভাষায় এভাবে উল্লেখ করেছেন : "নবাব সাহেব তাঁর পুত্রকে লিখেছিলেন যে, তিনি যেন মনে রাখেন যে ঢাকার কুট্টিরা তাদের প্রজা নয়—অথচ তাদের প্রজার মত ব্যবহার করতে হবে—খানদানের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার জন্য। এ সব লোক যদি লেখাপড়া শিখে বাস্তব অবস্থা জানতে পারে তবে খানদানের নেতৃত্বের পরিকল্পনা ছাড়তে হবে। তাদের অন্যভাবে টাকা পয়সা দিয়ে সময় সময় সাহায্য করা যেতে পারে—কিন্তু স্কুলের ব্যবস্থা যেন না করা হয়।" আবুল হুসেন নবাব এস্টেটের কাগজপত্র পরীক্ষা করতে গিয়ে ঐ চিঠিটির সন্ধান পান এবং তা ফাস করে দেন। এজন্য তার উপর নবাব বাড়ির ক্ষোভ ছিল এবং তারা তাকে বিপদে ফেলার চেষ্টাও করেছিলেন। পৃ. ৩৪

২৭. আহমদ নূরুল ইসলাম, পৃ. ১৭৮, ১৮৪ ও ২০১

২৮. ঐ, পৃ. ১৩১, ১৫৬-৫৭, ১৬৮, ১৭১ ও ১৮৩

২৯. ঐ, পৃ. ১৪৮

৩০. দ্র. ঐ

৩১. 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ-এর ২য় বর্ষের কার্যবিবরণী', *কামোহোর (৩য়)*, পৃ. ৯৭-৯৮

৩২. 'কাজী আবদুল ওদুদ ও তাঁর অবদান', *কামোহোর (১ম)*, পৃ. ৩৬২

৩৩. আবদুল কাদির, 'শাস্ত্রবাহকের হুমকী', *আহুর*, *পৃ.* ৩৮২

৩৪. মোহাম্মদ সিদ্দিকুর রহমান, *প্রবন্ধ সাহিত্যে বাঙালি মুসলমানের বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন* (অপ্রকাশিত অভিসন্দর্ভ), পৃ. ৪১২

৩৫. আহমদ নূরুল ইসলাম, পৃ. ১১৩

৩৬. মোহাম্মদ সিদ্দিকুর রহমান, 'আবুল হুসেন ও মুসলিম সাহিত্য সমাজ', *আত্ম-অন্বেষায় বাঙালি মুসলমান ও অন্যান্য প্রবন্ধ*, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৫, পৃ. ৮৮-৮৯ (১০ নং টীকা)

৩৭. ফাল্গুন ১৩৩৪, পৃ. ২৭২

৩৮. খোন্দকার সিরাজুল হক, *মুসলিম সাহিত্য সমাজ : সমাজচিন্তা ও সাহিত্যকর্ম*, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৪, পৃ. ১২২

www.pathagar.com

৩৯. আবদুল ওদুদ তার ডায়রিধর্মী লেখা 'নানা কথায়' লিখেছেন, "আজ শুনলাম "মোহাম্মদী"-তে আমার সম্বন্ধে যে গালাগালি বেরিয়েছে তা পড়ে এখানকার কয়েকজন লোক উত্তেজিত হয়ে ওঠে, তাদের মধ্যে দু'জন এই প্রতিজ্ঞা করে যে তারা যদি আমার মাথা না নেয় তবে নবীর শাফায়াৎ পাবে না।" পরে অবশ্য তারা অন্য লোকের কাছে আবদুল ওদুদের প্রশংসা শুনে শান্ত হয়। এ ঘটনা তিনি লেখেন ১৯২৮ সালের ৪ জানুয়ারি। *কাআওর (২য়)*, পৃ. ৩২৪

৪০. 'আমার সাহিত্যিক জীবনের অভিজ্ঞতা', *কামোহোর (১ম)*, পৃ. ২০৬

৪১. "ঢাকার দুইখানা ঘোষণাপত্র", *সাপ্তাহিক মোহাম্মদী*, ১৫ ভাদ্র ১৩৩৫ ; উদ্ধৃত, খোন্দকার সিরাজুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৩-২৪

৪২. উদ্ধৃত, ঐ, পৃ. ১২৩

৪৩. উদ্ধৃত, *মাসিক মোহাম্মদী*, ভাদ্র ১৩৩৫, পৃ. ৭১০

৪৪. ঐ, পৃ. ৭০৯-১০। মোকদ্দমা বা ঘটনাবলী সম্পর্কে পত্রিকায় বিশেষ কিছু বলা হয় নি। মোকদ্দমা বিষয়ে সাহিত্য সমাজের কেউ বা কোনো গবেষক-লেখকও কিছু লেখেন নি।

৪৫. আবদুল কাদির, 'শাস্ত্র-বাহকের হুমকী', *আহুর*, পৃ. ৩৮২। আবদুল কাদির এই আলোচনায় লিখেছেন যে মওলানা আকরম খাঁ সাংবাদিকতার সত্যনিষ্ঠা থেকে বিচ্যুত হয়ে নিজের বিকৃতবুদ্ধি চরিতার্থতার পরিচয় দিয়েছেন তার সমালোচনায়। এজন্য আবদুল কাদিরের লেখায় যথেষ্ট ক্ষোভ প্রকাশ পেয়েছে।

৪৬. সাহিত্য সমাজের বার্ষিক মুখপত্র 'শিখা'র ১ম বর্ষের প্রচ্ছদে মরুভূমি, খেজুর গাছ, জঞ্জাল-পরগাছা-সমাকীর্ণ মসজিদ, খোলা কোরান শরিফ ও অগ্নিশিখা সংবলিত একটি ছবি মুদ্রিত ছিল। বিরুদ্ধবাদীরা এর কদর্থ করে বলে যে শিখাপন্থীরা আগুন দিয়ে কোরান ও মসজিদ পুড়িয়ে দিতে চায়। সেজন্য সাহিত্য সমাজের ২য় বর্ষের সম্পাদক কাজী মোতাহার হোসেনকে বার্ষিক কার্যবিবরণীতে ছবিটির তাৎপর্যগত অর্থ ব্যাখ্যা করতে হয়। দ্র. *কমোহোর (৩য়)*, পৃ. ৯৮

৪৭. *মাসিক মোহাম্মদী*, অগ্রহায়ণ ১৩৩৬, পৃ. ১৬০

৪৮. আহমদ নূরুল ইসলাম, পৃ. ১২৭-২৯

৪৯. মোহাম্মদ আবদুল মজিদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬ (৬০ নং টীকা)

৫০. আবু জাফর শামসুদ্দীন, *আত্মস্মৃতি (১ম খণ্ড)*, পৃ. ১১৪-১৭ ও মুনতাসীর মামুন, *স্মৃতিময় ঢাকা*, পৃ. ৩৪-৪০

৫১. আবুল ফজল, 'কাজী আবদুল ওদুদ : সাহিত্য ও জীবনদর্শন', *নির্বাচিত প্রবন্ধ সংকলন*, বাংলা একাডেমী, ১৯৮১, পৃ. ১৭৩

৫২. 'নোটিশ ; ঢাকা ইসলামীয়া আঞ্জুমান, ১১-১২-২৯ ইং' ; উদ্ধৃত, *আহুর*, পৃ. (১৫)

৫৩. পৃ. ১৪৮

৫৪. আহমদ নূরুল ইসলাম, পৃ. ১৫৫

৫৫. 'ভূমিকা', *আহুর*, পৃ. (১৯)

৫৬. মোহাম্মদ আবদুল মজিদ আবুল হুসেনের জীবনীতে লিখেছেন তিনি ১৯৩১ সালে কোলকাতা হাইকোর্টে যোগ দেন (প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭)। কিন্তু এ তথ্য ঠিক নয়। ২৫.৫.১৯৩১ তারিখে আবদুল কাদিরকে লেখা যে-চিঠি থেকে আবদুল মজিদ এই ধারণা করেছেন, সেই চিঠিটি সচেতনভাবে পড়লে তিনি বুঝতে পারতেন ঐ চিঠি ঢাকা থেকে কোলকাতায় অবস্থানরত আবদুল কাদিরকে লেখা। তিনি তখন সেখান থেকে 'জয়তী' পত্রিকা প্রকাশ করছেন। দ্র. 'চিন্তানায়ক আবুল হুসেন', আহুর, পৃ. ৩৯০। আবদুল কাদির, খোন্দকার সিরাজুল হক, মোহাম্মদ সিদ্দিকুর রহমান প্রমুখ সকলেই ১৯৩২ সালে আবুল হুসেনের ঢাকা ত্যাগের কথা বলেছেন।

৫৭. 'ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ : একটি স্মরণীয় নাম', *শহীদুল্লাহ্ সংবর্ধনা গ্রন্থ*, মুহম্মদ সফিয়্যুল্লাহ সম্পাদিত, রেনেসাঁস প্রিন্টার্স, ১৩৭৩, পৃ. ২৯৯

www.pathagar.com

৫৮. কার্যবিবরণীতে দেখা যাচ্ছে সাহিত্য সমাজের ১২শ বর্ষের দুটি সাধারণ অধিবেশন হয়েছিল। কিন্তু ১১শ বর্ষের কোনো অধিবেশনের কথা তাতে নেই। আহমদ নূরুল ইসলাম, পৃ. ২০৫–৬

৫৯. খোন্দকার সিরাজুল হক, 'বাঙালি মুসলমানের জাগরণে 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ'–এর ভূমিকা', *ভাষা–সাহিত্য পত্র*, ১১ সংখ্যা, ১৩৯০, পৃ. ৪৫

৬০. 'Education and Culturle in Dacca during the Last Hundered Years', *Muhammad Shahidullah Felicitation Volume*, edt. by Muhammad Enamul Hoq, Asiatic Society of Pakistan, Dacca, 1966, p. 38

৬১. পরিশিষ্ট, *শিখা*, ৩য় বর্ষ, ১৩৩৬, পৃ. ১৪২

৬২. *শিখা*, ১ম বর্ষ, পৃ. ৯৬। আবূ হুরায়রা থেকে বর্ণিত এ হাদিসটির ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, বাংলাদেশ প্রকাশিত অনুবাদ এরকম : "তোমরা এমন এক যুগে আছ যে, তোমাদের কেউ যদি নির্দেশিত বিষয়ের এক দশমাংশও ছেড়ে দেয় তবে সে ধ্বংস হয়ে যাবে। এরপর এমন এক যুগ আসছে যে, কেউ যদি নির্দেশিত বিষয়ের এক দশমাংশও আমল করে তবুও সে নাজাত পেয়ে যাবে।" হাদিস নং ২২৭০১, তিরমিযী শরীফ (৪র্থ খণ্ড), মওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ অনূদিত, ১৯৯২, পৃ. ৫৭৬–৭৭। উল্লেখ্য যে এই হাদিসটি আবদুল ওদুদও 'ইসলাম রাষ্ট্রের ভিত্তি' শীর্ষক প্রবন্ধের পাদটীকায় ব্যবহার করেছেন। *শাশ্বত বঙ্গ*, পৃ. ৩৪। সাহিত্য সমাজের ৪র্থ বার্ষিক অধিবেশনের সাধারণ সভাপতি নাসির উদ্দীন আহমদের ভাষণেও হাদিসটি উল্লেখ করা হয়েছে।

৬৩. কোরানের বঙ্গানুবাদকরা মুয়াল্লাফাতুল কুলুব–এর অর্থ যাদের হৃদয়ে প্রীতি সঞ্চার করতে হয়, যাদের চিত্ত আকর্ষণ করা হয়, যাদের চিত্ত আকর্ষণ প্রয়োজন, যাদের হৃদয় আসক্ত ইত্যাদি নানাভাবে করেছেন। সুরা তওবা–র ৬০ সংখ্যক আয়াতে যাদের জাকাত প্রাপ্তির হকদার হিসেবে নির্দেশ করা হয়েছে এরা তার মধ্যে চতুর্থ খাত। হযরত মুহম্মদের আমলে বহু সংখ্যক লোককে তা'লিফে কলব বা মন জয় করার উদ্দেশ্যে বৃত্তি ও দান করা হতো। দরিদ্র শ্রেণীকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য তিনি জাকাতও দিতেন। তার মৃত্যুর পর ইসলাম যখন যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় করেছে তখনো মন জয় করার জন্য জাকাত দেয়া আবশ্যক কিনা এ প্রশ্ন দেখা দেয় এবং একটি ঘটনা থেকে বিধানটি রহিত হয়ে যায়। একবার দুজন লোক খলিফা হযরত আবু বকরের কাছে উপস্থিত হয়ে একটি ভূখণ্ড পেতে চায়। খলিফা তার দানপত্র লিখে দেন। এর অকাট্যতা রক্ষার জন্য লোকদুটি অন্যান্য প্রধান সাহাবিদেরও স্বাক্ষর নেয়। এরপর তারা হযরত ওমরের কাছে গেলে তিনি দানপত্র পড়ে তখনই তা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলেন এবং বলেন, তা'লিফে কলব–এর জন্য রসুল তোমাদের অনেক কিছু দিয়েছেন সত্য, কিন্তু তখন ছিল ইসলামের দুর্বল অবস্থার সময়। এখন আল্লাহ ইসলামকে তোমাদের মতো লোকদের সাহায্য থেকে 'মুখাপেক্ষাহীন' করে দিয়েছেন। এই ঘটনার পর লোকদুটি আবু বকরের কাছে ফিরে গিয়ে অভিযোগ পেশ করে ও বিদ্রূপ করে বলে—খলিফা আপনি, না ওমর? কিন্তু আবু বকর বা অন্য কোনো সাহাবি ওমরের মত ও আচরণের বিরুদ্ধে একটি শব্দও উচ্চারণ করলেন না। এই ঘটনা থেকে হানাফি মতাবলম্বীরা মনে করেন সাহাবিদের ইজমা–র ভিত্তিতে তা'লিফে কলব–এর খাত নাকচ হয়ে গেছে। এ মত সর্বসম্মত নয়। মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধান প্রয়োজনে আজও এ খাতে জাকাতের অর্থ প্রদান করতে পারেন বলে কেউ কেউ মনে করেন। সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী, *তাফহীমুল কুরআন (৫ম খণ্ড)*, মুহাম্মদ আবদুর রহীম অনূদিত, আধুনিক প্রকাশনী, দ্বি–প্র ১৯৮৫, পৃ. ৪১–৪২

৬৪. আসগর আলি ইনজিনিয়ার, 'ইসলাম : আধুনিকতার সংকট', *ইসলাম ও আধুনিকতা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬

৬৫. ঐ, পৃ. ১১

৬৬. 'ইসলাম, উদারনীতি ও গণতন্ত্র', ঐ, পৃ. ২৬

৬৭. *দ্য স্পিরিট অব ইসলাম*, ড. রশিদুল আলম অনূদিত, মল্লিক ব্রাদার্স, কোলকাতা, ১৯৯৭, পৃ. ৫৫২–৫৩

৬৮. 'ইসলামী ব্যবস্থায় গতিশীলতার নীতি', *ইসলামে ধর্মীয় চিন্তার পুনর্গঠন (Reconstruction of Religions Thought in Islam* গ্রন্থের অনুবাদ), ইসলামী সংস্কৃতি কেন্দ্র, ঢাকা, দ্বি–মু ১৯৮১, পৃ. ২১৫

www.pathagar.com

৬৯. আসগর আলী ইনজিনিয়ার, 'ইসলাম ' আধুনিকতার সংকট:, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬

৭০. দ্র. মোহম্মদ বরকতুল্লাহ, 'ইসলাম ও মুক্তবুদ্ধি', *মোহম্মদ বরকতুল্লাহ রচনাবলী (৩য় খণ্ড)*, মোহাম্মদ আবদুল কাইউম সম্পাদিত, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩

৭১. ইখওয়ান–উস সাফা বা পবিত্র ভ্রাতৃসঙ্ঘ ছিল একটি গুপ্ত দার্শনিক–ধর্মীয় দল। খ্রিস্টিয় দশম শতকের শেষ দিকে বসরায় এর উদ্ভব ঘটে। এই সঙ্ঘ আত্মাকে কলুষমুক্ত ও পবিত্র করার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করে এবং দর্শন তথা জ্ঞানচর্চার মাধ্যমেই তা করা সম্ভব বলে তাদের বিশ্বাস ছিল। এমন এক সময়ে এদের আবির্ভাব ঘটে যখন শরিয়া বা ধর্মীয় আইন অজ্ঞতাপ্রসূত ভ্রান্তি ও কুসংস্কার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়ে এবং ধর্মকে পরমত অসহিষ্ণুতা ও সর্বাত্মক গোঁড়ামির দিকে ঠেলে দেয়ার চেষ্টা চলে। এমতাবস্থায় পবিত্র ভ্রাতৃসঙ্ঘ তাদের উদার ও সহনশীল মতাদর্শ নিয়ে আবির্ভূত হয়। তাদের মতে ধর্ম বিষয়ে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পার্থক্য নিতান্তই স্থান–কাল–পাত্র সাপেক্ষ এবং সেজন্যই তা তুচ্ছ। এ পার্থক্য কোনোমতেই সত্যের একত্ব ও সর্বজনীনতাকে ব্যাহত করে না, করতে পারেও না। কেননা সত্য স্বরূপতই অনপেক্ষ ও নির্বিকার। সে–কারণে সব ধরনের ভেদ ও বৈশিষ্ট্যের মধ্যে তা থাকে অটল ও অপরিবর্তিত। আমিনুল ইসলাম, *মুসলিম ধর্মতত্ত্ব ও দর্শন*, বাংলা একাডেমী, পু–মু ১৯৯৫, পৃ. ১১৮–২৪। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে সাহিত্য সমাজের লেখকেরা তাদের চিন্তা–দর্শনের প্রেরণাদায়ী উৎস–উপাদানের ক্ষেত্রে পবিত্র ভ্রাতৃসঙ্ঘের নাম বলেন নি। কিন্তু সমাজের চতুর্থ বার্ষিক অধিবেশনের সাধারণ সভাপতি কোলকাতার অ্যাডিশনাল চিফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট নাসির উদ্দীন আহমদ তার বক্তৃতায় শুরুর দ্বিতীয় স্তবকে বলেন যে মুসলিম সাহিত্য সমাজ স্বতঃই তাকে পবিত্র ভ্রাতৃসঙ্ঘের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এই স্মরণ–করিয়ে দেয়া খুবই স্বাভাবিক বলে আমাদের মনে হয়।

৭২. আলফ্রেড গিয়োম, *ইসলাম*, মোজাফফর হোসেন অনূদিত, ইউ. পি. এল. ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. ১২৫

৭৩. আসগর আলি ইনজিনিয়ার, 'ভারতের মুসলমান সমাজের সংস্কার', *ইসলাম ও আধুনিকতা*, পৃ.৭০–৭১

৭৪. 'ইসলাম : আধুনিকতার সঙ্কট', ঐ, পৃ. ১৪ ; শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *মৌলানা আবুল কালাম আজাদ*, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি. কোলকাতা, ১৪০৫, পৃ. ১১

৭৫. আমিনুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪২

৭৬. শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪ ও ১৪৯

৭৭. *শাশ্বত বঙ্গ*, পৃ. ৩৯৯

৭৮. *আহুর (১ম)*, পৃ. ৬১

৭৯. হযরত মুহম্মদ ও ইসলাম, *কাআওর (৬ষ্ঠ খণ্ড)*, খোন্দকার সিরাজুল হক সম্পাদিত, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৫, পৃ. ১৮০

৮০. Mahmud Husain, 'Dacca University and the Pakistan Movement', *The Partition of India*, edt. by C. H. Philips & Mary Doreen wainwright, George Allen and Unwin Ltd. London, 1970, p. 670

৮১. *রেখাচিত্র*, 'স্বাগত' (ভূমিকা)

৮২. 'প্রকাশকের নিবেদন', *শিখা*, ১ম বর্ষ।

৮৩. উদ্ধৃত, আবদুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৯

৮৪. ১৩১১ সালের ভাদ্র সংখ্যা 'নবনূর'–এ প্রকাশিত 'আমাদের অবনতি' শীর্ষক প্রবন্ধে বেগম রোকেয়া প্রায় স্পষ্টত মহাপুরুষদের প্রেরিতত্ব ও ধর্মগ্রন্থের ঐশিতা অস্বীকার করেন। পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় প্রবন্ধের এসব অংশ বর্জিত হয়। দ্র. 'সম্পাদকের নিবেদন', *বেগম রোকেয়া রচনাবলী*, আবদুল কাদির সম্পাদিত, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩, পৃ. (১১–১২)। মুসলিম মেয়েদের বৃহত্তর কল্যাণের কথা ভেবেই রোকেয়া অনেক ক্ষেত্রে সমাজের সঙ্গে আপোষ রফা করতে বাধ্য হন। এমন ঘটনা আবুল হুসেন ও আবদুল ওদুদের জীবনেও দেখা যায়।

৮৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪০–৪১

www.pathagar.com

৮৬. 'রিনেসাঁস : গোড়ার কথা ও আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী', *সংস্কৃতি-কথা*, বাংলা একাডেমী, দ্বি-স ১৯৭০, পৃ. ৬৯

৮৭. আহমদ নূরুল ইসলাম, পৃ. ১৫৯-৬০

৮৮. 'ভূমিকা', বাংলার রেনেসাঁস, *প্রবন্ধ সমগ্র (২য় খণ্ড)*, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি. কোলকাতা, ১৯৯৩, পৃ. ৩০৭

৮৯. Soumitra Sinha, Ibid, p. 127

৯০. 'চিত্রকরের চোখের আলোয় যিনি সাহিত্যের পথ চলেছিলেন', *দেশ*, ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮, পৃ. ৯৭

৯১. শামসুজ্জামান খানের সঙ্গে সাক্ষাৎকার, *চারিত্র*, ১ম সংকলন, মে ১৯৭৯ ; উদ্ধৃত, রফিকুল ইসলাম, আবদুল কাদির, বাংলা একাডেমী, পৃ. ১২-১৩

৯২. *A New Renaissance*, Minerva Associates (pub.) Pvt. Ltd. Calcutta, 1998, p. 82

৯৩. বিনয় ঘোষ, *বাংলার নবজাগৃতি*, ওরিয়েন্ট লংম্যান, কোলকাতা, দ্বি-স ১৩৯১, পৃ. ৭৪-৭৫

৯৪. 'কাজী আবদুল ওদুদ', *ওদুদ-চর্চা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৭

৯৫. 'ভিন্ন দৃষ্টিতে কাজী আবদুল ওদুদ', *সময় সমাজ মানুষ*, বিদ্যা প্রকাশ, ১৯৯৫, পৃ. ১০৮

৯৬. 'কাজী আবদুল ওদুদ', প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৭

৯৭. ঐ, পৃ. ১২৫

৯৮. ৭. ১০. ১৯৩১ ইং তারিখে মুসলিম হলের প্রভোস্ট ৮৮১ স্মারক সংখ্যক চিঠিতে সাহিত্য সমাজের ষষ্ঠ বর্ষের সম্পাদক মোহাম্মদ ইউসুফকে লেখেন : "I was unable to recommend your application to the vice-chancellor for the loan of the Assembly Hall for the function of the Muslim Shahitya Samaj, for reasons which I explained to you at great length personally." আহমদ নূরুল ইসলাম, পৃ. ১০৩

৯৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯

www.pathagar.com

প্রথম বার্ষিক অধিবেশনের অভ্যর্থনা-সভাপতির অভিভাষণ

এ. এফ. রহমান

সমবেত সাহিত্যপ্রাণ সুধীমণ্ডলী,

অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে আমি সাদর সম্ভাষণ জানাচ্ছি। 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' একটা নূতন উদ্যম—আমাদের সমাজের নূতন জাগরণের একটা সামান্য চিহ্ন। আপনারা যে দয়া করে তাহার সফলতা কামনা করে এই সাহিত্য সমাজের উৎসাহ বর্দ্ধন করবার জন্য এসেছেন, সেজন্য আমাদের সকলের আন্তরিক ধন্যবাদ আর কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। সাহিত্য চর্চার এই ক্ষীণ ধারাটুকু যাতে স্রোতে পরিণত হয়, সে জন্য এই বার্ষিক সম্মিলনের সৃষ্টি। আপনাদের ন্যায় সাহিত্যানুরাগীদের শুভদৃষ্টি আমাদের প্রতি থাকলেই আমাদের সব আশা সফল হবে।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির সাদর সম্ভাষণ জানাবার পর আর বিশেষ কিছু বলবার থাকে না। কিন্তু যাঁরা আমাকে এই উচ্চপদে অভিষিক্ত করেছেন তাঁরা ত ছাড়বেন না। তাই সংক্ষেপে দু'চারটী কথা নিবেদন করছি। আমি দেশের ও সমাজের সামান্য সেবক। আমি যা নিবেদন করছি তা কোন গভীর জ্ঞানের কথা নয়, তবে যে যৎসামান্য আমার অভিজ্ঞতা জন্মেছে তাই বলতে চাই।

শুনেছি পরাধীন জাতির (Subject Race-র) কোন পলিটিকস্ নাই। কথাটা সত্য না মিথ্যা তা আপনারাই বিচার করবেন। কিন্তু আমি দেখি আমাদের দেশে politics ছাড়া আর কিছুই যেন নাই, আর তাও যেন এক ধরনের। আমরা যেন কিছু একটাকে ভেঙ্গে চুরমার করে ফেলবার জন্যই ব্যস্ত। কিছু গড়ে তুলবার জন্য যেন আমাদের উৎসাহই নাই। দূরবীন দিয়ে শাসন কর্তাদের দেখতে দেখতে নিজেরা যে কি বা কি হয়ে যাচ্ছি তা ভাববার সময়ই হয় না। মুসলমানদের কথা বলছি তাঁরা যেন অতীতের স্মৃতির সৌরভেই মুগ্ধ, ঠিক যেন গোরস্থানে স্মৃতি স্তম্ভগুলো 'জোয়ারৎ' করে পুণ্যভোগী হয়েই তাঁরা নিশ্চিত হন। অবশ্য ঐতিহাসিকেরা বলবেন যে, অতীতই ভবিষ্যতের পথ প্রদর্শক। আমরা যে ভবিষ্যতটার কথা ভাবতেই চেষ্টা করি না। যে জাতি এককালে পৃথিবীর শীর্ষ স্থানীয় ছিল এবং সর্ব্বজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধন করেছিল, আজ যেন সর্ব্বত্রই তার অধঃপতন। আমাদের মধ্যে অতীতের সে রকম কোন চর্চ্চাও নাই,—ভবিষ্যতেরও কোন আদর্শ নাই। আমাদের সামাজিক জীবন এত লক্ষ্যহীন বলেই আমরা সাহিত্য চর্চ্চায় এত উদাসীন। ইতিহাসে দেখা যায় যে কোন দেশ বা জাতি উন্নতি করেছে পূর্ব্বে সাহিত্যই তার জীবনীশক্তি ফুটিয়ে তুলেছিল। সাহিত্য জীবনী শক্তির পরিচায়ক। বলবার মত কথা থাকলে ভাষার অভাব হয় না। আর বলবার মত কথা না থাকলেই সাহিত্যেরও সৃষ্টি হয় না। পৃথিবীর ইতিহাস পাঠ করে পরীক্ষা পাশ করাই জীবনের উদ্দেশ্য নয়। ইতিহাস জ্ঞানের আকর। কিন্তু সেই জ্ঞান শুধু নিজে উপলব্ধি করা জ্ঞানীর মত কাজ নয়। জ্ঞান বা সত্য প্রচার করা ; সমাজ, দেশ, পৃথিবী সত্যের আদর্শে গড়ে তুলা সেই

www.pathagar.com

হলো মানুষের মত কাজ। আর সেখানেই সাহিত্যের আশ্রয় নিতে হবে। অতীতের সমুজ্জল ছবি আঁকতে হলে, ভবিষ্যতের আদর্শ দেখিয়ে দিতে হলে বা সত্যের সৌন্দর্য্য বিকাশ করতে হলে সাহিত্যই একমাত্র উপায়। সত্যের মত সাহিত্যও সীমাবদ্ধ নয়। যেমন পৃথিবীর সাহিত্যে আমার অধিকার আছে, তেমনি আমাদের সাহিত্য সত্য হলে পৃথিবী তা আপন করে নেবে। জাতীয় জীবন-সংগ্রামে সাহিত্য একটি অস্ত্র। যুদ্ধের সময় জাতীয় সঙ্গীত (National anthem) যে কাজ করে শান্তির কালে সাহিত্যও ঠিক সেই কাজ করে। যে জাতির পরিবর্ত্তন নাই, তার কোন ইতিহাস নাই। যে জাতিতে সাহিত্য চর্চ্চা নাই তারা নিজেদের ইতিহাসের উপর সমাধি মন্দির তুলে দিয়েছে।

আজকার সাহিত্য সম্মিলনের একটা বিশেষ উদ্দেশ্য আছে ; এবং যাদের জন্য এই সাহিত্য সমাজের সৃষ্টি তাদের নিকট দু একটী কথা নিবেদন করছি। আমারই জীবনে এমন একটা সময় দেখেছি যখন নিজের ভাষাটা না জানাই সভ্যতার চিহ্ন বলে ধরা হতো ; আর নিজের ভাষাও একটু ইংরাজীর অনুকরণে না বলতে পারলে সভ্যতার একটু হানি হতো। ফলে, একটা উদার দলের সৃষ্টি হচ্ছিল যাঁরা ইউরোপ ও এশিয়ার মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকতেন। নিজের দেশের প্রতি তাঁদের কোন সহানুভূতি ছিল না ; ভিন্ন দেশও তাঁদের প্রতি কোন সহানুভূতি করতো না। অবশ্য আজ সে অবস্থাটা (Phase-টা) কেটে গেছে। তাতে একটু উপকারও হয়েছে। একটা প্রতিক্রিয়ার (reaction-র) ফলে আমরা আজ জাতীয় আত্মসম্মান ফিরে পেয়েছি। বৈদেশিক সভ্যতা যে নিতান্ত সজোর সুতরাং সর্ব্বগ্রাসী তা বুঝতে পেরেই সাহিত্যের দ্বারা নিজেদের সামাজিক জীবন গড়ে তুলবার একটা উৎসাহ আমাদের হয়েছে। বাংলার আকাশে রবিও উদয় হয়েছে অনেকগুলো তারাও ফুটেছে। তবুও, একজন university-র ছাত্রকে যদি কোনো ভিন্ন জাতির দশজন বিখ্যাত লোকের নাম করতে বলি সে অনায়াসেই তা পারবে। নিজের দেশের দশ জনের নাম করতে হলে, সে অনেকটা ইতস্ততঃ করবে। শেষে হয়তো দশ জনকে খুঁজেই পাবে না। নিজেদের ভাষায় অবনতি ও নিজেদের সাহিত্যে ঔদাসীন্যই তার কারণ। আবার আমাদের নিজেদের উপরে বিশ্বাস এত কম যে আমরা যাই লিখি বা বলি ইউরোপের একটা 'হল মার্কের' ছাপ না পড়লে সে জিনিসটাকে খাঁটি বলে গ্রহণ করতেই আমরা রাজী নই। এমন কি আমাদের কোন কোন ঐতিহাসিক এই দেখাতেই ব্যস্ত যে ইউরোপে পূর্ব্বকালে যা ছিল বা আজ যা হয়েছে বা হচ্ছে ভারতেও ঠিক সে সবই ছিল। তা ছাড়া যেন ভারতের সভ্যতাই প্রমাণ করা যায় না। কালীদাসকে ভারতের Shakespeare না বললে যেন কালীদাসের মর্য্যাদা রক্ষা করা যায় না। এগুলো বলবার উদ্দেশ্য আর কিছুই নয় শুধু আমাদের মনের গতি দেখিয়ে দেওয়া। অনুকরণ প্রবৃত্তিটা এত প্রবল হয়ে দাঁড়িয়েছে যে নিজের উপর ক্রমশঃ বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছি। পৃথিবীটাকে নূতন কিছু দেবার আমাদের অধিকার বা ক্ষমতা আছে, তার ধারণাই যেন আমাদের হয় না। সাহিত্যের চর্চ্চা করলে আত্মবিশ্বাস ফিরে আসবে—অতীতের জ্ঞানের আলো ভবিষ্যতের তিমির ভেদ করে পথ দেখিয়ে দেবে এই আমার বিশ্বাস। মুসলমানদের এ বিষয়ে অগ্রগামী হওয়া উচিৎ। আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতার মূলেই হচ্ছে সেই প্রথম মুসলমানদের জলজীবন্ত উৎসাহ। তাঁরাই প্রচার করেছিলেন 'জ্ঞান, ধর্ম্ম, কত কাব্যকাহিনী।'

এই প্রসঙ্গে আর একটী কথা বলি। একটা বিষম আন্দোলন শুনতে পাই যে বাংলাদেশে মুসলমানদের মাতৃভাষা কি? দুই উপায়ে তার নিষ্পত্তি হতে পারে। বৈজ্ঞানিক উপায়ে যদি

www.pathagar.com

statistics নেওয়া যায় ; অর্থাৎ বাংলাদেশে কত মুসলমান আছে, কত পুরুষ, কত স্ত্রী, কার কি ভাষা? তবে অঙ্ক শাস্ত্রের সাহায্যে একটা নিষ্পত্তি হয়। তা না হলে মাতৃজাতিকে. জিজ্ঞাসা করতে হয় যে তাঁদের ভাষা কি? কিন্তু এই আন্দোলনের আর একটু অংশ আছে। বাঙ্গালী মুসলমানদের মাতৃভাষা কি হওয়া উচিৎ? এই সমস্যার মীমাংসা আপনারা করবেন। তবে আমার মনে হয়, আমার যদিও বিশেষ জানা নাই—যে জাতি বা ধর্ম্ম হিসাবে ভাষা হয় নাই, দেশ হিসাবেই ভাষা হয়েছে। এক এক দেশের এক এক ভাষা। সুতরাং যে দেশে আমাদের বাস তার ভাষাও আমাদের। এ স্থলে মুসলমানদের অন্তরের কথাটুকুও বলা উচিৎ। তাঁদের ধর্ম্ম একটা প্রগাঢ় একতার সৃষ্টি করেছে। অন্ততঃ ভারতবর্ষে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন ভাষা হলেও মুসলমান সমাজে সাধারণভাবে উর্দ্দু প্রচলিত আছে। যে কারণেই হউক উর্দ্দুকে মুসলমানের ভাষা বলে গণ্য করা হয়েছে। এবং এই ভাষার বলেই মনের দিক থেকে একটা একতা আছে। সেই একতাটা নষ্ট করতে মুসলমানেরা স্বীকৃত হন না। এই জন্যই এ আন্দোলনের মীমাংসা হয় না। আমি শুধু এইটুকু বলতে চাই যে, যে দেশে বাস সে দেশের ভাষা না জানলে কতদূর ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয় তা সহজেই বুঝতে পারেন। ঠিক যেন মনে হয় পেছনের দিকে মুখ ঘুরিয়ে সম্মুখের দিকে অগ্রসর হচ্ছি। যদিও এ বিষয়ের তর্ক ও মীমাংসা আপনারা করবেন, আমার মনে হয় না যে বাঙ্গালী মুসলমানের বাংলা সাহিত্যের চর্চ্চা করতে বা তার উৎকর্ষ সাধন করতে কোন বাধা–বিঘ্ন হতে পারে। এটা একটী ঐতিহাসিক সত্য যে বাঙ্গলার স্বাধীন মুসলমান সুলতানেরা বাংলা ভাষার যথেষ্ট উন্নতি সাধন করেছিলেন। সম্ভবতঃ তাঁদের উৎসাহে বাংলাভাষা 'সাহিত্যিক' ভাষা হয়েছে। সংস্কৃত রামায়ণ ও মহাভারতে প্রথম আকৃষ্ট হয়ে বাংলার অধিপতি নাসির শাহের (১২৮২–১৩২৫) আদেশে মহাভারত বাংলায় অনূদিত হয় এবং বিদ্যাপতি এই নাসির শাহকে সঙ্গীতে অমর করেছেন। কোন মুসলমান অধিপতি না রাজা কংস নারায়ণ কৃত্তিবাস দ্বারা রামায়ণ বাংলায় অনুবাদ করিয়েছিলেন তা ঠিক জানা যায় না ; কিন্তু এটা নিশ্চিত যে নাসির শাহের উদাহরণ স্মরণ করেই এটা করা হয়েছিল।

হোসেন শাহ বাংলা ভাষার patron ছিলেন। ভগবত পুরাণ বাংলা ভাষায় অনুবাদ করবার জন্য তিনি মালাধর বসুকে নিযুক্ত করেন। হোসেন শাহ গৌড়ের কাছে যে মাদ্রাসা তৈরী করেছিলেন তার উপরে তিনি লিখে দিয়েছিলেন যে, 'হজরত মহম্মদ বলেছেন, যদি চীন দেশে যেতে হয় তবুও জ্ঞানের অনুসরণ কর।' এই মহৎ বাণীই আজ আমাদের আদর্শ হউক।

হোসেন শাহের সেনাপতি পরাগল খাঁ এবং তাঁর পুত্র ছুটী খাঁ মহাভারতের বাংলা অনুবাদে অক্ষয় কীর্তি রেখে গিয়েছেন। ফেনীর নিকটে পরাগলপুরের প্রাসাদে কবীন্দ্র পরমেশ্বর প্রতিদিন বাংলা মহাভারতের আবৃত্তি করতেন এবং ছুটী খাঁর আদেশে কবি শ্রীকর নন্দী অশ্বমেধ পর্ব্ব বাংলায় অনুবাদ করেন। এই মুসলমান অধিপতি ও শাসনকর্তাদের উৎসাহে বহু সংস্কৃত ও পার্শী গ্রন্থ বাংলায় অনূদিত হয়। সংস্কৃত অনুরাগী ব্রাহ্মণেরা বাংলা ভাষাকে বড় ভালো চোখে দেখতেন না, কিন্তু মুসলমান সুলতানদের উৎসাহেই বাংলার ক্রমোন্নতি হয়। পরবর্ত্তী হিন্দু রাজগণও মুসলমানদের অনুকরণে বাংলা ভাষার অনেক উৎকর্ষ সাধন করেন। প্রায় প্রতি রাজদরবার বিখ্যাত বিখ্যাত বাঙ্গালী কবি দ্বারা অলঙ্কৃত হয়েছে। ক্রমে বাংলা সংস্কৃত ও পার্শীর প্রতিযোগী হয়ে উঠলো। এ ছাড়া কত মুসলমান কবি বাংলাতে

www.pathagar.com

কত 'লোকসঙ্গীত' সুধা লিখে গিয়েছেন তার তো সীমাই নাই। এটুকু বলবার উদ্দেশ্য এই যে মুসলমানদের উৎসাহে বাংলা সাহিত্যের এত উন্নতি। এখন যদি বাঙ্গালী মুসলমান আবার বাংলা সাহিত্যের প্রতি মনোনিবেশ করেন তবেই তাঁরা জাতীয় কীর্তি অক্ষুণ্ন রাখতে পারবেন। মুসলমান জাতির ইতিহাস যিনিই পড়েছেন তিনি জানেন যে সাহিত্যে তাঁদের অমর কীর্তি। আধুনিক মুসলমানদের সাহিত্যবিমুখ হওয়া আর জাতিকে খর্ব্ব করা ও সর্ব্বনাশের পথে তুলে দেওয়া এক কথা।

আর একটি কথা। দেশে জাতীয় উন্নতির একটা হাওয়া চলছে, কিন্তু দেশের আকাশে সাম্প্রদায়িক বিবাদের কালমেঘও দেখা দিয়েছে। একে অন্যের বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে না জানতে পারলেই মনোবিবাদ হয়। এই সাম্প্রদায়িক মনান্তর দূর করবার জন্য সাহিত্য কতটা সাহায্য করতে পারে, তা বুঝিয়ে বলা নিষ্প্রয়োজন। সেদিক দিয়েও প্রত্যেক স্বদেশ-প্রেমিকের সাহিত্য জিনিসটার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ করা প্রয়োজন। আজ মুসলমান যদি শুধু নিজেদের দাবী দাওয়া নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন, আর জ্ঞান-জগতের সহানুভূতি আকর্ষণ করতে না পারেন, তবে তার উন্নতি এখনও অনেক দূরে।

আপনাদের অনেক সময় নষ্ট করেছি। প্রথমেই বলেছি দূরবীণ দিয়ে নিজেদেরকে দেখবার চেষ্টা করেছি, তাই কিছু অপ্রিয় কথাও বলতে হয়েছে। কিন্তু যে নিজের দোষ ত্রুটীটুকু ধরতে পারে সেই কৃতকার্য হতে পারে। এই 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' একটা অসীম অভাব দূর করবার জন্যই হয়েছে। এ আমাদের জাতীয় জীবনে একটী নূতন স্পন্দনের চিহ্ন। এই ক্ষীণ প্রবাহটুকু কালে একটী স্রোতে পরিণত হয় এই প্রার্থনা করি। এই সাহিত্যের পূজায় আপনারা যে কষ্ট স্বীকার করে নিজ নিজ অর্ঘ্য নিয়ে যোগদান করেছেন তজ্জন্য অভ্যর্থনা সমিতি চিরকৃতজ্ঞ। আপনারা আমাদের অন্তরের ধন্যবাদ গ্রহণ করুন। আপনাদের উপযুক্ত অভ্যর্থনার উপকরণ আমাদের নাই। গঙ্গাপূজা গঙ্গাজলেই হয়।

www.pathagar.com

প্রথম বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতির অভিভাষণ

খান বাহাদুর তসদ্দক আহমদ

যে দিন বন্ধুবর মৌলভী আবুল হোসেন আজিকার এই সভায় পৌরহিত্য করিবার জন্য তাঁহার ফরমান জারি করিয়া বসিলেন সে দিন কি হৃদ্‌কম্পই না উপস্থিত হইয়াছিল! অনেক অজুহাত পেশ করিয়াও যখন রেহাই পাইলাম না তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া অগত্যা এই গুরুভার গ্রহণ করিতে রাজী হইলাম। তখন ভাবি নাই ভারটা কিরূপ গুরুতর হইতে পারে। একদিকে বন্ধুবর্গের অপ্রীতিভাজন হইবার ভয়, অপর দিকে নিজেকে এই সাহিত্যিক মণ্ডলীর নিকট হাস্যাস্পদ করিবার আশঙ্কা—দুই দিকের টানে যে কি নাজেহাল হইয়াছিলাম তাহা ভুক্তভোগী ব্যতীত কেহ বুঝিবে না। অবশেষে 'আমিত্ব'-কেই আড়াল করিয়া দাঁড়ান স্থির করিলাম ; বন্ধুবর্গেরই জয় হইল। আজিকার সভার সকল সাফল্য, সকল গৌরব আমার প্রীতিভাজন বন্ধুবর্গেরই ; আমি তাহার জন্য বিন্দুমাত্রও দায়ী নহি।

বন্ধুগণ, আজিকার এ সম্মানের জন্য আমার আন্তরিক ধন্যবাদ গ্রহণ করুন। আপনাদের এই শুভ অনুষ্ঠানে যে আমাকে এত ঘনিষ্ঠভাবে যোগ দিবার সুযোগ দিয়াছেন তজ্জন্য নিজেকে ধন্য মনে করিতেছি। আজ এই সভায় যে দুই চারি কথা বলিব তাহা হয়ত কাহারও ভাল লাগিবে, কাহারও লাগিবে না। তবে এটুকু ঠিক যে, যে সমাজে বাস করি সেই সমাজ ও তাহার সাহিত্য সম্বন্ধে নিজের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যেরূপ ভাবিয়াছি তাহাই অকপটে আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত করিতে সাধ্যমত চেষ্টা করিব। প্রশংসার আশা বা নিন্দার ভয় করিব না। কারণ আমি বেশ জানি যে এই জোর-করিয়া-চাপাইয়া-দেওয়া পৌরহিত্য শেষ হইলেই পুনরায় আমার সেই নিভৃত গৃহকোণটির আশ্রয় গ্রহণ করিতে আপনারা আমাকে কেহই বাধা দিতে পারিবেন না। দেশের আইন তাহাতে আপনাদিগকে একটুও সাহায্য করিবে না।

নিজের কথা এতটা বলা আমার উদ্দেশ্য ছিল না, কারণ জানি যে নিজের কাছে যতই মধুর হউক না কেন অপরের নিকট তাহা সর্ব্বদাই শ্রুতিকটু। কিন্তু মাতৃভাষার এমনি মহিমা যে কথা বলাটাই যেন আনন্দের বলিয়া মনে হয়। বাঙ্গালা যে আমার মাতৃভাষা সে কথাটা আপনাদের সমক্ষে জোর গলায় বলিতে আমার একটুও দ্বিধা বোধ হয় না। কারণ তাহা না হইলে আমার নিজের মা-কেই অস্বীকার করিতে হয়। এতটা অধোগতি আপনাদের আশীর্ব্বাদে এখনও আমার হয় নাই। তবু নাকি শুনি এই বাঙ্গালা দেশে এমনও অনেক মুসলিম আছেন যাঁহারা বাঙ্গালা ভাষাকে তাঁহাদের মাতৃভাষা বলিয়া স্বীকার করিতে লজ্জা বা অপমান বোধ করেন। তাঁহারা নাকি বলেন 'শরিফ' অর্থাৎ সদ্বংশজাত মুসলমান বলিয়া পরিচয় দিতে হইলে মাতৃভাষাটাকে না বদ্‌লাইয়া চলিবে না। আপনারাই পাঁচজনে বিচার করুন শিক্ষকতা করি বলিয়াই কি নিজের মা-কেও বেত্র হস্তে তাড়না করিব, 'অতঃপর তুমি তোমার ভাষা বদ্‌লাইয়া ফেলিবে, নতুবা তোমাকে মা বলিয়া স্বীকার করা আমার পক্ষে

www.pathagar.com

অপমানজনক হইবে?' এই বাঙ্গালাদেশের লোকসংখ্যা ৪,৭৫,৯২,৪৬২, তার মধ্যে ২,৫৪,৮৬,১২৪ জন মুসলিম নরনারী। বন্ধুগণ, ভাবিয়া দেখুন এই এতগুলি মুসলিম নরনারীর ঘর, বাড়ী কাটিয়া খাট, বিছানা, বাক্স, তোরঙ্গ, জমি জিরাত সিন্দাবাদের ন্যায় স্কন্ধে লইয়া 'শরাফত হাসেল' করিবার জন্য যেখানে বাঙ্গালা ভাষা নাই এরূপ প্রদেশে উঠিয়া গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করা কি সম্ভবপর? অপরপক্ষে উর্দ্দু ভাষাকে বাঙ্গালাদেশের পল্লীগ্রামসমূহে কলমের জোরে চালাইবার সে নিষ্ফল প্রয়াস কিছুদিন পূর্বে হইয়াছিল তাহাও বোধহয় আপনাদের অনেকের নিকট অবিদিত নহে।

এক সম্প্রদায় বলেন, 'আমরা বাঙ্গালী মুসলমান যে ভাষায় কথা বলি তাহা ঠিক বাঙ্গালা নয় ; উর্দ্দু, পারশী, আরবী-বহুল এক মিশ্র ভাষা। সেই ভাষাই আমাদের সাহিত্যের ভাষা হওয়া উচিত।' কথাটা মন্দ নয়, কিন্তু তাহার মধ্যে একটা মস্ত গলদ রহিয়া গিয়াছে। আমির হামজা বা হাতেম তাইয়ের পুঁথি, কাসাসুল-আম্বিয়া বা সোনাভানের পুঁথি যে ভাষায় রচিত তাহা আমাদের সমাজের বহুতর ব্যক্তির আদরের জিনিস হইতে পারে কিন্তু তাহা সাহিত্য হিসাবে পৃথিবীর লোকের নিকট আদরণীয় বা অনুকরণীয় কোন কালেই হয় নাই। তাহা হইলে আজ শুধু বটতলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ না থাকিয়া তাহা পৃথিবীময় ব্যাপ্ত হইয়া পড়িত।

সাহিত্য জিনিসটা কাহারও একচেটিয়া সম্পত্তি নহে ; সকলেরই তাহাতে সমান অধিকার। এই বাঙ্গালা দেশে আমরা হিন্দু মুসলিম দুইটি বৃহৎ সম্প্রদায় বহুকাল যাবৎ একত্র বাস করিয়া আসিতেছি। সাহিত্যকে গঠন করিবার জন্য ও পুষ্ট করিবার জন্য আমাদের উভয়েরই সমান অধিকার। কিন্তু বলিতে লজ্জা বোধ হয় আমাদের কর্তব্য সম্বন্ধে আমরা এতদিন সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলাম। যখন বাঙ্গালা সাহিত্য হিন্দু সমাজের বহু কৃতী সন্তানের দ্বারা শণৈঃ শণৈঃ গঠিত, পুষ্ট ও বর্দ্ধিত হইতেছিল তখন আমরা কেবল সমরখন্দ ও বোখারা, আরব ও ইস্পাহানের স্বপ্ন দেখিতেছিলাম। ইংরাজী শিক্ষার প্রথম আমলে যেমন অদূরদর্শী জননায়কগণের প্ররোচনায় পড়িয়া আমরা 'কাফের' হইবার ভয়ে ইংরেজী ভাষাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলাম, বাঙ্গালা ভাষার উদ্বোধন কালেও আমরা সেইরূপ দূরে দাঁড়াইয়া নিজেদের পবিত্রতা রক্ষা করিয়াছি, আর পরের গালি খাইয়া নীরবে হজম করিয়াছি। আমি এখানে সেই হোসেনশাহী যুগের মুসলিম কবিগণের কথা উত্থাপন করিতেছি না, কারণ যদিও তাঁহারা এখন প্রত্নতত্ত্ববিদগণের খোরাক যোগাইতেছেন তথাপি সমাজের ঘাত প্রতিঘাত সহ্য করিবার জন্য আমাদের সাহিত্য জীবনকে কতদূর কর্ম্মঠ ও বলিষ্ঠ করিয়াছেন তাহা আমাপেক্ষা আপনারাই নিশ্চয় ভাল বুঝিবেন। আসল কথা প্রধানতঃ যে উপাদান দিয়া জাতীয় জীবন গঠিত হয় তাহা নির্দ্ধারণ করিতে আমাদের বহু কালক্ষয় হইয়াছে ; এখনও সম্যক উপলব্ধি হইয়াছে কিনা সন্দেহ। তবে আশা হয় আপনাদের ন্যায় অনুষ্ঠানের যতই বৃদ্ধি হইবে ততই পূর্ব্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে। আমরাও জনসমাজের অপর দশ জনের ন্যায় আদৃত, সম্মানিত হইতে থাকিব।

মানুষ সংসারে একাকী বাস করিতে পারে না। সঙ্ঘ বা সমাজবদ্ধ হইয়া থাকাই তাহার অভ্যাস। সমাজের উত্তরোত্তর উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তাহার অন্তর্গত ব্যক্তিবর্গের সম্বন্ধ নানা প্রকারে ক্রমে জটিল হইতে জটিলতর হইয়া উঠে। এই সম্বন্ধ নির্ণয় ব্যাপারে মানুষ ভাষার দ্বারা মনের ভাব প্রকাশ করে এবং অপরের নিকট নিজেকে বোধগম্য করে। মনের ভাবকে

www.pathagar.com

মূর্তরূপে প্রকট করিবার জন্য মানুষের কী প্রচেষ্টা ! সঙ্গীতে, কাব্যে, চিত্রে, অর্থবোধক শব্দের আকারে নানা উপায়ে মানুষ স্বীয় মনের ভাব ব্যক্ত করে। সুতরাং ব্যাপক অর্থে যে যে উপায় দ্বারা মানুষ মনের ভাব প্রকাশ করে তাহাই সাহিত্য। যে জাতির এই সকল উপায় যত কম সেই জাতি সাহিত্য হিসাবে তত দরিদ্র। এই মাপকাঠি দিয়া দেখিলে বাঙ্গালী মুসলিম সমাজ আজ পৃথিবীর সকল সভ্য সমাজ অপেক্ষা কত দরিদ্র ! সাহিত্য আমাদিগকে জ্ঞান দান করে, আনন্দ দান করে, কর্ম্মের জন্য প্রেরণা সঞ্চার করে। আমরা এমনি হতভাগ্য যে আমাদের না আছে জ্ঞান লাভ করিবার শক্তি, না আছে আনন্দ উপভোগ করিবার ক্ষমতা, না আছে কর্ম্মের জন্য উৎসাহ। যে সাহিত্যের অমৃতধারা আমাদিগকে নানা জ্ঞানে পুষ্ট করিতে পারিত, নতুন বলে বলীয়ান করিতে পারিত, কর্ম্মে উৎসাহিত করিতে পারিত, আমরা অর্বাচীনের ন্যায় তাহা অবহেলা করিয়া আসিয়াছি। আজ আমরা অপরাপর সম্প্রদায়ের উন্নতিতে ঈর্ষান্বিত হই, কিন্তু আমাদের দুরবস্থার জন্য যে আমরাই প্রধানত দায়ী তাহা এক বাতুল ব্যতীত আর কে অস্বীকার করিবে ?

এখন প্রশ্ন হইতে পারে আমাদের সাহিত্যের প্রকৃতি কি হইবে ? বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতি আমাদের আবহমান কালের অবহেলার জন্য তাহা ভিন্ন সম্প্রদায় কর্ত্তৃক এরূপে গঠিত হইয়াছে যে তাহাতে আমাদের নিজস্ব কিছু আছে বলিয়া মনে হয় না। আমাদের ধর্ম্ম, আমাদের পূর্বতন ইতিহাস, আমাদের সমাজ, আমাদের আচার, ব্যবহার, রীতিনীতি, বাঙ্গালার সাহিত্যের অপর উপাসকগণের হইতে বিভিন্ন। অথচ বাঙ্গালা সাহিত্যই আমাদের একমাত্র সাহিত্য। এই অবস্থায় সেই সাহিত্যকে আমাদের উপযোগী করিয়া গড়িয়া তুলিতে না পারিলে আমাদের বাঁচিবার উপায় কি ? আমার মনে হয় যে দেশে আমরা বাস করি, যে দেশের আবহাওয়ায় আমরা প্রতিপালিত, সে দেশের অপরাপর সম্প্রদায়ের সহিত মিলিত থাকিয়াও আমরা আমাদের ব্যক্তিত্ব (individuality) রক্ষা করিতে সক্ষম। যদি আমরা আমাদের ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য হারাইয়া ফেলি তাহা হইলে আমরা মুসলিম বলিয়া পরিগণিত হইবার যোগ্য নহি। সাহিত্য যখন সকলেরই সম্পত্তি তখন সকলেই তাহার কলেবর বৃদ্ধি করিবার সমান অধিকারী এবং সে জন্য সমান দায়ী। আমি আমার অংশটুকু দিলাম, আপনি আপনার অংশটুকু দিলেন, এই ভাবেই সাহিত্য বাড়িয়া উঠিবে। হিন্দু ভ্রাতৃগণ তাহাদের অংশ পর্যাপ্ত পরিমাণে দিয়াছেন এবং দিতেছেন ; আমরা আমাদের অংশ দিই নাই। এখন দিতে আরম্ভ করিয়াছি। ক্রমেই আমাদিগকে অধিকতর পরিমাণে দিতে হইবে। তখন আমরা বাঙালী হিন্দু ও মুসলিম দুই ভাই একই ভাষা-জননীর পীযূষধারা পান করিয়া বলীয়ান হইব।

তারপর দেখুন চেনা পরিচয় হইলেই তবে আত্মীয়তা হয়। সাত শত বৎসরের উপর হইয়া গিয়াছে আমরা একত্রে বাস করিতেছি কিন্তু কি পরিতাপের বিষয় এই দুই সম্প্রদায় পরস্পরকে কতটুকু চেনেন। বরং মুসলিম হিন্দুকে কিছু চেনেন কিন্তু হিন্দু মুসলিমের সম্বন্ধে খুবই কম জানেন। ইহার জন্য তাঁহাদিগকে দোষ দিতে পারি না। কারণ আমরা আমাদের পরিচয় এতদিন দেই নাই। এখন দিতে হইবে। না হলে দেশে ভয়ানক অকল্যাণ হইবে। এই বাঙ্গালা সাহিত্যের ভিতর দিয়া আমরা তাঁহাদিগকে আমাদের প্রকৃত পরিচয় দিব। তখন দেখিবেন পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা প্রীতি কত বাড়িয়া যাইবে। যদি আমাদের মধ্যে বাস্তবিক কোন গুণ থাকে, যদি আমাদের ধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম তাঁহারা অবগত হন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই জানিবেন সৌহৃদ্য ও সখ্যভাব স্থাপিত হইতে তিলার্দ্ধ বিলম্ব হইবে না।

www.pathagar.com

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আমাদের বিরোধ থাকিতে পারে, ধর্ম্ম সম্বন্ধে আমাদের অনৈক্য থাকিতে পারে, কিন্তু যদি আমরা সকলেই প্রকৃত মনুষ্যপদবাচ্য হই তাহা হইলে সুপরিচিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই একের অপরের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তির অভাব দূর হইবে। এই মিলন সাহিত্যের ভিতর দিয়াই সাধন করিতে হইবে। রাজনৈতিক Pact এর দ্বারা কখনও সম্ভবপর হইবে না।

আমাদের সাহিত্য কি করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে তাহাই এখন ভাবিবার বিষয়। বন্ধুগণ, অতীতকালে আমরা নবাব ছিলাম, বাদশাহ ছিলাম, সেই স্বপ্ন দেখিতে আমি আপনাদিগকে বলিতেছি না। সেই স্বপ্নের নেশায় এতদিন ভরপুর ছিলাম বলিয়াই আমাদের সর্বনাশ হইয়াছে। পারিপার্শ্বিক জগতকে বিস্মৃত হইয়া যখন মানুষ কেবল অতীতকালেই বাস করিতে চায় তখন সংসার পথে তাহাকে কেবল ঠোক্করই খাইতে হয়। কিন্তু তাই বলিয়া অতীতকে একেবারে ভুলিতে পারি না। মনুষ্যজীবনে, সমাজ-জীবনে অতীতের অনেক রেখাপাত থাকিয়া যায়, সে গুলিকে মুছিয়া ফেলা যায় না ; মুছিয়া ফেলা সমীচীনও নয়। অতীতের সহিত বর্তমানের সম্বন্ধ বড় ঘনিষ্ঠ। অতীতকে বিস্মৃত হইবার উপায় নাই, কারণ তাহা বর্তমানের সহিত একসূত্রে অবিচ্ছেদ্যভাবে গ্রথিত। আমরা অতীত হইতে আমাদের inspiration (প্রাণশক্তি) গ্রহণ করিব। অতীতের শিক্ষা, দীক্ষা, জ্ঞান, বিজ্ঞান, কাব্য, সাহিত্য, ইতিহাস, কলাশিল্পকে বর্তমান কালোপযোগী করিয়া জগতের সমক্ষে আমাদের গৌরব পতাকা উড্ডীয়মান করিব। আমাদের নাই কি? ছিল না কি? যে ধর্ম্মে হজরত রসুল-করিম মহম্মদ মোস্তফার ন্যায় নেতা, পথপ্রদর্শক, উপদেষ্টা আছেন, যে ধর্ম্মে কোরান-মজিদের ন্যায় অমূল্য গ্রন্থ বিদ্যমান, সেই ধর্ম্মাবলম্বীগণের দুনিয়ার পাথেয় সংগ্রহ করিবার জন্য আবার চিন্তা?

মানুষ স্বভাবতই অনুকরণ প্রিয় এবং সেই অনুকরণ সে তাহাকেই করিতে চায় যাহার প্রতি তাহার ভক্তি ও শ্রদ্ধা বিশেষভাবে বিদ্যমান। হজরত মহম্মদ মোস্তফাকে অনুকরণ করিতে না চায় এমন কোন ভক্তপ্রাণ মুসলিম আছে? এইখানে বোধ হয় ইহা বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে আমাদের সমাজে 'মিলাদ পাঠের' ব্যবস্থা আছে। কিন্তু তাহার ন্যায় বড় প্রহসন আর কিছুই হইতে পারে কিনা সন্দেহ। আমরা ভক্তি ভরে হজরত মহম্মদের নাম শ্রবণ করি, চোখে 'বোসা' (চুম্বন) দিই, কিন্তু তাঁহার প্রকৃত জীবনী সম্বন্ধে কয়জন খোঁজ রাখি? নানা প্রকারের অলৌকিক,আজগুবি গল্পের অবতারণা করিয়া তাঁহার জন্মবৃত্তান্ত পাঠ করিয়াই আমরা মিলাদ সমাপন করি। শিরণী (মিষ্টান্ন) বস্ত্রপ্রান্তে বাঁধিয়া হৃষ্টচিত্তে গৃহে ফিরিয়া যাই। যে আদর্শ আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করিলে আমাদের কিঞ্চিন্মাত্রও উপকার হইত তাহা আমাদের নিকট চিরদিন লুক্কায়িত থাকিয়া যায়। বন্ধুগণ, ধর্ম্ম জিনিসটা গৃহকোণে উঠাইয়া রাখিবার জিনিস নয়। আবশ্যক মত তাহাকে সম্ভ্রমের সহিত উচ্চাসন হইতে নামাইয়া, করণীয় অনুষ্ঠানের সমাপ্তির পর পুনরায় সেই আসনে উঠাইয়া রাখিলেই কর্তব্য শেষ হয় না। ধর্ম্ম দৈনন্দিন জীবনের ভিতর দিয়া সদা প্রবহমান। কথাবার্তা, কাজকর্ম, প্রত্যেক বিষয়েই ধর্ম্মাচরণ আবশ্যক। তাহার জন্য হজরত মহম্মদের ন্যায় আদর্শ ও মহামূল্য কোরানের উপদেশাবলী থাকিতে আমাদিগকে অন্যত্র যাইবার আবশ্যক কি? 'মুসলিম' বলিয়া শুধু গগনভেদী চীৎকার করিলে বা মসজিদের সম্মুখে বলপূর্বক বাজনা বন্ধ করিলেই জীবনটাকে 'সেরাতুল মোস্তাকিম' (সরলপথে) চালিত করা সম্ভবপর হইবে না। আমাদের সমাজে একদল

www.pathagar.com

লোক আছেন যাঁহারা বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠান প্রতিপালনে পাকা মুসলিম, কিন্তু ইসলামকে তাঁহারা বড় সঙ্কীর্ণ করিয়া দেখেন ; ইসলামের সার্বভৌমিক উদারতা তাঁহাদের প্রাণ স্পর্শ করিতে পারেনা। সামান্য কারণেই তাঁহাদের ধৈর্য্যচ্যুতি হয়। তাঁহারা মনে করেন যে ইসলাম এমনি ক্ষণভঙ্গুর যে ব্যক্তি বিশেষের সামান্য ভুলচুকেই ইসলামের সর্বনাশ হইবে, ইহা রসাতলে যাইবে। আর এক সম্প্রদায় আছেন যাহারা মুসলিম বলিয়া পরিচয় দেন ; মুসলিমের ন্যায্য গণ্ডা আদায় করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেন কিন্তু ইসলামের অবশ্য করণীয় হুকুমগুলি মানিয়া চলা দুর্বলতার চিহ্নস্বরূপ মনে করেন ; মুসলিম বলিয়া পরিচয় দিয়াই সকলের শ্রদ্ধার পাত্র হইবার দাবী করেন। তাঁহারা ভুলিয়া যান যে বাক্যে এবং কার্যে সামঞ্জস্য না থাকিলে অপরের শ্রদ্ধা সহজে পাওয়া যায় না। যাহা বিশ্বাস করি বলিয়া মুখে প্রচার করি তাহা যদি কার্যে পরিণত করিতে পরাঙ্মুখ হই তাহা হইলে আমি চরিত্রবান বলিয়া শ্লাঘা করিতে পারি না। Reformed Hiundus এর ন্যায় Reformed Muslims হইতে পারি কিন্তু খোদ ইসলামকে সংস্কার করিতে গেলে ভিত্তিটাই শিথিল হইয়া যাইবে। তাহার উপর সৌধ স্থাপনের চেষ্টা করা বৃথা হইবে। জীবন সংগ্রাম বলুন, বিজ্ঞান বলুন, শিল্প বলুন, সাহিত্য বলুন, সবই একটা আদর্শের (Ideal) অপেক্ষা করে। সেই আদর্শ না থাকিলে সাধনার স্পৃহা হয় না ; আবার সাধনা না থাকিলে সিদ্ধি লাভও হয় না। আমাদের সাহিত্যকে ইসলামের আদর্শে গড়িয়া তুলিতে হইবে ; প্রকৃত ইসলাম দ্বারা তাহাকে অনুপ্রাণিত করিতে হইবে। ইসলামের সঞ্জীবনী সুধায় সিঞ্চিত হইয়া আমাদের সাহিত্য অমর হইবে। প্রত্যেক মুসলিম নরনারী সেই সাহিত্যসুধা পান করিয়া অমর হইবে। প্রত্যেক মুসলিম বালক বালিকার শিরায় শিরায় তন্তুতে তন্তুতে সেই শক্তি তড়িত প্রবাহের ন্যায় কার্য করিবে। সাহিত্যকে এরূপ গড়িতে হইলে অক্লান্ত পরিশ্রম আবশ্যক, প্রকৃত সাধনা আবশ্যক, আলস্যতা পরিহার আবশ্যক। এই নিগৃহীত, অনাদৃত, অবজ্ঞাত বঙ্গীয় মুসলিম সমাজের আপনারাই ভবিষ্যৎ কর্ণধার, ভবিষ্যৎ আশাস্থল। এটুকু আশা করা কি অন্যায় হইবে যে আপনারা ইসলামের সেই উচ্চ আদর্শকে বঙ্গ সাহিত্যের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া নিজেরাও বরেণ্য হন, মুসলিম সমাজকেও ধন্য করেন?

প্রাতঃস্মরণীয় সার সৈয়দ আহমদ, মৌলানা শিবলি, হালি, নজির আহমদ বেলগ্রামী, মোহসেনুলমুলক, একবাল, গালেব প্রমুখ মনিষীগণ উর্দ্দু সাহিত্যেক পৃথিবীর মধ্যে এক অতি উচ্চ আসন প্রদান করিয়াছেন। আমাদের বাঙ্গালী মুসলিম সমাজেও এইরূপ লোকের আবির্ভাব আবশ্যক। আপনাদের ন্যায় নবীন কর্মীর দল যতই পুষ্ট হইবে ততই সে আশা পূর্ণ হইবার সময় নিকটবর্তী হইবে সন্দেহ নাই।

ইসলামের ভাবধারা ও অনুপ্রেরণা আপাতত আরবী, পারশি এবং উর্দ্দু ভাষার মধ্যেই নিবদ্ধ। সাধারণের মধ্যে এইসব ভাষার প্রচলন আমাদের বাঙ্গালা দেশে তত বেশি নাই। ইহার কোনটিকেই দেশবাসীর মাতৃভাষা বা জাতীয় ভাষা করাও সম্ভবপর নহে। সুতরাং এই সকল ভাষাবিদ্‌গণের নিকট আমাদিগকে বহুদিন পর্যন্ত ইসলামের ভাবধারার জন্য ঋণী থাকিতে হইবে।

যাহারা ঐ সকল ভাষা জানেন তাহাদিগকে বাঙ্গালা ভাষায় ইসলামের আদর্শকে ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। আবশ্যকমত ইসলামী ভাবাপন্ন শব্দাদি ধীরে ধীরে বাঙ্গালা ভাষায় প্রচলন

www.pathagar.com

করিতে হইবে। তাহাতে হিন্দু সাহিত্যিকগণ প্রথম প্রথম আপত্তি উত্থাপন করিতে পারেন কিন্তু আপনাদের শব্দের প্রযুজ্যতা বা ভাবের মহত্ত্বতা উপলব্ধি করিলে তাঁহারা তাহা গ্রহণ না করিয়া পারিবেন না। ভাষা ও সাহিত্য এইরূপেই শ্রীবৃদ্ধি সম্পন্ন হয়। জীবিত ভাষামাত্রেই এইরূপে তাহার বর্তমান সম্পদ লাভ করিয়াছে। আমাদের কোন কোন নবীন কবির আরবী ও পারশি শব্দ বহুল পদ্য-সাহিত্য আপাতত টিকা, টিপ্পনী সম্বলিত হইলেও সেই সময় সুদূরপরাহত নয় যখন সেগুলি সাহিত্যের বুকে বেমালুম স্থায়ী আসন অধিকার করিয়া বসিবে। ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম। সমাজে বলুন, সাহিত্যে বলুন এমন কি মানব-শরীরেও যখনই কোন নূতন কিছু প্রবেশাধিকার লাভ করিতে চায় তখনই বিষম দ্বন্দ্ব, তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয় কিন্তু কালে সেই নূতনই পরম পুরাতন, পরম মিত্র হইয়া দাঁড়ায়। আজ যদি টেবিলকে পীঠিকা, থিয়েটারকে রঙ্গমঞ্চ, সিনেমাকে চলচ্চিত্র প্রদর্শনী, আদালতকে ধর্ম্মাধিকরণ বলিতে যাই তাহা হইলে আপনারা প্রকাশ্যে কিছু না বলিলেও মনে মনে নিশ্চয়ই হাসিবেন। সেরূপ নিপুণ শিল্পীর ন্যায় আপনি যদি ইসলামী ভাব বা উক্ত ভাব সম্বলিত বৈদেশিক শব্দসমূহ সহজ সরল ভাবে বাঙ্গালা সাহিত্যের মধ্যে প্রবেশ করান তাহা হইলে ভাষা বা সাহিত্যের উপর নিশ্চয়ই কোন অত্যাচার করা হইবে না। তাই বলিয়া ইদানিং মক্তব ও মাদ্রাসার জন্য মধ্যে মধ্যে যে এক প্রকার অস্বাভাবিক সাহিত্য দেখিতে পাই তাহাতে সাহিত্যের পুষ্টি সাধন না হইয়া বরং অনিষ্টই হইবে বলিয়া আশঙ্কা হয়। এ সম্বন্ধে আমার মত এই যে, এই কার্য অত্যন্ত নিপুণতার সহিত করিতে হইবে এবং যিনি এ বিষয়ে তত সিদ্ধহস্ত ন'ন তিনি যদি এ চেষ্টা না করেন তাহা হইলেই ভাল হয়। যাঁহারা এ কাজে পাকা, তাহারাই করুন ; আমরা সকলে তাঁহাদের অনুসরণ করি।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা না বলিয়া পারিলাম না। বঙ্গ সাহিত্যের কোন কোন খ্যাতনামা লেখকের অনুকরণে আমাদের যুবক সম্প্রদায়ের মধ্যে একদল লেখক দেখা দিতেছেন যাঁহারা তাঁহাদের অর্থটা ভাষার বাঁধুনিতে ও ভঙ্গিতে লুকাইয়া রাখিতে চান। তাঁহারা ইচ্ছা করিয়াই অর্থটাকে দুর্বোধ করেন অথবা নকলের নাকালের মধ্যে পড়িয়া করেন তাহা বুঝিতে একটু কষ্ট হয়। হয়ত বা আমারই বুদ্ধির দোষ ; কিন্তু আমার মনে হয় 'বড্ড বোঝা যাচ্ছে' এই ভয়ে যদি ইচ্ছা করিয়াই দুর্বোধ হন তাহা হইলে তাঁহারা পাঠকবর্গের প্রতি অবিচার ত করেনই পরন্তু সৎসাহিত্যেরও সৃষ্টি করেন না। সৎসাহিত্য তাহাকেই বলিব যাহা আপনার ভিতরকার সর্বোৎকৃষ্ট পদার্থ পরম ভক্তি ও শ্রদ্ধাভরে জগতের লোকের নিকট তাহাদের উপকারার্থে নিবেদিত হয়। এরূপ সৎসাহিত্যের সৃষ্টি করিতে হইলে শিক্ষার প্রয়োজন। আবার শিক্ষার জন্য আন্তরিক যত্ন ও চেষ্টা আবশ্যক। এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড শিক্ষার আগার। জন্মাবধি মৃত্যু পর্যন্ত আমাদের শিক্ষা লাভের সময়। আমরা স্কুল কলেজে বিদ্যাভ্যাস করি ; বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বহির্গত হইয়াই মনে করি আমাদের শিক্ষার পরিসমাপ্তি হইয়াছে। কিন্তু তাহা নহে। সংসার ক্ষেত্রেও আমাদের যথেষ্ট শিক্ষার বিষয় আছে। প্রকৃত শিক্ষার্থী কখনও বলে না 'আমি সব শিখিয়াছি, আমার আর শিখিবার কিছু নাই।' এই সংসাররূপ বিদ্যামন্দিরে বিনয়াবনত হইয়া যেখানে যেটুকু ভাল পাই তাহাই লাভ করিবার জন্য সর্বদা জাগ্রত, সর্বদা সচেষ্ট থাকাই শিক্ষার্থীর ধর্ম্ম। দাম্ভিকতা ও অহঙ্কারশূন্য হইয়া আমাদিগকে সংসার পথে চলিতে হইবে। তবেই আমরা গৌরব লাভ করিব ; সম্মানিত হইব। সাহিত্যপ্রচারকল্পে এইরূপ তপশ্চরণ করিতে পারিলেই আমরা কৃতার্থ হইব।

www.pathagar.com

সাহিত্য সৃষ্টির জন্য যে শিক্ষার এরূপ প্রয়োজন সেই শিক্ষার বাহন কি হইবে তাহা লইয়া আমাদের দেশে এক বিষম আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। আমার মনে হয় এই আন্দোলনের মধ্যে অনেকটা কৃত্রিমতা আছে। কারণ যাহা সহজ, সরল বুদ্ধিতে স্পষ্ট প্রতীয়মান তাহাকে তর্কের জালে আচ্ছন্ন করিয়া আসল কথাটাকে হারাইয়া ফেলি কেন? মানুষের ভাবসমুদ্রে যখন আন্দোলন উপস্থিত হয় তখনই ভাষার সৃষ্টি হয়। ভাবরাশি যদি আমার মাতৃভাষাতেই প্রথম মূর্ত হয় তাহা হইলে তাহার প্রকাশই বা কেন অন্য ভাষাতে হইবে? হইতে পারে ইংরাজী আমাদের রাজভাষা, হইতে পারে উর্দ্দু, আরবী, পারশি আমাদের ধর্ম্মের ভাষা কিন্তু তাই বলিয়া শিক্ষার বাহন হইবার জন্য উহাদের একটিও ত উপযুক্ত নহে। ইংরাজী শিখিলে আমাদের সংসার জীবনে উন্নতি হইতে পারে, আমাদের নিকট জ্ঞানরাজ্যের দ্বারোদঘাটন হইতে পারে; উর্দ্দু আরবী পারশি শিখিলে আমরা ইসলামের তত্ত্ব ও তথ্যসমূহ অনেক জানিতে পারি সত্য কিন্তু যখন এই সকল জ্ঞানরাশিকে আমার নিজস্ব করিতে হইবে আমার রক্ত, মাংস, অস্থির ন্যায় আমারই এক মানসিক ও নৈতিক উপাদানে পরিণত করিতে হইবে তখন তাহা মাতৃভাষা ব্যতিরেকে কিরূপে সম্ভবপর হয় আমি বুঝি না। এ সম্বন্ধে আমি অধিক বলিতে চাহি না কারণ ইতিপূর্বে ইহার অনেক আলোচনা হইয়াছে। আমি ব্যক্তিগতভাবে যাহা বুঝিয়াছি তাহাই আপনাদের কাছে নিবেদন করিলাম।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলা আবশ্যক। জগতটা আজকাল ক্রমেই ক্ষুদ্রতর হইয়া আসিতেছে। নানাদেশের, নানা ভাষার লোক আসিয়া আজ আমাদের কুটীরদ্বারে আঘাত করিতেছে। আমরা কূপমণ্ডুকের ন্যায় মাথা লুকাইয়া থাকিলে আর চলিবে না। সুতরাং অপরের সহিত মনের ভাবের আদান প্রদান করিবার জন্য লেনাদেনার জন্য মাতৃভাষা ব্যতীত আমাদিগের আরও কয়েকটি ভাষা শিক্ষা করা দরকার। আজকাল পাশ্চাত্য প্রদেশসমূহে মাতৃভাষা এবং ব্যক্তিবিশেষের জন্য একটী প্রাচীন ভাষা ব্যতীত এক বা তদধিক আধুনিক ভাষা শিক্ষা করা অবশ্য কর্তব্য হইয়াছে। বাঙ্গালী মুসলমানের জন্যও আমার মতে অন্তত দুইটি আধুনিক ভাষা শিক্ষা করা অবশ্য কর্তব্য। যেহেতু ইংরাজী রাজভাষা, ব্যবসার বাণিজ্যের প্রধান ভাষা এবং সাহিত্যের হিসাবে বড় সম্পদশালী ভাষা অতএব ইংরাজী আমাদিগকে শিখিতেই হইবে। তারপর উর্দ্দু ভাষাও আমাদের পক্ষে অতীব প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে। উর্দ্দু ভাষা আয়ত্ত করা বিশেষ কঠিন নহে, যেহেতু ইহাকে জীবিত ভাষা বলা যাইতে পারে। তারপর উর্দ্দু ভাষার সাহায্যেই বঙ্গীয় মুসলমানের পক্ষে বাঙ্গালা সাহিত্যকে আমাদের উপযোগী করা অল্পায়াস সাধ্য হইবে। এজন্য আমি উর্দ্দু ভাষা শিক্ষার বিশেষ পক্ষপাতী। তবে তাহার সঙ্গে সঙ্গে আমার আর একটি বক্তব্য এই যে সর্বসাধারণের জন্য উর্দ্দুর কোন প্রয়োজন নাই। যাঁহারা কেবল উচ্চ শিক্ষাভিলাষী কেবল তাঁহাদিগকেই উর্দ্দু শিক্ষা করিতে হইবে। যেমন ফরাসি বা জার্মান না জানিলে আজকাল কোন পাশ্চাত্য বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকার লাভ করা যায় না সেইরূপ এখানেও এই নিয়ম হওয়া আবশ্যক যে উচ্চ শিক্ষাভিলাষী মুসলিম ছাত্র মাত্রেই উর্দ্দু ভাষাভিজ্ঞ হইবে। তারপর আরবী আমাদের কোরানের ভাষা; যাঁহারা কোরানের রত্নরাজি আহরণ করিবার জন্য অনুবাদের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তৃপ্তি লাভ করেন না তাহাদিগের মূলভাষা শিক্ষা করা দরকার। এই ভাষা শিক্ষা বিভ্রাট লইয়া আমাদের বহু সময় কাটিয়া গিয়াছে। কিন্তু ইচ্ছা থাকিলে পথও আবিষ্কৃত হয়। আমরা যদি

www.pathagar.com

মুসলিম বলিয়া পরিচয় দিতে গৌরব বোধ করি তাহা হইলে আমাদিগকে আয়াস স্বীকার করিতে হইবে। প্রকৃত সাধকের ন্যায়, ভক্তের ন্যায় বিনম্রভাবে অথচ দৃঢ়তার সহিত এই কঠিন সমস্যার সমাধানে কৃতসঙ্কল্প হইতে হইবে। আলাদীনের প্রদীপ আমাদিগকে কেহ হাতে তুলিয়া দিবে না। একদিনেই আমাদের 'মুসলিম সাহিত্য সমাজকে' সর্ববিষয়ে গরীয়ান করিতে পারিব না।

বাঙ্গালা সাহিত্য ক্ষেত্রে আমাদের অভাব এবং মুসলিম সাহিত্যিকগণের কর্তব্য সম্বন্ধে দুই চারি কথার উল্লেখ করিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিব। নবীন লেখকদিগের মধ্যে প্রায়ই দেখিতে পাই তাঁহারা সাহিত্যের আসরে নামিয়াই অন্তত কিছুদিন পর্যন্ত তাঁহাদের কবিত্ব শক্তির পরিচয় দিবার জন্য এক দুর্নিবার আগ্রহ প্রকাশ করেন। তাঁহাদের কবিত্বের পরিচায়ক স্বরূপ চাঁদের আলো, কোকিলের কুহুধ্বনি, পত্রের মর্মর শব্দ, স্রোতস্বিনীর কুল্‌কুল্ রাগিনী হইতে আরম্ভ করিয়া চটিজুতা, পুঁইশাক, মিনি বিড়াল প্রভৃতি কোন বিষয়ই বাদ যায় না। বোধহয় এটা কাল মহাত্মের দরুনই হয়। যৌবনের প্রথম উন্মেষে সমস্ত পৃথিবীটাই রঙ্গীন মনে হয়। তখন কল্পনা রথে চড়িয়া বাস্তব জগতের উপর কেবল চোখ বুলাইয়া যাওয়া হয়। সুতরাং সংসারের বন্ধুর, কঙ্করময় পথগুলি তখন চোখে পড়ে না। তারপর যত বয়ঃবৃদ্ধি হইতে থাকে ততই বাস্তবের সহিত পরিচয় ঘনীভূত ও গাঢ়তর হয়। তখন কবিত্ব, হা হুতাশ, ধীরে ধীরে উড়িয়া যায়। ইহা হইতে আপনারা মনে করিবেন না যে আমি কাব্য সাহিত্যের নিন্দা করিতেছি। কাব্যের যে কি মহিয়সী ক্ষমতা তাহার প্রমাণ ইতিহাসে ভুরি ভুরি রহিয়াছে। তবে তাহা কাব্যের মত কাব্য হওয়া চাই। আমার বলার উদ্দেশ্য এই যে বঙ্গীয় মুসলিম সমাজের এখন যে ঘোর দুর্দ্দিন তাহাতে অসার কল্পনার দাস হইয়া আলনশকরের (?) আকাশ-কুসুম গড়িয়া কালক্ষয় করিলে আর চলিবে না। সমাজকে গড়িয়া তুলিতে হইবে এবং তাহার জন্য আল্লাহ্‌তালা যাহাকে যেটুকু ক্ষমতা দিয়াছেন তাহার ষোল-আনা সদ্ব্যবহার করিতে হইবে। ধরুন শিশু-সাহিত্য ; মুদ্রাযন্ত্রের অনুগ্রহে আমাদের দেশের সেই পুরাতন কথকতা, গৃহের বৃদ্ধদিগের সেই কেচ্ছাকাহিনী সবই লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। তাহাদের স্থান অধিকার করিবার জন্য দক্ষিণারঞ্জন, যোগীন্দ্র সরকার, সুকুমার রায় চৌধুরীর ন্যায় আমাদের মুসলিম সমাজে কয়জনের আবির্ভাব হইয়াছে? যা দুই একজন দেখা দিতেছেন তাঁহারাও যথেষ্ট সহানুভূতি পাইতেছেন কিনা সন্দেহ। বালকদিগের জন্য জলধর সেনের ন্যায় পাকা লেখকও কলম ধরিতে কুণ্ঠা বোধ করেন নাই ; কিন্তু আমরা সে দিকে যথেষ্ট মনোযোগ দিতেছি বলিয়া মনে হয় না ; অথচ শৈশব এবং কৈশোরই ভাল বীজ বপন করিবার প্রশস্ত সময়। চরিত লেখকই বা সে রকম আমাদের মধ্যে কই? বস্‌ওয়েল, হালি, যোগীন্দ্র বসুর ন্যায় চরিতাখ্যায়ক কি আমাদের বঙ্গীয় মুসলিম সমাজে জন্মিতে নিষেধ আছে? ওমর খাইয়ামের অনুবাদ করেন কান্তিবাবু, নরেন্দ্রবাবু, কোরান ও হাদিসের অনুবাদ করেন গিরীশ বাবু। আমরা কবে আমাদের মহামূল্য রত্নরাজি অনুবাদের সাহায্যে পৃথিবীর সমক্ষে উপস্থিত করিব? বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম্', একবালের 'তারানা' আমাদের মধ্যে কবে শুনিব? রামেন্দ্রসুন্দরের বিজ্ঞান কথা, দ্বিজেন্দ্রলালের হাস্য কৌতুক, রবীন্দ্রনাথের চিরকুমার সভা, দীলিপকুমারের সঙ্গীত চর্চা, পুলিনদাসের লাঠিখেলা সবই আমাদের মধ্যে চাই। তবেই আমাদের সাধনার ফল পাইব। রবীন্দ্রনাথের ন্যায় কবি, দার্শনিক হইতে না পারি, জগদীশ বোস বা প্রফুল্লচন্দ্রের ন্যায় বৈজ্ঞানিক হইতে না পারি, শরৎ চট্টোপাধ্যায়ের ন্যায় ঔপন্যাসিক হইতে না পারি কিন্তু তাই

www.pathagar.com

বলিয়া আমাদের আদর্শ ছোট হইবে কেন? খোদার আরশ টলাইবার দুরাকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে স্থান না দিয়া যদি আমাদের প্রকৃত অভাব মোচনে সকলে নিজ নিজ সামর্থ্যানুসারে বদ্ধপরিকর হই তাহা হইলে সাফল্যের গৌরবে মণ্ডিত হইতে আমাদের অধিক বিলম্ব হইবে না। আপনাদের আজিকার এই অনুষ্ঠান দেখিয়া মনে হয় রোগ নির্ণীত হইয়াছে। প্রতিকারের ব্যবস্থাও অচীরেই হইবে।

বন্ধুগণ, আসুন আমরা সকলে মিলিয়া সেই পরম করুণাময় সর্বনিয়ন্তা আল্লাহ্তালার নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি তিনি আমাদের সকল চেষ্টা, সকল পরিশ্রম সার্থক করুন, আমাদিগকে বিজয়মাল্যে বিভূষিত করুন, আমাদের সাহিত্যসেবাকে সফল করুন। আমিন।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনের অভ্যর্থনা-সভাপতির অভিভাষণ

মাহমুদ হাসান

শ্রদ্ধেয় সমবেত ভদ্রমণ্ডলী,

আজ আপনারা আপনাদের সাহিত্য-সমাজের অতিথিগণকে সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপন করার সুযোগ দিয়ে আমাকে ধন্য করেছেন ; কিন্তু দুঃখের বিষয়, আপনাদের সঙ্গে আমার দিল খুলে মিলামিশা করার অসুবিধা ঢের। আমার মাতৃভাষা বাংলা নয় ; তাই বাধ্য হয়ে আজ আমাকে বিদেশী ভাষায় আপনাদের আহ্বান করতে হচ্ছে। এর জন্য ত্রুটী আপনারা মাফ করে নেবেন।

মাতৃভাষার চর্চ্চা না করলে কোনো জাতি উন্নতি করতে পারে না। মানুষের কর্ম্মশক্তি বাড়ে মনের শক্তি বাড়লে। অচল মন কর্ম্ম-পদ্ধতি স্থির করতে অক্ষম। নিসাড় মনবিশিষ্ট মানুষের সঙ্গে নিকৃষ্ট পশুর কোনো প্রভেদ নাই। কারণ উভয়েরই জীবন গতানুগতিক ও সংকীর্ণ পথে নিয়ন্ত্রিত। কোনো পরিবর্ত্তন তাদের জীবনে দেখা যায় না। মন সচল না হলে অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটে না। অবস্থার পরিবর্ত্তনই সভ্যতা। এই মনকে সচল করে সাহিত্য। আবার সাহিত্য সৃষ্টি হয় সচল মন দ্বারা। একে অপরের উপর নির্ভর করে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, মনকে সচল করতে হলে মাতৃভাষায় শিক্ষা দেওয়া চাই এবং মাতৃভাষায় সাহিত্য হওয়া চাই। আমি আলিগড় Education Conference এ এ-কথা জোর করেই বলেছিলাম। বাংলাদেশে জোর করে উর্দ্দুকে মাতৃভাষা করতে চাওয়ার মত আহাম্মকি আর নাই। আপনারা মাতৃভাষার চর্চ্চায় মন দিয়েছেন এতে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। বাংলার মুসলমান এতদিন অনর্থক উর্দ্দুর পিছু পিছু ছুটে মারাত্মক ভুল করেছে। তাই আজ তারা অন্যান্য প্রদেশের মুসলমানদের চেয়ে অনুন্নত। অবাঙ্গালী মুসলমানদের মধ্যে মাতৃভাষার চর্চ্চা চলে এসেছে বলে তাদের মন মুক্ত এবং তারা তাদের জীবনকে উপভোগ করে। শিক্ষাও তাদের মধ্যে অনেক প্রসার লাভ করেছে। সেজন্য সংখ্যায় লঘু হলেও সে সমস্ত মুসলমান হিন্দুর সঙ্গে টেক্কা দিতে পারছে। কারণ তাদের শিক্ষা মাতৃভাষার ভিতর দিয়ে হয়েছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, বাংলার মুসলমানদের শিক্ষার্থীর অনেককেই উর্দ্দু জোর করেই কণ্ঠস্থ করতে হয় মাতৃভাষাকে অবহেলা করে। আনন্দের বিষয়, যে আজকাল উর্দ্দুর নেশা ঢের কেটেছে। আমার মনে হয়, এইবার বাংলার মুসলমান তাড়াতাড়ি উন্নতি করতে পারবে। এই উন্নতি আরও দ্রুত হোক এই প্রার্থনা করি।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলা প্রয়োজন। আজকার এই অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করার কথা ছিল সুযোগ্য প্রিন্সিপ্যাল খান বাহাদুর মৌলবী মহম্মদ মুসা সাহেবের। পরিতাপের বিষয়, তিনি কাজের ভিড়ে আজ এই সভায় উপস্থিত হতে পারেন

www.pathagar.com

নাই। তাই তাঁর এই আসনে আমার মত অযোগ্য অর্ব্বাচীনকে বসিয়ে আপনারা আমাকে বিশেষ লজ্জিত করেছেন। আপনাদের আদেশ আমি পালন করতে বাধ্য।

অবশেষে আমি আমাদের আজকার সাধারণ সভাপতি সাহেবকে তাঁর গুরুভার গ্রহণ করে এই অধিবেশনের কার্য্য সমাধা করতে আহ্বান করি এবং আপনাদের নিকট আমার অযোগ্যতা ও অর্ব্বাচীনতার জন্য মাফ চাই। আপনারা নির্ব্বিঘ্নে ধীর স্থির চিত্তে বাংলার মুসলমানের সাহিত্য সমস্যা সম্বন্ধে অলোচনা করুন এই কামনা করি।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতির অভিভাষণ

খান বাহাদুর আবদুর রহমান খাঁ

শ্রদ্ধেয় ও স্নেহাস্পদ বন্ধুগণ,

ভূমিকা

আপনারা আমাকে আপনাদের সাহিত্য সমাজের সভাপতিত্বে বরণ করিয়া আমাকে অপ্রত্যাশিত সম্মান দেখাইয়াছেন। তজ্জন্য আমি আপনাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ করিতেছি। কিন্তু আমি আপনাদের নির্ব্বাচন বুদ্ধির প্রশংসা করিতে পারিতেছি না। যে দায়িত্ব–জ্ঞাপন পূর্ণ কার্য্যের ভার আপনারা আমার উপর অর্পণ করিয়াছেন, আমি তাহার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস আপনারা সভাপতির অভিভাষণে নিরাশ হইবেন। কিন্তু তজ্জন্য দায়ী আমি নহি। বারবার অক্ষমতার অজুহাত পেশ করিয়াও আমি নিষ্কৃতি পাই নাই। আপনারা আমাকে অকৃত্রিম স্নেহ করিয়া থাকেন। আপনাদের আহ্বান আমার শিরোধার্য্য। তাই অগত্যা কম্পিত অন্তঃকরণে আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছি। যে স্থলে আন্তরিক স্নেহ বিদ্যমান, তথায় দোষত্রুটি সহজেই মার্জ্জিত হয়। আশা করি, আপনারাও আমার ভুল ভ্রান্তি মাফ করিয়া লইবেন।

প্রায় দুই বৎসর অতীত হইতে চলিল, এই সাহিত্য সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই অল্প কালের মধ্যেই ইহা আপনাকে জনসাধারণের মধ্যে পরিচিত করিয়া তুলিয়াছে। গত বৎসর ফেব্রুয়ারী মাসে ইহার প্রথম বার্ষিক অধিবেশন হয়। উহার কার্য্যবিবরণী ও প্রবন্ধসমূহ সমাজের মুখপত্র 'শিখায়' প্রকাশিত হইয়াছে। 'শিখা' সম্বন্ধে বিভিন্ন সংবাদপত্রে সমালোচনা হইয়াছে। এই সমস্ত সমালোচনা হইতে আর যাহাই পাওয়া যাউক না কেন, এই কথাটি বেশ স্পষ্টরূপে ফুটিয়া বাহির হইয়াছে যে, সমাজের কর্ম্মিগণ এক নতুন উৎসাহে উৎসাহিত, এক নতুন প্রেরণায় অনুপ্রাণিত। ইঁহারা সমাজ–গত–প্রাণ। মুসলিম সমাজের বর্ত্তমান দুঃখ দৈন্য ইঁহাদের মর্ম্ম স্পর্শ করিয়াছে। ইঁহারা উহাকে সঞ্জীবিত ও সর্ব্বগুণে বিভূষিত করিয়া বিশ্বের দরবারে একটী গৌরবময় আসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে এবং সকল জাতির নিকট শ্রদ্ধেয় করিয়া তুলিতে চান। ইঁহারা সত্যান্বেষী ; গতানুগতিক সহজ ব্যাখায় ইঁহারা সন্তুষ্ট নহেন। সত্যকে ইঁহারা শুধু মানিয়া লইয়া নিশ্চিন্ত হইতে চান না। ইহারা চান সে সত্যকে বুদ্ধির মাপকাঠি দ্বারা ভাল করিয়া যাচাই করিয়া আপনার করিয়া লইতে। ইঁহারা স্বাধীন চিন্তার সাহায্যে সত্যের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন ; যাহা সত্য বলিয়া বিবেচনা করেন, তাহা অকপটে নির্ভীকচিত্তে সর্ব্বসমক্ষে প্রকাশ করেন। সত্যান্বেষণের ইহাই একমাত্র পথ। সকল সত্যের আধার পরম কারুণিক খোদাতা'লা ইহাদিগকে সরল পথ প্রদর্শন করুন এবং ইহাদের চেষ্টা সাফল্য মণ্ডিত করুন, ইহাই আমি সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি।

www.pathagar.com

সাহিত্যের স্বরূপ

আমি সাহিত্যিক নহি। সাহিত্যের স্বরূপ বর্ণনা করা আমার সাধ্যাতীত। একজন সামান্য শিক্ষিত লোক হিসাবে আমার সাহিত্য সম্বন্ধে যে ধারণা আছে তাহাই নিতান্ত সাদাসিদাভাবে আপনাদের সমক্ষে উপস্থিত করিতেছি। সাহিত্যকে জীবনের সমালোচনা বলা হয়। পারিপার্শ্বিক জীবনে যাহা ইন্দ্রিয়ানুভূত হয়, তাহাই সাহিত্যে প্রকাশ পায়। কিন্তু এই ঘটনাগুলি সাধারণের অনুভূতিতে যেরূপ প্রতীয়মান হয়, সাহিত্যে তাহার অবিকল ছবি ফুটিয়া উঠে না, সাহিত্যিকের অন্তর দর্পণে প্রতিফলিত হইয়া উহা নূতন রঙে রঞ্জিত হইয়া প্রকাশ পায়। যাহা ইন্দ্রিয়ানুভূত হয় তাহা ঘটনা মাত্র। আর সাহিত্যিকের মন উহাকে ছাঁকিয়া সাহিত্যে যাহা প্রকাশ করে তাহাই সত্য। এই সত্যই প্রকৃত সাহিত্যের পরিচায়ক। ইহাতেই সাহিত্যিকের আত্ম-প্রকাশ হয়।

সাহিত্য সৃষ্টির জন্য দুইটি জিনিস আবশ্যক ;—পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও সাহিত্যিকের মন। এই দুইটী পরস্পর অবিচ্ছেদ্য। প্রথমটীর উপর দ্বিতীয়টী অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। যখনই কোন বৃহৎ ব্যাপার সংঘটিত হয়, কোন স্থিতিশীল অনুষ্ঠানের মধ্যে গতি বা বিপ্লব উপস্থিত হয়, তখনই সাহিত্যিকের মন প্রচণ্ড আঘাতে উন্মুক্ত ও প্রসারিত হয় এবং প্রাণস্পর্শী সাহিত্যের সৃষ্টি করে। ইউরোপের সাহিত্যে ইহার চাক্ষুষ প্রমাণ পাওয়া যায়। মধ্যযুগে ইউরোপে লোকের মন এরূপ সংকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল যে, একমাত্র বাইবেল গ্রন্থ ভিন্ন তাহাদের আলোচনার বিষয় আর কিছুই ছিল না। তাহাদের মানসিক ও আধ্যাত্মিক জীবন জড়তা প্রাপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু কন্‌সটন্টিনোপলের পতনে বহু সংখ্যক বিদ্যার্থী ইটালীতে আশ্রয় গ্রহন করেন। তাঁহাদের সংস্পর্শে ইউরোপ এক নতুন আলোক ও চেতনা প্রাপ্ত হয় এবং ফলে তাহার সাহিত্যের পুনরুত্থান হয়। ইংরাজী সাহিত্যের সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবের যুগ এলিজাবেথীয় যুগ। সে যুগের সাহিত্যের মূলেও একটা প্রচণ্ড নূতন আলোক দেখিতে পাওয়া যায়। ইংলন্ড যখন কল-কারখানার আবিষ্কার দ্বারা প্রকৃতির উপর বিপুল প্রভূত্ব স্থাপন করিতেছিল , নূতন আবিষ্কার ও পর্য্যটনের ফলে বহু দেশের বহু অভিজ্ঞতা তখন তাহার সাহিত্যিকের সম্মুখে স্থাপিত হইয়াছিল। প্রকৃত পক্ষে, যখন কোনো জাতির মধ্যে একটা নূতন আলোক প্রবেশ করে, তখন তাহাদের জ্ঞান ও কল্পনার পরিধি সহসা বিস্তৃত হইয়া পড়ে ; এক কথায়, যখন তাহাদের জীবনে একটা নূতন স্ফূর্তি অনুভূত হয়, তখনই তাহাদের মধ্যে নূতন সাহিত্যের সৃষ্টি হয়।

মুসলিম সাহিত্যের মূলেও ঐ একই কথা। হজরত মুহম্মদের সাধনা আরবী সাহিত্যে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছিল। ইস্‌লামের প্রভাবে প্রাচীন চিন্তাধারায় অনেক পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছিল। মোতাজেলা, সুফী চিন্তাধারা আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় , তৎকালীন আরবী ও পারস্য চিন্তাধারা ইস্‌লামের তৌহীদের মন্ত্রে কেমন করিয়া চাঙ্গা হইয়া উঠিয়া এক নূতন পথে গতিলাভ করিয়াছিল। প্রাথমিক মুস্‌লিম সমাজে বিভিন্ন ইমামের চিন্তাধারা লক্ষ্য করিলেও এই কথাই স্পষ্ট হইয়া উঠে যে নবভাবের আবির্ভাব হইলে মানুষের মন গা ঝাড়া দিয়া উঠে এবং সাহিত্যের ভিতর দিয়া প্রকাশিত হইয়া পড়ে। সাহিত্য মানব মনের পুষ্প। বড় বড় শাস্ত্রগ্রন্থ, বড় বড় কাব্য, বৈজ্ঞানিক তথ্য, দার্শনিক সত্য সমস্তই মানুষের উৎকর্ষ সমন্বিত চিত্ত ও সম্প্রসারিত মার্জ্জিত মস্তিষ্কের ফল। পারিপার্শ্বিক অবস্থার সংঘাতে সে মন বিকশিত হয়। তাই দেখিতে পাওয়া যায়, বড় বড় দার্শনিক-সত্য মানুষের

www.pathagar.com

দুঃস্থ অনুন্নত সমাজের মহাপুরুষদের মস্তিষ্ক হইতে প্রসূত হইয়াছে। ইউরোপে যে সমস্ত দার্শনিক সূত্র প্রচলিত হইয়াছে তাহার মূলে অনুভূতির বহ্নিতে প্রজ্বলিত চিত্ত বিদ্যমান। বেনথাম, মিল্ হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক বার্ট্রান্ড রাসেল, বার্গসঁ, কহলার প্রমুখ দার্শনিক সমাজের প্রসব-বেদনার ফল। আবার ভারতীয় আধুনিক জাগরণের মূলে আমাদের বর্ত্তমান সামাজিক দুরবস্থা। সেই দুরবস্থা দূরীকরণের জন্য যে সমস্ত চিন্তাশীল ব্যক্তির আবির্ভাব হইয়াছে—তাঁহারাই সাহিত্যের আধুনিক স্রষ্টা। বাংলাদেশে রামমোহনের যুগ, বঙ্কিমচন্দ্রের এবং রবীন্দ্রনাথের যুগ পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে—প্রত্যেক যুগের এক একটি বিশিষ্ট সমস্যা সাহিত্যের ভিতর আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। মানুষের অজ্ঞাতে সমস্যা জন্মলাভ করে—আর সাহিত্যে তাহার রূপ গ্রহণ করে এবং সমাধানের ইঙ্গিত করে। যে সমাজে সমস্যা যত কম, সে সমাজে সাহিত্যের বৈচিত্র্য তত কম। বাংলার আধুনিক মুসলমানের সাহিত্য নাই। চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বেও পুঁথি সাহিত্যের একটা চমৎকার প্রভাব বাংলার মুসলিম সমাজের উপর বিদ্যমান ছিল—কিন্তু আজ তাহাও ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হইতেছে। আজ চতুর্দ্দিকে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, আমাদের চিন্তার ক্ষেত্র যেন ঊষর মরুভূমিতে পরিণত হইয়াছে। আমাদের জীবনে যেন কোনো সমস্যাই নাই। তাহার কারণ, আমরা একটী কৃত্রিম ভাবধারার মধ্যে হাবুডুবু খাইতেছি। আমাদের আলেম সম্প্রদায় উর্দ্দুকে আমাদের ধর্ম্ম ভাষায় পরিণত করিয়া তুলিয়াছেন এবং আমরা উর্দ্দুকে মাতৃভাষার উপরে স্থান দিয়া মাতৃ ভাষার উপেক্ষা করিয়া আসিতেছি। সেই জন্যই বোধহয় আমাদের জীবনের আনন্দ ও স্বচ্ছন্দ স্ফূর্তি বন্ধ হইয়া আসিতেছে। নতুবা আমার মনে হয় পুঁথি সাহিত্য ক্রমবিকাশ লাভ করিয়া আজ এক নূতনরূপ লইয়া আমাদের সাহিত্যের অভাব পূরণ করিত।

সাহিত্যের ভাষা

সাহিত্যের বাহন ভাষা। বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্যের ভাষা কি হইবে তাহা লইয়া আজ মাথা ঘামাইয়া সময় নষ্ট করিতে যাওয়া নিরর্থক বিড়ম্বনা বৈ আর কি হইতে পারে? ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত যে, বাংলার অধিকাংশ মুসলমানই বঙ্গভাষাভাষী, সুতরাং তাহাদের সাহিত্যের ভাষা যে বাংলা হইবে তাহা কে অস্বীকার করিতে পারে? তথাপি যে কোন কোন মুসলমান বাংলাকে তাহাদের ভাষা বলিয়া স্বীকার করিতে নারাজ, তাহার বোধহয় একটা কারণ আছে। বাংলা ভাষায় তাহাদের আকাঙ্ক্ষা মিটে না ; তাহারা সাহিত্যে যাহা প্রত্যাশা করেন, বাংলায় তাহা পান না, এটা অতি দুঃখের বিষয় এবং এই দুঃখেই তাহারা বাংলাকে অস্বীকার করিয়া চলিতে চান। কিন্তু তাহা নিষ্ফল। বাংলাকেই বাঙ্গালী মুসলমানের মাতৃভাষা বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে এবং তাহাতেই তাহার সাহিত্য প্রকাশ করিতে হইবে। বাংলাকে অস্বীকার করিয়াই আমরা আজ সাহিত্য হইতে বঞ্চিত হইয়াছি। আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায় উর্দ্দুতে বাৎচিৎ করিয়া শরাফত বহাল করিবার জন্য উদ্বিগ্ন, আর আলেম সম্প্রদায় উর্দ্দুর মারফতে প্রচার কার্য্য চালাইয়া পেটের অন্ন সংস্থানে ব্যস্ত। কাজেই মাতৃভাষার চর্চ্চা হয় নাই বলিয়া আজ আমাদের এই দুর্দ্দশা। কেহ কেহ উর্দ্দুকে বাঙ্গালী মুসলমানের মাতৃভাষা রূপে চালাইতে চাহেন ; কিন্তু তাহা অতি দুরূহ। মুখের কথায় কেহ কোন দেশবাসীর মাতৃভাষা পরিবর্ত্তন করিতে পারে না। শিক্ষিত সম্প্রদায় ইহা ন্যূনাধিক গ্রহণ করিতে পারেন,

www.pathagar.com

কিন্তু যে ভাষা তাঁহারা মাতৃস্তন্য পানের সহিত শ্রবণ করিয়া আসিয়াছে সাহিত্য ক্ষেত্রে তাহার সহিত অপর কোনো ভাষার প্রতিযোগিতা চলিতে পারে না। অর্ধ শিক্ষিত বা অশিক্ষিত সমাজে উর্দ্দুর প্রচলন অতি আয়াসসাধ্য এবং পরদানিশীন মাতৃজাতির মধ্যে উহার প্রবর্ত্তন একরূপ অসম্ভব। সুতরাং বাংলাকেই বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্যের বাহন করিয়া লইতে হইবে।

প্রচলিত বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে কোন কোন মুসলমানের একটি অভিযোগ আছে। তাঁহারা বলিয়া থাকেন, উহা বাংলার মুসলমানদের ভাষা নহে, উহা সংস্কৃত শব্দবহুল। এই হেতু কতিপয় মুসলমান বাংলা ভাষার মধ্যে আরবী ও ফারসী শব্দের প্রচলন দ্বারা উহাকে মুসলমানদের হৃদয়গ্রাহী করিবার চেষ্টায় আছেন। এ স্থলে মনে রাখা কর্ত্তব্য যে, ভাষা সাহিত্যের বাহন মাত্র, উহাই সাহিত্য নহে। প্রকৃত সাহিত্যের পরিচয় উহার ভাবে এবং প্রকাশের ভঙ্গীতে। যে স্থলে এই দুইটী জিনিস বিদ্যমান আছে, তথায় ভাষায় সংস্কৃত বা আরবী ফারসী শব্দের ন্যূনাধিক্যে সাহিত্যের ক্ষতি বৃদ্ধি হয় না। সংস্কৃত শব্দ বহুল হইলেও ভাষা উৎকট বিকট না হইতে পারে, আবার খাঁটি বাংলাও শ্রুতি-মধুর না হইতে পারে। তদ্রূপ আরবী ফারসী বেশী থাকিলেও হয়ত তাহা বাংলা ভাষার মধ্যে বে-মালুম খাপ খাইতে পারে; আবার তাহাদের পরিমাণ কম হইলেও হয়ত তাহা একদিকে সাধারণ পাঠকের নিকট হৃদয়গ্রাহী না হইতে পারে এবং অপরদিকে মুসলমানদের নিকটও তাহাদের মাতৃ-ভাষা বলিয়া গণ্য না হইতে পারে। মোট কথা, ভাষায় কী পরিমাণ সংস্কৃত বা আরবী ফারসী শব্দ থাকিবে তাহা কেহ নির্দ্দিষ্ট করিয়া বলিতে পারেন না; তবে একথা ঠিক মুসলমানগণ সাহিত্য ক্ষেত্রে মনোনিবেশ করিলে যে বর্ত্তমান বাংলা ভাষার মধ্যে একটু পরিবর্ত্তন হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। সংস্কৃত শব্দ বহুল বাংলা মুসলিম সমাজে আদরণীয় হইবে না। আবার আরবী ফারসী বহুল পরিমাণে প্রচলন করিলে তাহাও সাধারণ বঙ্গবাসী গ্রহণ করিবে না। বঙ্গবাসী হিন্দু মুসলমান বহুদিন যাবৎ একত্র বসবাস করিয়া আসিতেছে, ইহার ফলে সাধারণ মুসলিম কথা বার্ত্তায় যে সকল বিদেশীয় শব্দের ব্যবহার করিয়া থাকে, তাহা সাধারণ হিন্দুর উপলব্ধি করিতে আদৌ বেগ পাইতে হয় না। যদি বাংলা সাহিত্যের ভাষায় ঐ সমস্ত শব্দের প্রচলন হয় তবে তাহাই মুসলমানদের নিকট তাহাদের মাতৃভাষা বলিয়া আদৃত হইবে।

বাংলা সাহিত্যে মুসলিম ভাব

কিন্তু প্রচলিত বাংলা ভাষার মধ্যে কতিপয় মুসলিম শব্দের প্রচলন হইলেই মুসলিম সাহিত্যের সৃষ্টি হইবে না। মুসলিম সাহিত্যের বিশেষত্ব থাকিবে তাহার ভাবে, তাহার ভাষায় নহে। যতদিন মুসলমান তাহার সাহিত্যে মুসলিম আদর্শ ফুটাইয়া তুলিতে না পারিবে, ততদিন প্রকৃত মুসলিম সাহিত্য সৃষ্টি হইবে না। অধুনা যে সমস্ত মুসলমান সাহিত্যসেবায় যোগদান করিয়াছেন তাঁহাদের অনেকেই হিন্দু আদর্শে অনুপ্রাণিত। তাঁহাদের লেখায় এমন কোনো বিশেষত্ব পাওয়া যায় না যাহা হইতে উহা মুসলমানের লেখনী-প্রসূত বলিয়া সহসা প্রতীয়মান হয়। মুসলমানের একটা নিজস্ব সম্পদ আছে। উহা প্রকাশ করাই মুসলিম সাহিত্যের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত। ইহার এক প্রধান ফল এই হইবে যে, অপর সম্প্রদায়ের লোক মুসলমানকে ভালরূপে চিনিতে সুযোগ পাইবে এবং তাহার প্রতি তাহাদের শ্রদ্ধা ও আত্মীয়তা বৃদ্ধি পাইবে। মুসলমান যদি অপর সম্প্রদায়ের শ্রদ্ধা ও আত্মীয়তা পাইতে আশা করে, তবে তাহাকে তাহার মধ্যে যাহা শ্রদ্ধেয় ও আদরণীয় আছে তাহা তাহাদের সমক্ষে

www.pathagar.com

সঠিকভাবে উপস্থিত করিতে হইবে। প্রকৃত পক্ষে, সাহিত্যের ভিতর দিয়া মুসলমান ও অপরাপর সম্প্রদায়ের মধ্যে যে মিলন আশা করা যায়, অন্য কোনো উপায়ে তাহা সম্ভবপর হইবে বলিয়া মনে হয় না।

বাংলা সাহিত্যের প্রতি অনেক মুসলমানের একটা বিতৃষ্ণা আছে। তাঁহারা বলেন, বাংলার বড় বড় সাহিত্যিকও মুসলমানকে নিকৃষ্টরূপে চিত্রিত করিয়াছেন। তাহারা মনে করেন, মুসলমান হাতে কলম ধরিতে পারিলেই তাহার পক্ষে ইহার প্রতিশোধ লওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। এই খেয়ালের বশবর্তী হইয়া কোনো কোনো লেখক এরূপ গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন যাহা কিছুতেই সুরুচিসঙ্গত বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে না। তাহাতে মুসলমান সমাজের গৌরব বাড়িতেছে না, বরং তাহাতে অন্য সমাজের নিকট আমাদের নিকৃষ্ট চিত্তের পরিচয়ই দেওয়া হইতেছে। ইহা বাস্তবিকই লজ্জার বিষয়। আমাদের এস্থলে পাল্টা হীন মনোবৃত্তির পরিচয় না দিয়া, উচ্চতর মনোবৃত্তি ও উদার সুরুচির আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া, আমাদের জীবনের মার্জ্জিত রূপটি ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। মুসলমানকে যদি অপর সম্প্রদায়ের লোক ভাল ভাবে চিত্রিত না করিয়া থাকেন, তবে তাহার জন্য তাঁহারা যেমন দায়ী, মুসলমানও সেইরূপ দায়ী। তাঁহাদের কর্ত্তব্য ছিল মুসলমানকে সূক্ষ্মরূপে জানিবার চেষ্টা করা এবং মুসলমানের উচিত ছিল নিজকে তাঁহাদের নিকট সঠিক ভাবে প্রকাশ করিবার প্রয়াস পাওয়া। গলাবাজি করিয়া কিংবা প্রতিহিংসা-মূলক ভাষা ব্যবহার করিয়া সাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি করা যায় না। সে গৌরবের সর্ব্ব প্রথম বিষয় হইতেছে আমাদের সুন্দর ও মার্জ্জিত জীবন। সেইরূপ জীবন-সম্পদ আমাদের নাই। সে জন্য অন্য সমাজের লোক আমাদিগকে ঘৃণা করেন এবং নিকৃষ্ট জীবরূপে চিত্রিত করেন। সেজন্য আমরা অত্যধিক অপরাধী। আমি নোংরা থাকিলে কে আমাকে সভ্যসুন্দর বলিতে পারে? যাঁহারা আমাদিগকে কুশ্রী করিয়া আঁকিয়াছেন—তাঁহাদের সামনে আমাদের জীবনের খুব ভাল ছবি ছিল না। সুতরাং সেজন্য শিল্পীকে দোষ না দিয়া আমাদের সমাজের রূপকে দোষ দেওয়া উচিত। তাই বলি আজ আমাদের জীবনকে শ্রদ্ধেয় করিতে হইবে—সেজন্য আজ চিন্তাশীল সাহিত্যিকের আবির্ভাব হওয়া চাই। "সাহিত্য-সমাজ" সেই সাহিত্যিকের আগমন সহজ করিতে ব্রতী হউক—এই কামনা করি।

জাতি হিসাবে বঙ্গীয় মুসলিম জগতের মধ্যে সভ্যতার নিম্নস্তরে পড়িয়া আছে। কে তাহাকে গালিমন্দ দিয়াছে, কিরূপে তাহার প্রতিশোধ লওয়া যাইবে এই আলোচনায় সময় ও শক্তি ক্ষেপণের অবসর তাহার আর নাই। তাহাকে একাগ্রমনে আত্মোন্নতি ও আত্মপ্রকাশের চেষ্টা করিতে হইবে। তাহাতেই তাহার মুক্তি ও কল্যাণ নিহিত রহিয়াছে এবং তাহাতেই তাহার কলঙ্ক মোচন হইবে।

মুসলিম সমাজে সাহিত্য চর্চ্চার অন্তরায়

সাহিত্যের সৃষ্টি সম্বন্ধে যাহা বলা হইল তাহা হইতেই বুঝা যাইতেছে যে, জোর করিয়া বা ফরমাইশ দিয়া কেহ সাহিত্যের সৃষ্টি করিতে পারে না। সাহিত্য ফুলের ন্যায় আপনি ফুটিয়া উঠে। কিন্তু গাছের গোড়ায় জল সিঞ্চন করিয়া যেমন উহার পুষ্টির ও পরোক্ষভাবে ফুলোৎপত্তির সহায়তা করা যাইতে পারে, তদ্রূপ পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্ত্তন দ্বারাও সাহিত্য সৃষ্টির পথ পরিষ্কার করা যাইতে পারে। এখন দেখা যাউক "মুসলিম সাহিত্য-

www.pathagar.com

সমাজ" এরূপ পরিবর্ত্তন সংঘটনে সাহায্য করিতে পারেন কি না। বঙ্গীয় মুসলিম সমাজ বর্ত্তমানে যেরূপ সংকীর্ণ জীবন-যাপন করিতেছে, তাহাতে তাহাদের মধ্যে সাহিত্যের সৃষ্টি অসম্ভব। সংকীর্ণতা তাহাদের জীবনকে সম্পূর্ণরূপে ঘিরিয়াছে। তাহাদের মানসিক পরিদৃষ্টি (outlook) অতি সংকীর্ণ, তাহাদের মধ্যে উদার শিক্ষা অতি বিরল। যাঁহারা শিক্ষিত বলিয়া পরিচিত, তাহাদের মধ্যে প্রকৃত শিক্ষার আভাস পাওয়া যায় না। যাঁহারা আলেম বলিয়া দাবি করেন, তাঁহারা কয়েকখানি ধর্ম্মগ্রন্থ ব্যতীত পৃথিবীর কোনো বিষয়ের সংবাদ রাখেননা। যাঁহাদের পার্থিব বিষয়সমূহের কিছু জ্ঞান আছে, ধর্ম্ম শিক্ষার সহিত তাঁহাদের পরিচয় নাই বলিলেও চলে। যাঁহারা আরবী জানেন, তাঁহারা ইংরেজী জানেন না এবং জানা আবশ্যকও মনে করেন না। যাঁহারা ইংরেজী জানেন, তাঁহারা আরবী জানেন না এবং আরবীর মধ্যে জানার উপযোগী কিছু আছে বলিয়াও বিশ্বাস করেন না। জ্ঞানের কি ভীষণ দৈন্য আমাদের বাংলার মুস্‌লিম সমাজে। যখন মুসলমানদের মধ্যে জ্ঞানের চর্চ্চা ছিল, তখন তাঁহারা নিজেদের মাতৃভাষা ত জানিতেনই, তাহা ছাড়া তখনকার দিনে যে সমস্ত ভাষায় সাহিত্যের প্রাচুর্য্য ছিল তৎসমুদয়ও নিজেদের ভাষায় অনুবাদ করিয়া নতুন ভাবে তাহা আলোচনা করিতেন। শুধু তাহাই নহে, যিনি গণিতজ্ঞ বা জ্যোতির্ব্বিদ ছিলেন, তিনিও সাহিত্য- চর্চ্চা করিতেন। মুসলমানগণ তখন দূরদেশে থাকিয়া যতটুকু সংস্কৃত চর্চ্চা করিতেন, আজ তাঁহারা বহু শতাব্দী হিন্দুদের সহিত একত্র বসবাস সত্ত্বেও তাহার শতাংশের একাংশ করিতেছেন না। ওমর খাইয়াম দার্শনিক, গণিতজ্ঞ, জ্যোতির্ব্বিদ হইয়াও সাহিত্য সেবায় অক্ষয়কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, আর আজ মুসলিম সমাজে এমন একাগ্র-চিত্ত সাহিত্যসেবীও পাওয়া দুষ্কর, যিনি একজন সাধারণ সাহিত্যিক বলিয়াও পরিচিত হইতে পারেন।

ধর্ম্মক্ষেত্রেও মুসলমানদের সংকীর্ণতা আতি শোচনীয়। তাহারা ধর্ম্মের নামে প্রাণ দিতে প্রস্তুত হন। কিন্তু ধর্ম্ম কি, সে সম্বন্ধে তাঁহাদের কোনো সঠিক ধারণা নাই। তাঁহারা ধর্ম্মের বহিরাবরণ লইয়া তর্কাতর্কি করেন কিন্তু উহার ভিতরকার আসল জিনিসটি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন। তাঁহারা অনুষ্ঠানকেই একমাত্র ধর্ম্ম বলিয়া মনে করেন কিন্তু অনুষ্ঠান যে কোন বৃহত্তর ও মহত্তর লক্ষ্যে উপনীত হইবার উপায় মাত্র, ইহা তাঁহাদের চিন্তা করিবার সামর্থ্য বা প্রবৃত্তি নাই। তাঁহারা চক্ষু বুজিয়া শাস্ত্রের আদেশ ও নিষেধ মানিয়া চলেন বা চলেন বলিয়া মনে করেন, কিন্তু তাহাদের মূলে যে কোন যুক্তি থাকিতে পারে তাহা একবার ভবিয়া দেখেন না এবং ভাবিয়া দেখাও নিষ্প্রয়োজন বা আত্মার অবনতির কারণ বলিয়া মনে করেন। তাঁহাদের আত্ম-বিশ্বাস নাই। তাই তাঁহারা আপন ধর্ম্ম অক্ষুণ্ন রাখিবার জন্য অপর ধর্ম্মাবলম্বীর সংঘর্ষ এড়াইয়া চলিবার চেষ্টা করেন। জাতীয় জীবনে এত বড় জড়তার দৃষ্টান্ত বোধ হয় আজ আর কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। যদি সহসা এমন কোনো নব-আলোক (x-rays) এর আবিষ্কার হয় যাহাতে এই নিবিড় জড়তা আলোকিত ও সমুদ্ভাসিত হইতে পারে, তবেই মুসলিম সমাজে সাহিত্যের সৃষ্টি সম্ভব হইবে। এই আলোকের প্রবেশপথ পরিষ্কার করিতে "মুসলিম সাহিত্য-সমাজ" নিশ্চয়ই সাহায্য করিতে পারেন। তাঁহারা আপনাদের মধ্যে উদার শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা করিতে পারেন। যাঁহারা ইংরাজী জানেন, তাঁহারা ইংরাজীর যোগে নানা দেশের (Culture) সভ্যতা ও চিন্তাধারা সম্বন্ধে অবগত হইতে পারেন এবং তাহা ইংরাজীতে অনভিজ্ঞ লোকের সম্মুখে ভাষান্তরিত করিয়া উপস্থিত করিতে পারেন। যাঁহারা আরবীতে অভিজ্ঞ তাঁহারা ইসলামে যাহা কিছু সুন্দর ও মনোরম এবং

www.pathagar.com

আধুনিক সমস্যা সমাধানের অনুকূল তাহা তরজমা করিয়া যাঁহারা আরবী জানেন না তাঁহাদের সম্মুখে স্থাপিত করিতে পারেন। উভয় দল পরস্পরকে জানিবার, বুঝিবার ও শ্রদ্ধা করিবার জন্য চেষ্টিত হইতে পারেন। এই প্রকার ভাবের আদান প্রদানে হয়ত মুসলিম-সমাজে এক নূতন আলোক প্রকাশিত হইবে এবং তাহার ফলে সাহিত্য সৃষ্টির পথ সুগম হইবে।

সাহিত্য ও শিক্ষা

সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধন করিতে হইলে শিক্ষার একান্ত প্রয়োজন। প্রথমতঃ যাঁহারা সাহিত্যের সেবা করিবেন, তাঁহাদের সুশিক্ষিত হওয়া আবশ্যক। সুশিক্ষিত হইতে হইলেই যে বি-এ, এম -এ পাশ করিতে হইবে, এমন নহে। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাধিধারী না হইয়াও সুশিক্ষিত হওয়া সম্ভবপর। সুশিক্ষার জন্য অধ্যয়ন ও পর্য্যবেক্ষণ আবশ্যক এবং অধ্যয়ন ও পর্য্যবেক্ষণ হইতেই সাহিত্যের মাল মসলা সংগৃহীত হয়। অধ্যয়ন দ্বারা অতীত ও বর্ত্তমান মনীষিগণের চিন্তাধারার সহিত পরিচয় ঘটে, সাহিত্যের দোষ গুণ বিচার করিবার ক্ষমতা জন্মে, চিন্তাশক্তি প্রখর হয় এবং রুচি মার্জ্জিত হয়। পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা মানস ও বাহ্যপ্রকৃতির অনেক গূঢ় তত্ত্ব গোচরীভূত হয়। যাহা জন-সাধারনের নিকট নিতান্ত সামান্য ও অর্থবিহীন বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহাও পর্য্যবেক্ষণশীল লোকের নিকট অনেক সময়ে অতি সারগর্ভ ও মূল্যবান বলিয়া প্রতীত হয়।

দ্বিতীয়তঃ যাঁহারা সাহিত্য পাঠ করিবেন তাঁহাদের সাহিত্য বুঝিবার এবং উপভোগ করিবার ক্ষমতা থাকা আবশ্যক। যতদিন মুসলিম সমাজে বিদ্যাশিক্ষার প্রসার না হয়, ততদিন তাহাদের মধ্যে সাহিত্যের আস্বাদ দানের চেষ্টা বৃথা। বাংলার সাধারণ মুসলিম বটতলার প্রকাশিত পুঁথি পড়িয়া পঠনের আমোদ উপভোগ করে। উহাই তাহার সাহিত্য। প্রকৃত সাহিত্য পাঠ করিবার বা উপভোগ করিবার সামর্থ্য তাহার নাই। তাহাকে প্রকৃত সাহিত্যের রস আস্বাদ করান অসম্ভব। সুতরাং মুসলিম সমাজে শিক্ষা বিস্তারে সহায়তা করা "মুসলিম সাহিত্য সমাজের" অন্যতম কর্ত্তব্য।

কি উপায়ে মুসলিম সমাজে শিক্ষার বিস্তার হইতে পারে, কি প্রণালী অবলম্বন করিলে তাহাদিগকে শিক্ষার প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট করা যাইতে পারে, তদ্বিষয়ে বহু মনীষী ব্যক্তি বহু গবেষণা করিয়াছেন। এইরূপ এক গবেষণার ফলে দেশে জুনিয়র ও সিনিয়র মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠা বাড়িতেছে। ইংরেজী বিদ্যালয়ে ধর্ম্ম শিক্ষার ব্যবস্থা নাই বলিয়া মুসলমানগণ ইংরেজী শিক্ষার প্রতি মনোযোগী হন নাই। এই অভাব পূরণের জন্যই এই মাদ্রাসা-প্রণালীর উদ্ভাবন হয়। ইহার ফলে বহু মাদ্রাসার উৎপত্তি হইয়াছে এবং তাহাদের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। কিন্তু মানুষের কোনো অনুষ্ঠানই সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ হয় না। মাদ্রাসা প্রণালীরও দোষ আছে। মুসলিম সমাজের একদল ইহাকে দূষণীয় বলিয়া ইহার বর্জ্জনের চেষ্টা করিতেছেন এবং অপর দল ইহার পক্ষ সমর্থন করিতে যাইয়া ইহার দোষ স্বীকার করিবার সাহস পাইতেছেন না।

একথা অস্বীকার করা যায় না যে, এই নূতন প্রণালীর মাদ্রাসা স্থাপিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যে সকল মুসলমান পূর্ব্বে আধুনিক শিক্ষার প্রতি উদাসীন ছিলেন, তাঁহারাও ইহার প্রতি

www.pathagar.com

কথঞ্চিৎ পরিমাণে আকৃষ্ট হইয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে, এই সমস্ত বিদ্যালয়েও যে ইসলামিক শিক্ষার সুচারু ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহা নহে। তথাপি ইহার প্রতি মুসলিমগণের আস্থা স্থাপিত হওয়ার কারণ এই যে, তাঁহারা যে মোহের বশবর্ত্তী হইয়া আপনাদিগকে সর্ব্বসাধারণ মানব হইতে পৃথক রাখিতে চান ইহাতে তাহার একটা পরিতুষ্টি হয়। তাঁহারা অতি ধর্ম্ম-প্রাণ, তাঁহারা ধর্ম্মহীন শিক্ষার বিরোধী, এই কথাটাই তাঁহারা সব সময়ে সপ্রমাণ করিতে চান। ইংরেজী শিক্ষার ফলে লোক ধর্ম্মহীন হইয়া পড়িবে, এই ভয়েই মুসলমানগণ উহা হইতে দূরে সরিয়া ছিলেন এবং এই ভয় এখনো মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষার অভাবের জন্য অনেকখানি দায়ী।

এই সংস্কার দূরীকরণের উপায়ান্তর না পাওয়ায় নূতন মাদ্রাসা প্রণালীর যোগে ফাঁকি দিয়া মুসলমানদিগকে আধুনিক শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট করার চেষ্টা হইয়াছে। এই চেষ্টা যে অনেকটা ফলবতী হইয়াছে তাহাও সত্য। অনেক স্থলে মাদ্রাসা স্থাপিত হওয়াতে এমন অনেক বালক তাহাতে যোগদান করিতেছে যাহারা অপর কোনো বিদ্যালয়ে যাইত না এবং মাদ্রাসা না হইলে সম্পূর্ণ নিরক্ষর থাকিয়া যাইত। যে কারণেই হউক যখন মাদ্রাসা প্রণালী জনসাধারণ মুসলমানের নিকট অপরাপর বিদ্যালয়ের শিক্ষা হইতে অধিকতর আদৃত হইয়াছে, তখন ইহাকে উপেক্ষা করা যুক্তিসঙ্গত হইবে না। ইহারই যোগে মুসলমানের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা পাইতে হইবে। কোনো পদ্ধতিকে দূষণীয় বলিয়া বর্জ্জন করা যত সহজ তাহার স্থানে অপর একটী গড়িয়া তোলা তত সহজ নহে। কিন্তু ইহার মধ্যে যে সমস্ত দোষ আছে, তাহার সংশোধন করা আবশ্যক। 'দীন ও দুনিয়ার' শিক্ষা একাধারে ও সমানভাবে দেওয়া হইবে এই উদ্দেশ্যেই ইহার সৃষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু এই কয়েক বৎসরের অভিজ্ঞতা হইতে প্রমাণিত হইয়াছে যে, এই উদ্দেশ্য আশানুরূপ সফলতা লাভ করিতে পারে নাই।

আমার মনে হয়, এই প্রণালীর প্রধান দোষ এই যে, ইহার পাঠ্য তালিকা শিক্ষার্থীর মানসিক বিকাশের সোপান অনুযায়ী নহে। ইহার ফলে তাহার উপর অত্যধিক চাপ পড়িতেছে, অথচ সে উহা আয়ত্ত করিতে পারিতেছে না। পরীক্ষা পাশের জন্যে সে কোনো প্রকারে কতকগুলি শব্দ কণ্ঠস্থ করিয়া যাইতেছে কিন্তু উহার মর্ম্ম তাহার চিত্ত বিকাশের পক্ষে সহায় হইতেছে না বলিয়া তাহার প্রকৃত শিক্ষালাভ হইতেছে না। জুনিয়র মাদ্রাসায় সুকুমারমতি বালককে মধ্য ইংরাজী স্কুলের যাবতীয় পাঠ্য পড়িতে হইতেছে; তাহার উপর আবার আরবী, উর্দ্দু ও দীনিয়াতের ভার চাপান হইয়াছে। হাই মাদ্রাসার অবস্থাও তদ্রূপ। তথায় শিক্ষার্থীকে হাই স্কুলের ইংরাজী, বাংলা ইত্যাদির সহিত হাদীস, তফসির, কোরাণ, কালাম, ফেকা, ওসুল মনতক ইত্যাদি বিষয় পড়ান হইতেছে। অথচ ইহাদের কোন একটী বুঝিবার মত বুদ্ধির পরিপক্কতা সুলভ শক্তি তাহার হয় নাই। ইহার ফল এই হইতেছে যে শিক্ষার্থীর বুদ্ধিবৃত্তির উন্মেষ না হওয়ায় সে একটি জীবন-যন্ত্রে পরিণত হইতেছে। উপরোক্ত দোষের ফলে ইহার দ্বিতীয় দোষ এই হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, ইহাতে উচ্চ শিক্ষার ভিত্তি দৃঢ় হইতেছে না। যতটুকু গণিত, ভুগোল ও ইতিহাসের জ্ঞান উচ্চ শিক্ষার সোপানে সোপানে আবশ্যক হয় এবং যাহা না হইলে লোক অশিক্ষিত থাকিয়া যায় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, ইহাতে তাহার অভাব রহিয়াছে। প্রথম ও দ্বিতীয় দোষের অনিবার্য্য ফল স্বরূপ ইহার তৃতীয় দোষ এই হইয়াছে যে, ইহা জীবন সংগ্রামের সমস্যা সমাধান করিবার মত বুদ্ধি ও শক্তি পরিপুষ্টি করিবার পক্ষে যথেষ্ট অনুকূল নহে। ইহা দ্বারা শিক্ষার্থী সাংসারিক ক্ষেত্রে তাহার

www.pathagar.com

প্রতিদ্বন্দ্বীদের সহিত সমকক্ষতা করিয়া জীবিকা-অর্জ্জনে সক্ষম নহে। যে শিক্ষা জীবিকা অর্জ্জনের সম্যক্ সহায়তা করে না তাহা দুইদিন পূর্ব্বেই হউক আর পরেই হউক নিশ্চয়ই পরিত্যক্ত হইবে। কিন্তু মুসলমানদের অবস্থা এরূপ নহে যে, তাঁহারা শেষ পর্যন্ত ইহার ফলাফল দেখিবার জন্য অপেক্ষা করিতে পারেন। তাঁহাদের নিকট শিক্ষাক্ষেত্রে আজ প্রত্যেকটি মুহূর্ত্ত মূল্যবান। সুতরাং এখন হইতেই উহার প্রতিকারের চেষ্টা করা আবশ্যক। এস্থলে আশার বিষয় এই যে, ইহাতে ইতি পূর্ব্বেই কিছু কিছু পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে এবং তাহাতে কর্তৃপক্ষের বা জনসাধারণের পক্ষ হইতে কোনো আপত্তি উত্থাপিত হয় নাই।

শিক্ষা ও ধর্ম্ম

শিক্ষার সহিত ধর্ম্মের সংযোগ আবশ্যক। কিন্তু এই সংযোগ প্রকৃত শিক্ষার প্রতিকূল হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে। ধর্ম্মের নামে এই মাদ্রাসাগুলিতে যে সমস্ত বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয় তাহাতে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের দুর্ব্বোধ্য আরবী ভাষায় শব্দগুলি কণ্ঠস্থ করিতে শক্তি ও সময় অযথা ব্যয়িত হয়। তৎসমুদয় মাতৃভাষায় শিক্ষা দিলে অধিকতর সুফল ফলিতে পারে। ইহাতে বিষয়গুলি সহজে আয়ত্ত হইতে পারে, অথচ শিক্ষার্থী পার্থিব বিষয়গুলিতে অধিকতর মনোনিবেশ করিবার সুযোগ পাইতে পারে। কিন্তু আমাদের একটী মোহ আছে, আমরা হাই মাদ্রাসায় বড় বড় আলেমের লিখিত বড় বড় কেতাব পড়াইয়া গৌরব অনুভব করি। সেই মোহকে জয় করিবার জন্য আমাদের প্রস্তুত হইতে হইবে।

এ কথা যেন কেহ মনে না করেন যে, আমি এই বিষয়গুলির বা যে সমস্ত পুস্তক হইতে এই বিষয়গুলি শিক্ষা দেওয়া হয়, সেগুলির সার্থকতা বা প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করি। প্রত্যেক বিষয় শিক্ষার উপযোগী এক একটী সোপান আছে। যে সোপানে ঐ গুলির শিক্ষা দেওয়া হয়, ঐগুলি সেই সোপানের উপযোগ্য নহে। কলেজিয়েট ও ইউনিভার্সিটি সোপানে উহাদের শিক্ষাদান সমধিক সমীচীন হইতে পারে। উহাদের ভাষা ও যুক্তি বুঝিবার জন্য যে আরবীর জ্ঞান আবশ্যক, তাহার জন্য জুনিয়র ও হাই মাদ্রাসায় ব্যবস্থা করা উচিত। আমার মতে মাদ্রাসা শিক্ষার সংস্কার এরূপ হওয়া আবশ্যক যাহাতে আরবী ভাষার জ্ঞানের ভিত্তি ভালরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়, ধর্ম্মের সাধারণ বিধানগুলির ব্যবহারিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয় এবং বিষয়গুলির নির্ব্বাচন এইরূপ হয় যেন তাহা সাধারণ উচ্চ শিক্ষার পরিপন্থী না হয়। হাই মাদ্রাসা সোপানে সাধারণ শিক্ষার ভিত্তি দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইলে ছাত্রগণ উপরের সোপানসমূহে নিজ নিজ যোগ্যতা ও অভিরুচি অনুসারে বিষয় নির্ব্বাচন করিয়া লইতে পারিবে। তাহা হইলে তাহারা পাঠে আমোদ উপভোগ করিতে পারিবে এবং জীবন সংগ্রামেও কাহারও পশ্চাৎপদ হইবে না।

প্রাথমিক শিক্ষা

বর্ত্তমান সময়ে দেশে অবৈতনিক বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্ত্তন সম্বন্ধে আলোচনা চলিতেছে। মুসলিম সমাজে শিক্ষা-বিস্তারের ইহা একটি সুবর্ণ সুযোগ। মুসলমানগণ প্রধানতঃ গ্রামে বাস করে। তাহাদের মধ্যে যাঁহারা উচ্চ শিক্ষা পাইয়াছেন তাঁহাদের অধিকাংশই গ্রাম্য পাঠশালায় বা মক্তবে বিদ্যারম্ভ করিয়াছেন। দূর ভবিষ্যতেও মুসলমানগণ গ্রামের সহিত ঘনিষ্ঠরূপে সম্পর্কিত থাকিবে। সুতরাং তাহাদের মধ্যে উচ্চ শিক্ষার প্রসার করিতে হইলে

www.pathagar.com

প্রাথমিক শিক্ষার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিতে হইবে। যাহাতে এই শিক্ষা গ্রামবাসী সকলে সহজে ও বিনা ব্যয়ে পাইতে পারে তজ্জন্য প্রত্যেক মুসলমানের ঐকান্তিক চেষ্টা করা আবশ্যক। একথা সত্য যে, অবৈতনিক শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হইলে এবং উহার ব্যয়ভার বহনের অপর কোনো ব্যবস্থা না হইলে গ্রাম্য মুসলমানদিগকে অতিরিক্ত কর দিতে হইবে। কিন্তু টাকা না হইলে এরূপ বিরাট ব্যাপার কিরূপে সম্ভবপর হইবে? মুসলমানকে এখনো অনেক কর দিতে হয় কিন্তু এই শিক্ষাকরের মধ্যে তাহার প্রকৃত মুক্তি নিহিত রহিয়াছে। ইহাকে তাহার কিছুতেই ভয় করা উচিত হইবে না। খোদাতা'লার নাম স্মরণ করিয়া সাহসে বুক বাধিয়া ইহার জন্য তাহাকে প্রস্তুত হইতে হইবে। যদি কোনো কারণবশতঃ এই বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষার আইন আইন-সভায় পাশ না হয়, তাহা হইলেও শিক্ষার বন্দোবস্ত তাহাকে করিতে হইবে এবং তাহাতে তাহাকে অধিকতর ক্লেশ ও ক্ষতি স্বীকার করিতে হইবে। বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষায় মুসলিম ছাত্র সংখ্যা এবং তাহাদের কৃতিত্ব দেখিলেই কেহই মনে করিতে পারে না যে, এদেশের মুসলমানগণ শিক্ষাক্ষেত্রে এত পশ্চাৎপদ। গত প্রাইমারী পরীক্ষার ফল কলিকাতা গেজেটে ছাপা হইয়াছে। তাহাতে মুসলিম বালক বালিকাগণ বহুল পরিমাণে বৃত্তি লাভ করিয়াছে এবং গুণানুসারেও সর্ব্বসাধারণের মধ্যে গৌরবজনক উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছে। যদি প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক হয়, তবে শিক্ষার্থীর সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পাইবে এবং তাহাদের মধ্যে যাহারা মেধাবী বলিয়া পরিগণিত হয় তাহাদের উচ্চ শিক্ষার পথ সুগম হইবে। সুতরাং মুসলিম মাত্রেরই ইহাতে সহায়তা করা কর্ত্তব্য। মুসলিম সাহিত্যিকগণেরও এবিষয়ে যথেষ্ট করণীয় আছে। তাঁহারা এ বিষয় সর্ব্বসাধারণকে ভালরূপে বুঝাইবার জন্য তাঁহাদের লেখনী চালনা করিতে পারেন।

স্ত্রী-শিক্ষা

মুসলিম শিক্ষা-প্রসঙ্গে আর একটী বিষয়ের উল্লেখ না করিলে উহা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। মুসলমানদের মধ্যে স্ত্রী শিক্ষার একান্ত অভাব। যতদিন এই অভাব পূর্ণ না হইবে ততদিন তাহারা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, রাজনীতি, শিল্প, বাণিজ্য সকলক্ষেত্রে অপরাপর সম্প্রদায়ের পিছনে পড়িয়া থাকিবে। মাতৃজাতি জাতীয় জীবনের ভবিষ্যৎ নিয়ন্ত্রিত করেন। মাতৃক্রোড়ে শিশুর জীবনের লক্ষ্য নিরূপিত হয়, তাহার উচ্চাকাঙ্ক্ষা অঙ্কুরিত হয়। মাতার সম্মুখে জাতীয় জীবনের যে আদর্শ স্থাপিত হয়, শিশু ঠিক সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়। জাতীয় জীবনের আদর্শ যদি মাতৃগণ আপন প্রাণে অনুভব করিতে না পারেন, তবে তাঁহারা কখন উহা তাঁহাদের সন্তানগণের মনে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত করিতে পারেন না। এই হেতু যে জাতির মাতৃগণের মধ্যে শিক্ষার যত অভাব সে জাতির উন্নতির পথ তত দুর্গম। মুসলমানগণ যদি সমাজ হিসাবে উন্নতি লাভ করিতে ইচ্ছা করে তবে তাহাদিগকে স্ত্রী-শিক্ষার প্রতি ঐকান্তিক মনোযোগ দিতে হইবে।

এস্থলে আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, স্ত্রী-শিক্ষা ইসলাম ধর্ম্মের অবশ্য পালনীয় বিধান হওয়া সত্ত্বেও মুসলমানগণ তাহার প্রতি মারাত্মকরূপে উদাসীন ; অথচ তাহাদের অনেক প্রতিবেশীর মধ্যে ইহার বিরুদ্ধে বহুকালের কুসংস্কার প্রচলিত থাকাতেও তাঁহারা ইহার প্রতি বেশি মনোযোগী। মুসলমানদের এ উদাসীনতা আত্ম-ঘাতী। ইহা তাহাদের সর্বপ্রকার উন্নতির পরিপন্থী। যতদিন তাহারা ইহা ঝাড়িয়া না ফেলিবে ততদিন তাহাদের পদে পদে বিড়ম্বনা

www.pathagar.com

অবশ্যম্ভাবী। কিছুদিন হইল বঙ্গের ডিরেক্টর বাহাদুর মাননীয় ওটেন সাহেব ইডেন স্কুলের পুরস্কার বিতরণী সভায় বলিয়াছিলেন, "মুসলমানগণ এক সময়ে ইংরেজী শিক্ষার প্রতি অবহেলা দেখাইয়া তাহার জন্য আজ অনুশোচনা করিতেছেন। আজ যখন দেশে স্ত্রী-শিক্ষার সাড়া পড়িয়াছে তখন তাহাতে উদাসীনতা দেখাইলে তাঁহারা পুনরায় ঠকিবেন এবং একদিন তাহার জন্য তাঁহাদিগকে অনুতাপ করিতেই হইবে।" কথাটা ঠিক। । এ বিষয় আমাদের ভাবিয়া দেখা উচিত। মানুষ একবার ঠকিলে সাবধান হয়, আর আমরা কি চিরকালই ঠকিতে থাকিব?

অনেক মুসলমান মনে করেন, বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষণীয় বিষয় ও শিক্ষা-দান পদ্ধতি তাঁহাদের বালিকাগণের উপযোগী নহে এবং সেই জন্য তাঁহারা তাহাদের গৃহ শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। অবশ্য, বিদ্যালয়ের শিক্ষা অননুমোদিত হইলে গৃহ শিক্ষার ব্যবস্থায় কিছুমাত্র আপত্তি থাকিতে পারে না। এমন অনেক কৃতবিদ্য লোক আছেন যাঁহারা আমাদের দেশের বালক বিদ্যালয়গুলিকেও শিক্ষার উপযুক্ত স্থান বলিয়া বিবেচনা করেন না এবং তজ্জন্য আপন পুত্রগণের শিক্ষার জন্য গৃহে ব্যবস্থা করেন। কিন্তু মুসলমানদের এই কল্পিত গৃহ শিক্ষাটি যে আদৌ শিক্ষা নহে, একথা তাহাদের অনেকে অন্তরে অনুভব করিলেও মুখে স্বীকার করিতেছেন না।

এদেশের প্রচলিত স্ত্রী-শিক্ষার সংস্কার হওয়া আবশ্যক, ইহা সকলেই স্বীকার করেন। কিন্তু তাই বলিয়া যতদিন ইহার সংস্কার না হয় ততদিন ইহার বর্জ্জন করা কোনো ক্রমেই যুক্তিসঙ্গত নহে। ইহার সংস্রবে আসিলেই কেবল মাত্র ইহার দোষ গুণ ভালরূপ উপলব্ধি করা যাইবে। ইহা হইতে দূরে সরিয়া থাকিলে ইহার গুণেরও পরিচয় হইবে না এবং ইহার দোষেরও সংশোধনের চেষ্টা হইবে না। সাঁতার দিয়াই লোকে সাঁতার শিখিতে পারে। শিশু হাঁটিয়াই হাঁটিতে শিখে। একথা আর কতকাল আমরা না বুঝিয়া থাকিব?

সাহিত্য সমাজে ধর্ম্ম চর্চ্চা

আর একটী কথা বলিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিব। অনেক সময়ে শুনিতে পাওয়া যায়, সাহিত্য সমাজে ধর্ম্ম-চর্চ্চা হয় কেন? সাহিত্যের স্বরূপ সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে তাহা হইতেই ইহার উত্তর পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু এই প্রশ্নটা প্রায়ই উত্থিত হয় বলিয়া এস্থলে উহার পুনরুক্তি করা আবশ্যক মনে করি। জীবনের সাহিত যাহা ঘনিষ্ঠরূপে সংশ্লিষ্ট তাহাই সাহিত্যের আলোচ্য বিষয়। মানুষের ভাব-বৃত্তি-সমূহের প্রকাশ, তাহার কার্য্য প্রণালীর সমালোচনা, সমাজের দোষসমূহের উদঘাটন সাহিত্যের অন্যতম লক্ষ্য। জাতীয় জীবনে যখন যে আদর্শ থাকে তাহাই সাহিত্যে প্রকাশ পায়। পক্ষান্তরে, সাহিত্যিক তাহার অনন্য সাধারণ সূক্ষ্ম-দর্শিতা বলে যাহা সমাজের পক্ষে শ্রেয় ও অনুকরণীয় মনে করেন তাহারই আদর্শ সর্ব্ব-সমক্ষে উপস্থিত করেন। সাহিত্যের সৃষ্টিতে যে সমস্ত উদ্দেশ্য থাকিতে পারে তন্মধ্যে সমাজ সংস্কার অন্যতম। এই উদ্দেশ্যে সাহিত্যিক তাঁহার চক্ষে যাহা নিন্দনীয় ও পরিত্যাজ্য প্রতীয়মান হয় তাহা এরূপ ভাবে সর্ব্ব-সমক্ষে উপস্থিত করেন যেন তৎপ্রতি সকলেরই স্বতঃপ্রণোদিত ঘৃণা ও অশ্রদ্ধার উদ্রেক হয় এবং যাহা প্রশংসার্হ ও কাম্য বলিয়া বিবেচিত হয় তাহা এরূপ ভাবে অবতারণা করেন যেন সর্ব্ব-সাধারণের মন তাহার প্রতি অলক্ষিতে ও অজ্ঞাতসারে আকৃষ্ট হয়। মুসলমানের ধর্ম্ম তাহার সমগ্র জীবনব্যাপী একটি

www.pathagar.com

সমস্যা। তাহার ঐহিক ও পারত্রিক সম্বন্ধ এরূপভাবে জড়িত যে তাহাদের বিচ্ছেদ কল্পনা করা সম্ভবপর নহে। সুতরাং কোনো মুসলমান সাহিত্যিক সমাজ সংস্কার উদ্দেশ্যে সাহিত্যসেবায় ব্রতী হইলে তাঁহার ধর্ম্ম-সম্বন্ধে আলোচনা করা অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে। তখন তাঁহার সহিত কাহারো মতের অনৈক্য হইলে তজ্জন্য অসহিষ্ণু হওয়া উচিত নহে। শান্তভাবে তাঁহার প্রতিবাদ করা যাইতে পারে। তাঁহার মতের মধ্যে যাহা অনভিপ্রেয়, যুক্তি সহকারে তাহার খণ্ডন করা যাইতে পারে। ইহাতে এক দিকে যেমন সাহিত্যের স্ফূর্ত্তি হইতে পারে, অপর দিকে তেমনি অপরের ব্যক্তিত্বের প্রতি শ্রদ্ধা বর্দ্ধিত হইতে পারে। কিন্তু অজ্ঞতার ন্যায় শত্রু আর নাই। যখন যিনি যে বিষয়ে আলোচনা করিবেন, সে বিষয়ে যাহা জ্ঞাতব্য আছে তাঁহার তাহা যথাসম্ভব জানিয়া শুনিয়া আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। তাহা হইলে আলোচনা প্রকৃত পক্ষে সুফলপ্রদ হইবে এবং তাহাতে কোনো পক্ষ হইতে বিশেষ কোনো আপত্তির কারণ থাকিবে না।

উপসংহার

এইক্ষণ আমি উপসংহার করিয়া আপনাদের ধৈর্য্য-পরীক্ষা শেষ করিব। যাহা আমি বলিয়াছি তাহা খুব গভীর জ্ঞান বা গবেষণার কথা নয়। আজ আমাদের সমাজের মধ্যে যে সমস্ত সমস্যা সমাধানের জন্য ক্রন্দন করিতেছে তাহারই প্রতি আপনাদের শুভ দৃষ্টি ও বিস্তৃত জ্ঞান আকর্ষণ করিতেছি মাত্র। সকলেই এ সমস্ত বিষয় অবগত আছেন—কিন্তু আমাদিগকে এমন একটা নিসাড় ভাব ও ভীরুতা ঘিরিয়া রাখিয়াছে যে, আমরা একেবারে সাড়া শব্দ করিতে চাহিতেছি না। "মুসলিম সাহিত্য সমাজের" চেষ্টা এই নিসাড়তার মূলে কুঠারাঘাত করিতে সক্ষম হউক—এই কামনা করি।

আজ আমার সকল প্রার্থনার মধ্যে সবচেয়ে বড় প্রার্থনা এই—"হে খোদাঅন্দ! মুস্‌লিম সাহিত্যিকের লেখনী শক্তিশালী হউক—তাহার চিত্ত উন্মুক্ত সম্প্রসারিত হউক—তাহার বুদ্ধি বিকশিত হউক—তাহার রুচি মার্জ্জিত হউক—মুস্‌লিম অমুস্‌লিম তাহার অন্তরে শ্রদ্ধার পাত্র হইয়া উঠুক।"

www.pathagar.com

তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশনের অভ্যর্থনা-সভাপতির অভিভাষণ

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্

সমবেত সাহিত্যসেবী সুধীবৃন্দ ও ভদ্রমণ্ডলী,

উপযুক্তরূপে আপনাদের অভ্যর্থনা করি—এমন কিছু সম্বল আমাদের নেই। তাই শুধু "সুনৃতা বাক্" দিয়ে আপনাদের অভিনন্দন করছি। স্বাগত মাতৃভাষার সাধকগণ! স্বাগত মাতৃভাষার সেবক ও ভক্তগণ! "আহ্লান্ ওয়া সহ্লান্।" "খোশ আমদেদ।"

আজ দেশের মধ্যে মুক্তির ডাক এসেছে। কিন্তু সে ডাক অতি ক্ষীণ। দূরের বাঁশীর সুরের মত কখন সে কানে এসে লাগে, কি না লাগে। অলস ভীরু কাপুরুষ আমরা, তার উপর তন্দ্রা ঘোরে ভোর। চাই আমাদের জন্য তুরি ভেরীর তীক্ষ্ণিন বিকট নিখাদ নাদ। তা না হলে জীবনের রাঙা পতাকার নীচে দলে দলে মুক্তি ফৌজ এসে জমবে না; তা না হলে মুক্তির লড়াই আমাদের চলবে না; তা না হলে মুক্তি আমাদের মিলবে না।

তাই চাই আমাদের বীর্য্যবন্ত সাহিত্য। মাত্র একখানি পুস্তক আরবের বহু যুগের কাল ঘুম ভেঙে দিয়ে সমস্ত দুনিয়া তোলপাড় করে এক নতুন প্রাণ গড়ে তুলেছে। মাত্র একটী গীত প্রাচীন ফরাসীর শিরায় শিরায় আগুনের শিখা জ্বালিয়ে যত পুরানকে ছাই করে এক নতুন ভাব জগতে জাগিয়ে দিয়েছে। কালাম ও কলমের, বাণী ও লেখনীর এমনই অপূর্ব্ব ক্ষমতা! তাই কুরআন তার দৈবী ভাষায় ঘোষণা করছে—"নুন্ ওয়াল্ কলম, ওয়া মা য়সতুরূন" '(লক্ষ্য কর) দোয়াত, কলম এবং যা তারা লেখে' (সূরহ্ কলম)।

সাহিত্য যদি সত্যিকার সাহিত্য হয় তবে সে মুক্তি দিবেই-দেহের মুক্তি, মনের মুক্তি, আত্মার মুক্তি। এই তিনটী নিয়েই মানুষ। একটী ছেড়ে অন্যের মুক্তিতে মুক্তি নেই। সাহিত্যের সকল উদ্দেশ্যই ঘুরে ফিরে এসে দাঁড়ায় এখানে। এই মুক্তিকেই মাঝের বিন্দু করে সাহিত্য চারিদিকে ঘুরবে। আলঙ্কারিক মম্মথ ভট্ট কাব্যের ফল সম্বন্ধে বলছেন—

কাব্যং যশসেহর্থকৃতে ব্যববহারবিদে শিবে তরক্ষতয়ে।
সদ্যঃ পরনির্বৃতয়ে কান্তাসম্মিততয়োপদেশযুজে॥

"কাব্য যশের জন্য, টাকা কড়ির জন্য, আচার ব্যবহার জানবার জন্য, অমঙ্গল দূর করবার জন্য, সদ্য সদ্য পরম শান্তি লাভের জন্য, প্রেয়সীর ন্যায় উপদেশ দিবার জন্য।" সে সাহিত্য বিফল, যা মুক্তির সন্ধান দেয় না।

আজ সাহিত্যের মার্কা নিয়ে একটা জিনিস বাজারে চলছে। শুনি তার খাঁকতিও কম নয়, বিশেষ করে যুবক মহলে। তার উদ্দেশ্য হচ্ছে তরুণ তরুণীদের একটা অপূর্ব্ব দুর্দ্দান্ত ইচ্ছাকে রক্তমাংসময় কল্পনা দিয়ে পূর্ণ করা। রহমানে ও শয়তানে যে তফাৎ, আঙুরে ও শরাবে যে তফাৎ, মুক্তি ও বন্ধনে যে তফাৎ আসল সাহিত্যে ও এই নকল সাহিত্যে, সেই তফাৎ। হায়! অবোধ পাঠক জানে না সাইরেনের বাঁশরীর এই সুরের ন্যায় অসাহিত্য তাকে

www.pathagar.com

ধ্বংসের দিকে পলে পলে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। জাতির সমস্ত যৌব-শক্তি এই সাহিত্য, জোঁকের মত নিঃসাড়ে চুষে নিচ্ছে।

সাহিত্যের হাটে যে কেবল এই কামাগ্নিসন্দীপনী বটিকাই বিক্রি হচ্ছে তা নয়। এর চেয়েও ভয়ানক ভয়ানক জিনিস—একেবারে সাক্ষাৎ বিষ-নানা মনোহর নামে ও রূপে কাটতি হচ্ছে। পরখ করলেই অনায়াসে দেখা যাবে সেগুলির ভিতর আছে কুসংস্কার, ধর্ম্মান্ধতা, জাতীয় বিদ্বেষ প্রভৃতি। এ সমস্ত জাতির আত্মা ও মনকে বিষাক্ত করে দেশে কি অশান্তিই না ঘটাচ্ছে।

আমি রসিক নই; আর্ট বুঝি। কিন্তু আর্টের নামে কি গণিকার উলঙ্গ অঙ্গ ভঙ্গীকেও প্রশ্রয় দিতে হবে? তারীফ করতে হবে? আমি সাহিত্যের স্বাধীনতা বুঝি। কিন্তু তাই বলে কি সাহিত্যের পবিত্র তীর্থ ক্ষেত্রে অমৃতের নামে বিষ কিংবা রসের নাম প্রস্রাব বিক্রিরও লাইসেন্স দিতে হবে? আমাদের এক জিহাদ ঘোষণা করতে হবে এই অপসাহিত্যের বিরুদ্ধে। তবেই জানি "মুসলিম সাহিত্য সমাজ" একটা ফাঁকা আওয়াজ নয়—সে এক "হয়দরি হাঁক" অসত্য অশিব অসুন্দরের বিরুদ্ধে অভিযানের। আজ সমস্ত মুসলিম বঙ্গ অনিমেষে চেয়ে আছে তার খিযরের জন্য যে তাকে পরাণ ভরে এই সত্যিকার সাহিত্যের "আবে-হয়াতের" পরিচয় করে দেবে। বোধ হয় শূন্যে খিযরের আবির্ভাব হয়েছে, নইলে এত সাকী জুটল কোথা থেকে?

"উম্‌রি তাঁ বাদা দরায্ আয় সাকীয়ানি জম্।
গর্‌চি জানি-মা না শুদ্ পুর্ ময় ব-দওরানি শুমা।"
জম্ বাদশার সাকী ভাই সব! আয়ু তোদের বৃদ্ধি হোক,
যতই কেন গের্‌লা মোদের তোদের দানে শূন্য রোক। (হাফিজ)

বাহন উপযুক্ত না হলে কেউ তার অভীষ্ট স্থানে পৌঁছুতে পারে না। লক্ষ্য লাভ করতে গেলে সাহিত্যেরও বাহন উপযুক্ত হওয়া চাই। সেই বাহন মাতৃভাষা। মাতৃভাষা ছাড়া আর কোন ভাষা কানের ভিতর দিয়ে মরমে প'শে পরাণ আকুল করে? ডন কুইকসোট একটা রোগা ঘোড়ায় চড়ে বাহাদুরি করতে বেরিয়েছিলেন। তার চেয়ে বাহাদুরি বলতে হবে তাঁদের যাঁরা বিদেশী ভাষার সাহায্যে জাতীয় সাহিত্য গড়তে চান। মিলটনের ল্যাটিন কবিতা এখন ঘুণের খোরাক হয়েছে। মধুসূদনের Captive Lady এখন ভোলা-দরিয়ার অথই জলে ডুবে গেছে। বঙ্কিমের Rajmohon's Wife এর সন্ধান দু'একটী বইয়ের পোকা ছাড়া আর কে রাখে?

এই প্রসঙ্গে উর্দ্দুর কথা উঠতে পারে। মানি উর্দ্দু শেখা দরকার। কিন্তু তার চেয়ে বেশি দরকার আরবী শেখা। যদি উর্দ্দুর সাহায্যে আব্রহ্ম ভারতে আমরা পরস্পরকে জানতে পারি, আরবীর সাহায্যে ফিলিপাইন থেকে মরক্কো, সাইবিরিয়া থেকে জাভা পর্যন্ত সমস্তকে চিনতে পারি। কিন্তু আরবী বা উর্দ্দু শেখা এক কথা, আর তাকে সাহিত্যের বাহন করা আর এক কথা। বলা হয় বাংলায় মুসলিম সাহিত্য নেই। কিন্তু গোড়ায় উর্দ্দুতেই কি ছিল? ফারসীর কথা ধরা যাক। তাতে এক বিরাট মুসলিম সাহিত্য আছে। অল্প বিস্তর তুর্কীতে আছে; সিন্ধীতে আছে, মালয় ভাষায় আছে। শুরুতে এদের কোনটাইত মুসলিম সাহিত্যের ভাষা ছিল না। তবে বাংলার বেলা কেনই বা দোষ হবে? একটা মস্ত কথা আমরা ভুলে যাই যে, আজ নতুন করে নয় বরং প্রায় চারশ বছর ধরে মুসলমান এই বাংলা সাহিত্যের সেবা কচ্ছে। শুধু তাই নয়

www.pathagar.com

আমরা আরও জানি যে মুসলমান আমীর ওমরার নেক নজরেই বাংলা সাহিত্য গড়ে উঠেছিল। সেই য়ুসুফ শাহ, হোসেন শাহ, নসরৎ শাহ, পরাগল খান, ছুটী খানের নাম বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে সোনার হরফে লেখা থাকবে। কাযী দৌলত আরাকান রাজ খিরি খুধম্মা রাজার সময়ে (১৬২২–১৬৩৮ খ্রী. অব্দে) "সতী ময়নাবতী ও লোর চন্দ্রানী" রচনা করেন। কিন্তু সম্পূর্ণ করবার পূর্ব্বেই মারা যান। তা পুরা করেন সৈয়দ আলাওল। সৈয়দ আলাওল মধ্য যুগের বাঙালি মুসলিম সাহিত্যিকদের মাথার তাজ। তিনি আরবী, ফারসী, উর্দ্দু, সংস্কৃত ও বাংলা ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁর প্রথম রচনা "পদ্মাবতী" আরাকান রাজ খদো মিন্তার রাজার রাজত্ব সময়ে (১৬৪৫–১৬৫২ খ্রী. অব্দে)। খুব সেকেলে বলেই এঁদের নাম করলাম। এঁদের ছাড়াও অসংখ্য কবি, গায়ক ও লেখক বরাবরই বাংলা ভাষায়ই তাঁদের রচনা প্রকাশ করে ধন্য হয়েছেন। শ্রদ্ধেয় ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেনের ও বন্ধুবর মৌলভী আবদুল করীম সাহিত্য বিশারদের প্রসাদে তাঁদের অনেকের খবর আমরা পেয়েছি। আজ আমরা কেমন করে বাংলা ভাষাকে উপেক্ষা করতে পারি? তিন শতাব্দীর পূর্ব্বের কবি কাযী দৌলতের বাংলার নমুনা দেখুন!

বিসমিল্লা প্রধানেক নাম নিরঞ্জন।
যে নাম স্মরণে কার্য্য সিদ্ধি সর্ব্বক্ষণ॥
কি করিব যমদূতে বিপক্ষ বিবাদ।
সর্ব্বসিদ্ধি জয় জয় সে নাম প্রসাদ॥
রহমান নাম অর্থ করুণা সদায়।
যে নাম স্মরণে দুঃখ দারিদ্র খণ্ডায়॥
সুজন দুর্জ্জন আদি যত জীব জান।
ভক্ষকেরে কুশলে করান্ত ভক্ষ দান॥
রহিম নামের অর্থ কি কহিমু আর।
দীন দয়াময় প্রভু মহিমা অপার॥
দয়ার সাগর প্রভু পতিত পাবন।
দুঃখী পাপী নৃপতির সহায় কারণ॥
লীলায় পাপের মূল করয় বিনাশ।
তুলা রাশি দহে যেন প্রচণ্ড হুতাশ॥

এক শ্রেণীর কাছে বাংলা ভাষা বলতে বোঝায় অনুস্বর বিসর্গ ছাড়া সংস্কৃত। বাংলার সৌভাগ্য সে শ্রেণী এখন এক রকম লোপ পেয়েছে। তেমনি অন্য দিকে আর এক শ্রেণী আছে তাদের কাছে বাংলা মানে আরবী–ফারসী–উর্দ্দু–বাংলার এক অপূর্ব্ব খিচুড়ি। দুই রকমের দুটো উদাহরণ দিচ্ছি।

১ নম্বর

চমকি বিশ্ব নব–বীর্য্য সূর্য্য–নৃপ রজনি–রাজ্য অবসন্নে,
উদিত উদয় গিরি–কনক–মরুপরি গঞ্জি মঞ্জমণিবর্ণে।
দীপ্ত রশ্মিচয় সৈন্যনিচয়সম, (বিষম যুগাগ্নি বিনিন্দে)
ভস্মিল হতকর–পতিত–রজনিকর যোদ্ধ নিকর উড্ডবৃন্দে)।

২ নম্বর

হল্‌কুমে হানে তেগ ও কে বসে ছাতিতে?
আফতাব ছেয়ে নিল আঁধিয়ারা রাতিতে।

www.pathagar.com

আসমান ভরে গেল গোধূলিতে দুপুরে
লাল নীল খুন ঝরে কুফারের উপরে।

এই দু' দলের হাত থেকে বাংলা ভাষাকে রক্ষা করতে হবে। তবেই বাংলার প্রাণ বাঁচবে। তা না হ'লে বাংলা মরে ভূত হয়ে যাবে—একটা নয় দুটো। একটী ব্রহ্ম দৈত্যি, আর একটা মামদো। আমরা জীবন্ত বাংলাকেই চাই, তার ভূতকে নয়।

টেকচাঁদ, বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথের হাতে বাংলা ভাষার অনেকটা সংস্কার হয়েছে। এখন কিছু বাকী ভাষার দিক দিয়ে। কিন্তু বাংলার বানান বিভীষিকা এখনও ঘোচে নি। সেখানে মস্ত বড় একটা সংস্কারের দরকার। সংস্কৃতের দুটো ব বাংলায় একাকার হয়ে বানান সংস্কারের পথ দেখিয়ে দিচ্ছে। তিনটে শ, ষ, স, দুটো ণ, ন, দুটি জ, য এদেরও একাকারের দরকার আছে। বানান সংস্কারের নযীর পালি, প্রাকৃত ও অপভ্রংশে পাওয়া যাবে। কিন্তু কারো ত সাহসে কুলায় না। ব্রহ্ম শাপের ভয়ে নাকি !

খালি বানানে নয়, অক্ষরেও তার সংস্কারের দরকার আছে। যুক্তাক্ষর গুলি অনেক স্থলেই রাসায়নিক মিশ্রণের মত হয়ে যাচ্ছে। এতে যে খুঁট আখুরে ছেলে মেয়ের প্রাণান্ত হয়ে যাচ্ছে। ভবিষ্যতে বাংলা যখন ইংরেজি রাসি আদি ভাষার মতন পৃথিবীর একটা গণ্যমান্য ভাষা হয়ে উঠবে, তখন হয়ত, লাতিন হরফ চালাতে হবে। আপাততঃ যুক্তাক্ষরের একটা ব্যবস্থা হওয়া উচিত। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধির মতটা সকলে মেনে নিলেই গোলমাল চুকে যায়। কিন্তু আমরা এমনই প্রাচীন পন্থার দাস, যে এই সংস্কারটুকুও বরদাস্ত করতে প্রস্তুত নই।

আমরা অনেকবার বলেছি মুসলিম সাহিত্য। কেউ হয়ত বলতে পারেন "কি গোঁড়ামি। সাহিত্যেও আবার জাত বিচার।" তাই একটু খোলাসা করে বলা দরকার—মুসলিম সাহিত্য বলতে কি বুঝি। "আমাদের ঘর ও পর, আমাদের সুখ ও দুঃখ, আমাদের আশা ও ভরসা, আমাদের লক্ষ্য ও আদর্শ নিয়ে যে সাহিত্য, তাই অমাদের সাহিত্য। কেবল লেখক মুসলমান হলেই মুসলমান সাহিত্য হয় না। হিন্দু সাহিত্য অনুপ্রেরণা পাচ্ছে বেদান্ত ও গীতা, হিন্দু ইতিহাস ও হিন্দু জীবনী থেকে। আমাদের সাহিত্য অনুপ্রেরণা পাবে কুরআন ও হাদীস, মুসলিম ইতিহাস ও মুসলিম জীবনী থেকে। হিন্দুর সাহিত্য রস সংগ্রহ করে হিন্দু সমাজ থেকে, আমাদের সাহিত্য করবে মুসলিম সমাজ থেকে। এই সাহিত্যের ভিতর দিয়েই বাংলার হিন্দু মুসলমানের চেনা পরিচয় হবে। চেনা হলেই ভাব হবে। ''To know is to love.'' এই সেদিন দীনেশ বাবু বলেছেন, "যদি মুসলমানগণ তাঁহাদের সমাজের উন্নত চরিত্রগুলি সুন্দর মহিমান্বিত বর্ণে চিত্রিত করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যে উপস্থিত করেন, তবে হিন্দু মুসলমান এক সঙ্গে তাঁহাদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইবেন।" আমরা একেই বাংলার মুসলিম সাহিত্য বলি। হিন্দু সাহিত্য ও মুসলিম সাহিত্য হিন্দুর মন্দির ও মুসলমানের মসজিদের মত এক সম্প্রদায়ের একচেটে জিনিস নয়। সুহৃদ্বর সত্যেন্দ্র দত্ত, ভক্তিভাজন গিরিশচন্দ্র সেন, মাননীয় কৃষ্ণকুমার মিত্র, শ্রদ্ধেয় জলধর সেন, শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় প্রভৃতি হিন্দু লেখকও অনেক মুসলমান সাহিত্য রচনা করেছেন। বাস্তবিক বাংলা সাহিত্য বাংলার হিন্দু মুসলমানের অক্ষয় মিলন-মন্দির হবে। হিন্দু সাহিত্য ও মুসলিম সাহিত্য হবে তার দুই কুঠরী। সর্ব্বত্রই সকলের অবাধ প্রবেশ অধিকার। যে পর্যন্ত মুসলিম সাহিত্য না গড়ে উঠছে সে পর্য্যন্ত মিলন মন্দির পূর্ণাঙ্গ হচ্ছে না।

www.pathagar.com

তবে, এস হিন্দু ও মুসলমান ! এস সাহিত্যিক ও সাহিত্য ভক্ত ! এস কবি ও গায়ক ! এস ঐতিহাসিক ও দার্শনিক ! আমরা এই মিলন মন্দির গড়ে তুলি। এস কিশোর কিশোরী, এস তরুণ তরুণী, এস জরৎ–জরতী, এই মিলন–মন্দিরে এক মন প্রাণ হয়ে মুক্তি সাধনা করি।

এখন ঋষি–কবির ভাষায় প্রার্থনা করে আমার অভিভাষণ শেষ করি :

চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির,
জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর

আপন প্রাঙ্গণতলে দিবসশর্ব্বরী
বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি,

যেথা বাক্য হৃদয়ের উৎস মুখ হতে
উচ্ছ্বসিয়া উঠে, যেথা নির্ব্বারিত স্রোতে

দেশে দেশে দিশে দিশে কর্ম্মধারা যাক্
অজস্র সহস্রবিধ চরিতার্থতায় ;

যেথা তুচ্ছ আচারের মরুবালিরাশি
বিচারের স্রোতঃ পথ ফেলে নাই গ্রাসি'

পৌরুষেরে করেনি শতধা ; নিত্য যেথা
তুমি সর্ব্ব কর্ম্ম চিন্তা আনন্দের নেতা,—

নিজ হস্তে নির্দ্দয় আঘাত করি পিতঃ
আমাদের সেই স্বর্গে কর জাগরিত।

www.pathagar.com

তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতি অভিভাষণ

আবুল মজফফর আহমদ

মুসলিম ভ্রাতৃবৃন্দ ও সমবেত ভদ্রমণ্ডলী,

আপনারা এই সম্মিলনের সভাপতি নির্ব্বাচিত করিয়া আমাকে যে অশেষ সম্মান দিয়াছেন তজ্জন্য সর্ব্বপ্রথম আপনাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি। কিন্তু আজ নিজে সভাপতি না হইয়া আপনাদের সহিত মিলিয়া আমার চেয়ে অধিকতর বিজ্ঞ ও শক্তিশালী কোন মহাত্মাকে আপনাদের ভবিষ্যৎ পথ নির্দেশ করিবার জন্য এই সভার সভাপতিত্বে বরণ করিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার সুযোগ পাইলে আমার পক্ষে ইহাপেক্ষা ঢের বেশী সুখের বিষয় হইত।

বন্ধুবর মিঃ হুসেন যখন আমাকে এই দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার গ্রহণ করিতে আমন্ত্রণ করেন তখন আমার মনে শঙ্কার সঞ্চার হইয়াছিল কারণ বহুদিন হইল আমি সাহিত্য-চর্চা ত্যাগ করিয়া আইনচর্চ্চায় মন দিয়াছি। কাজেই, আধুনিক বিবিধ সাহিত্যিক ভাবধারার সহিত আমার কোন প্রত্যক্ষ পরিচয় নাই। অতএব আপনারা একজন প্রবীণ অভিজ্ঞ সাহিত্যিকের নিকট হইতে যাহা আশা করিতে পারিতেন তাহা আমার নিকট হইতে কখনই আশা করিতে পারেন না। তিনি বিষয়টী আরও মধুর করিয়া বলিতে পারিতেন এবং সত্যকার সাহিত্যিক রুচি-সৃষ্টির জন্য তিনি আপনাদের উৎসাহ ও আকাঙ্ক্ষা আরও বেশি উদ্দীপিত করিতে পারিতেন। আমার অবস্থা বরং একজন সাধারণ গুরুমহাশয়ের মতো—যিনি তাঁহার ছাত্রের প্রয়োজনের বেশি কিছু দিতে এবং তরুণ প্রাণে স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করিতে অসমর্থ। তবুও আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি এবং ভরসা করি, আমার সাধ্যমত চেষ্টা সত্ত্বেও আমার ত্রুটি বিচ্যুতি ঘটিলে আপনারা উদার গুণে তাহা মার্জ্জনা করিয়া লইবেন। আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট প্রার্থনা করি যেন তিনি এই অধিবেশন সাফল্য-মণ্ডিত করেন।

সর্বপ্রথম আমি এই "মুসলিম সাহিত্য সমাজের" সভ্য ও সারথিগণকে বিশেষতঃ সম্পাদক ও সভাপতি সাহেবকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। গত তিন বৎসর তাঁহারা এই সমাজের উন্নতির জন্য বহু আয়াস স্বীকার করিয়াছেন। পূর্ব্ববঙ্গের তরুণ সমাজে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা জাগাইতে, জ্ঞানের পিপাসা সৃষ্টি করিতে এবং জ্ঞানের অমৃত ধারার সন্ধান দিতে যাইয়া তাঁহারা যে অক্লান্ত পরিশ্রম ও অনন্যমন প্রতিজ্ঞার পরিচয় দিয়াছেন তজ্জন্য তাঁহারা অশেষ ধন্যবাদের পাত্র। এই সমাজের শৈশব অবস্থায় তাঁহাদের যে কি প্রকার বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিতে হইতেছে তাহা আমি বিশেষরূপে অবগত আছি। আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট এই প্রার্থনা করি তিনি যেন তাঁহাদের মনে অধিকতর উৎসাহ, তেজ ও শক্তি দান করেন যাহাতে এই সমাজ অচিরে সমগ্র বাংলা তথা ভারতের যাবতীয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান-মার্জ্জিত প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অন্যতম বলিয়া পরিচয় লাভ করিতে সমর্থ হয়।

www.pathagar.com

আসল কথা তুলিবার আগেই আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই আমাদের বর্ত্তমান অজ্ঞতা ও মূর্খতার প্রতি। আপনারা জানেন, আধুনিক জগতের মুক্তবুদ্ধি ও জ্ঞানদীপ্ত জাতিসমূহের মধ্যে বাংলার মুসলমানের স্থান সর্ব্বনিম্নে। স্বভাবতই আমরা অনুকরণ-প্রবণ। অন্যের হাবভাব আচার ব্যবহার গতিবিধি সমস্তই হুবহু অনুকরণ করিবার একটি প্রবল ইচ্ছা আমাদের মধ্যে জাগ্রত। কিন্তু আমি সতর্ক করিতেছি কোন কিছুই বিচার-বুদ্ধি দ্বারা পরীক্ষা না করিয়া গ্রহণ করা কর্ত্তব্য নয়। কোন ভাবধারা ভাল বলা হইলেই বা প্রচারিত হইলেই যে গ্রহণ করিতে হইবে তাহা নহে, বিচার করিয়া তাহার গূঢ় সত্য সম্বন্ধে বিশেষরূপে নিঃসন্দেহ হইয়া তাহা গ্রহণ করা উচিত। কারণ কোন একটি ভাবধারা একটি বিশেষ আবহাওয়ায় বা দেশে কার্যকরী হইতে পারে বটে, কিন্তু অন্য আবহাওয়ায় বা দেশে তাহা তদনুরূপ কার্য্যকরী নাও হইতে পারে। প্রত্যেক আন্দোলনের প্রাণ বুঝিবার জন্য আমাদের বিশেষ চেষ্টা করা দরকার। প্রত্যেক অনুষ্ঠান প্রবীণ ও শ্রদ্ধেয় হইলেও তাহা যুক্তি-বিচারের কষ্টিপাথরে যাচাই না করিয়া গ্রহণ করা কর্ত্তব্য নয়। মৌলিক চিন্তাই সাহিত্যিক আন্দোলনের প্রাণ এবং যুক্তি-বিচার-বিশ্লেষণ এই মৌলিক চিন্তার জনক ও পরিপোষক। ইহাতে ভাববিপর্যয় ঘটে না বরং সাধারণ জ্ঞান প্রখর হয়। মোট কথা মৌলিকতাই সাহিত্যের প্রসার বৃদ্ধি করে কিন্তু অনুকরণ তাহার প্রাণ সংহার করে। বাংলা সাহিত্য ইস্‌লামের অগ্নি রসে মার্জ্জিত হইয়া উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি লাভ করুক এবং আধুনিক জগতের প্রয়োজন অনুসারে মুসলিম সমাজের সামাজিক, আর্থিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার আলোচনায় সমৃদ্ধ হইয়া উঠুক।

এস্থলে জাতি বিশেষের সাহিত্যের জন্ম সম্বন্ধে সংক্ষেপ কিছু ইঙ্গিত করা কর্ত্তব্য। সাহিত্যের সংজ্ঞা একান্ত করিয়া কেহই আজ পর্যন্ত দিতে সমর্থ হন নাই। আমি এ সম্বন্ধে সামান্য একটু ইঙ্গিত করিব মাত্র। আমার মনে হয়, কি ব্যক্তি কি জাতি যখন আপনার সত্তায় [সত্তায়] উদ্বুদ্ধ ও তাহার ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে জাগ্রত হইয়া উঠে তখনই সাহিত্য-ধারা প্রবাহিত হইতে শুরু করে। এই ব্যক্তিত্ব বা আত্মানুভূতি আর সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতায়ালার উপলব্ধি একই পর্যায়-ভুক্ত। মান আরাফা নাফসাহু ফাকাদ আরাফা রব্বাহু।[১]

ইহার পোষকতা আমরা পারস্য কাব্যের প্রথম চরণেই দেখিতে পাই।

মান আম আ পিল দামান ওয়া মান আম আ শিরিলে
নাম বেহরাম তুবা পিদরত বুজারলে।[২]

এই কাব্যে শাহনামার প্রসিদ্ধ বীর বাহরাম গোর পারস্যের সুদূর অরণ্যে দুর্দ্দান্ত গোর খারের শিকার কালে স্বকীয় শৌর্য্য ও বীর্য্যের বর্ণনা করিতেছেন। প্রবাদ আছে, পারস্য কাব্যে প্রথম এই দুইটী চরণ উচ্চারিত হইলে জনৈক প্রবল পরাক্রান্ত পারস্য সম্রাট্ বন্যজন্তু শিকার কালে স্বীয় অসাধারণ শৌর্য্য ও বীর্য্য সম্বন্ধে সজাগ হইয়া উঠেন। উদ্ধৃত চরণ দুইটী বাহরাম গোরের আত্মানুভূতিরই প্রকাশ বৈ আর কিছু নয়। চির-রহস্যময় বিশ্ব-স্রষ্টার ইঙ্গিতে গোর তাহার এই উপলব্ধি অন্যের নিকট ব্যক্ত করিবার জন্য বাক্যে প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল অপর সকলেই তাঁহার এই উপলব্ধিতে উদ্বুদ্ধ হউক। এই প্রকার প্রকাশের সাহায্যে তিনি অজ্ঞাতসারে সাহিত্যের সৃষ্টি করিতেছিলেন। বস্তুতঃ সাহিত্যস্রষ্টা বলিয়া যাঁহারা জগতে অমর হইয়াছেন—তাঁহারা যে শুধু তাঁহাদের অন্তরাত্মার উপলব্ধি করিয়াই সন্তুষ্ট ছিলেন তাহা নহে তাঁহারা বিশ্বের অপরূপ রহস্যজ্ঞান লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। বিশ্ব-বিশ্রুত

www.pathagar.com

সাহিত্যিকগণের দৃষ্টি কত মার্জ্জিত ও প্রসারিত, অনুভূতি কত তীব্র ও গভীর! তাঁহাদের জীবন অসীম আনন্দে নৃত্য করিয়া চলে আর এই সুন্দর ভুবনকে নিরানন্দ বলিয়া তাঁহারা স্বীকার করিতে চান না। তাঁহাদের অন্তশ্চক্ষুতে এমন এক অভিনব আলোক রেখার সম্পাত হয় যাহার তুলনা কি স্বর্গে কি মর্ত্ত্যে অতীব বিরল। তাই আমরা সত্যই কবি Wordsworth এর সঙ্গে গাহিতে পারি—

"...Add the gleam
The light that never was on Sea or land
The consecration and the poets dream."

এই সমস্ত সাহিত্যিক পুরোহিত আমাদের দৃষ্টি পথে খুলে ধরেন সেই—

"Magic casements opening on the foam
Of perilous seas in fairy lands forlorn."

ইহাতে একদিক যেমন বিশ্বের সৌন্দর্য ও মহিমা প্রকাশ পাইতেছে অন্যদিকে তেমনি সমস্ত সৃষ্টবস্তুর অন্তর্নিহিত এবং মানব-অন্তরের চিরন্তন পরমানন্দ ফুটিয়া উঠিয়াছে। কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ যখন বিশ্বজনীন আনন্দের গান গাহিয়াছেন তখন এই আনন্দই তাঁহার লক্ষ্য ছিল। কবি-গৌরব সেখ সাদীও গাহিয়াছেন :

বর্‌গে দোরখ্‌তানে সব্‌জ দর নজরে হুশিয়ার
হর্ ওয়ারাকে দফতর ইস্ত মা'রিফাতে কের দেগার।[৩]

ব্যক্তির পক্ষে যাহা জাতির পক্ষেও তাহাই প্রযোজ্য। কোন জাতিই সর্ব্বাগ্রে আপনার সত্তায় উদ্বুদ্ধ না হইয়া সাহিত্যের জন্ম দিতে পারে না। যে মুহূর্ত্তে এই অনুভূতি ও আত্মবৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে চেতনা জাগ্রত হইয়া উঠে সেই মুহূর্ত্ত হইতে জাতির সাহিত্য-পুষ্প মুকুলিত ও প্রস্ফুটিত হইতে শুরু করে। তাহার সৌরভ-মাহাত্ম্য তখন জাতির অস্তিত্বকে মহিমামণ্ডিত করিয়া তুলে। কোন কিছুই আর তখন তাহার গতিরুদ্ধ করিতে পারে না। সাহিত্যের প্রাণ-শক্তি মানবজাতির সংহতি সাধন করিবার একটী কার্যকরী উপকরণ। সত্যকার সাহিত্য-প্রীতি বিশ্ব শক্তির সহিত মোকাবিলা করাইয়া বিভিন্ন প্রাণসংহারক শক্তি ও পৃথক্ পৃথক্ বিরুদ্ধস্বার্থবিশিষ্ট ক্ষুদ্র সমাজকে একই পথে চালিত করিতে সক্ষম হয়। মূলতঃ সাহিত্য প্রাণ এবং জীবন চর্চ্চার একটী চমৎকার উপায়। কবি, ঔপন্যাসিক ধর্ম্মযাজক সকলেই মানুষ ও তাহার প্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান বৃদ্ধি করিবার জন্য সাহিত্য সম্পদশালী করিয়াছেন।

সাহিত্যের কাজ মানব-মনকে উন্মুক্ত করিয়া তাহার গতিপথের সমস্ত বাধাবিঘ্ন অপসারিত করা এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে সংস্কৃত ও মার্জ্জিত করিয়া বিশ্বরহস্য উপলব্ধি করিবার জন্য শক্তিশালী করিয়া তোলা। সাহিত্য চর্চায় মন ক্রমশঃ বিকশিত হইয়া তাহার বিচিত্র প্রবৃত্তির উপর সংযম লাভ করিয়া অভিনিবেশ, উদারতা, কার্য্যতৎপরতা, বিচারবুদ্ধি ও ভাব-প্রকাশের ক্ষমতায় সমৃদ্ধ হইয়া উঠে। ইহাতে চরিত্রের দৃঢ়তা বৃদ্ধি পায় এবং অভিজ্ঞতার সীমা প্রশস্ত হইতে থাকে।

ভাব প্রকাশ করিবার জন্য ভাষার প্রয়োজন। একথা অস্বীকার করা যায় না যে, যে ভাবসম্পদে অন্তরাত্মার চেতনা প্রকাশ পায় এবং যে ভাবের ভিতর প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠে তাহা আমাদের প্রকৃতি সুলভ ভাষায় ব্যক্ত করা প্রয়োজন। সেই

www.pathagar.com

সুপ্রকাশিত ভাবই প্রকৃত সাহিত্যের মূল উপাদান। যে ভাষা আমরা মাতৃস্তন্য পান করিতে করিতে শুনি ও আবৃত্তি করি সে ভাষার চেয়ে এমন কোন ভাষা আছে যাহাকে আমরা আমাদের প্রকৃতিগত বলিয়া মনে করিতে পারি? আমরা বাঙালী। আমাদের মাতৃভাষা বাংলা ভিন্ন আর কি হইতে পারে? সুতরাং আমাদের শিক্ষার বাহন এবং আমাদের সাহিত্যের ভাষা যে বাংলাভাষা হইবে সে সম্বন্ধে আর কোন তর্কই চলিতে পারে না। আমি জানি কেহ কেহ বাঙালী মুসলমানের শিক্ষার বাহন উর্দ্দু হওয়া উচিত মনে করিয়া খুব আন্দোলন করিয়া থাকেন কিন্তু সে আন্দোলন ব্যর্থ হইবেই হইবে। কেননা উহা আমাদের প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। মুসলিম সাহিত্যের জন্য আমরা বাংলাভাষাই অবলম্বন করিব। উর্দ্দু ও বাংলার মধ্যে আর কোন মধ্যপন্থা নাই। অবশ্য একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, ইসলামের ভাব-সমৃদ্ধিতে বাংলাভাষা ক্রমশঃ অধিকতর সমৃদ্ধ হইয়া উঠিবে এবং তজ্জন্য অনেক উর্দ্দু, আরবী ও ফারসী শব্দ ব্যবহার করিয়া বাংলা ভাষার অঙ্গ পুষ্ট করিতে হইবে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থাবলী হইতেও এ কথার প্রমাণ পাওয়া যায়।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যসেবী কবি ও লেখকের মধ্যে যাহারা এই পথ অবলম্বন করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে পরলোকগত কবি সত্যেন্দ্রনাথ, কালিদাস রায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিক মহাশয়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অমর কবি সত্যেন্দ্রনাথ বহু আরবী ছন্দে বিশেষ কৃতিত্বের সহিত কবিতা লিখিয়া বাংলা সাহিত্যের যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়া গিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, বাবু শচীন্দ্রলাল দাস বর্ম্মণের লেখা হইতে কয়েকটি লাইন উদ্ধৃত করিতেছি, তাহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে, কেমন সুন্দরভাবে আরবী ফারসী শব্দ বাংলা শব্দের সহিত মিল খায়। লাইন কয়টি এই :

"কানে কানে গেয়ে গান ইরাণের বুল্‌বুল্‌
সারাটী পরাণ মোর করে গেছে মশ্‌গুল
কি চাহনি বাণ হানে আঁখি পরি সুর্ম্মা
যুগ ভাবি নাহি যদি দেখি এক লহ্‌মা।"

এই আরবী ফারসী শব্দগুলির ঝঙ্কার কেমন মধুর ! আর একটা দৃষ্টান্ত দেখুন।

'আঁখিতে সুর্ম্মারেখা অধরে তাম্বুল,
হেলায় রঞ্জিত তব নখাগ্র রাতুল,
জরিতে জড়িত বেণী রুমালে তাম্বুল
বাদশার ছিলে তুমি খেলার পুতুল।"

এই বাংলা ও ফারসী শব্দের চমৎকার সংমিশ্রণে সেই অতীত মোগল বাদশাহ্‌র হেরেমের বিলাসিতা, সৌন্দর্য্যচর্চ্চা ও জাঁকজমকের চিত্র কেমন জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে।

শক্তিশালী মুস্‌লিম সাহিত্যিকের আবির্ভাবে অচিরেই বাংলা ভাষা ইসলামের ভাবসম্পদে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিবে। আমাদের তরুণ কবি নজরুল ইসলাম সে কাজ বেশ কৃতিত্বের সহিত করিতেছেন। তাঁহারই আদর্শে আমাদের তরুণ সাহিত্যিকগণ আমার এই আশা ফলবতী করিয়া তুলিবেন সন্দেহ নাই। মুসলিম সাহিত্যিকের রচনা-সম্পদে বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধ হইলে হিন্দু ও মুসলিম কালচারের একটি মনোরম সমন্বয় ঘটিবে এবং সেই সমন্বয়েই হিন্দু মুসলিম মিলন-সমস্যার সমাধান হইবে।

www.pathagar.com

এতক্ষণ সাহিত্যের সার্থকতা ও উপকারিতা সম্বন্ধে বলা হইতেছিল। কিন্তু আফসোস! আমাদের সাহিত্যচর্চ্চার ক্ষেত্র কোথায়? আমাদের সমাজের অতি অল্প লোকই সাহিত্য বুঝিবার উপযোগী শিক্ষা লাভ করিয়াছে। কি দারুণ লজ্জার কথা! আমাদের সম্মুখে বিশাল ক্ষেত্র পড়িয়া আছে কিন্তু তাহা এখনও আগাছায় পরিপূর্ণ। সকলে মিলিত হইয়া আগাছা তুলিয়া ফেলিয়া অক্লান্ত পরিশ্রম সহকারে ঐ ক্ষেত্র চাষ করিতে হইবে তবেই তাহাতে ফলপ্রসূ বৃক্ষ রোপণ করা সম্ভবপর হইবে। এজন্য চাই সর্ব্বাগ্রে আমাদের বালক বালিকাগণকে সমভাবে সর্ব্বতোমুখী শিক্ষার সুযোগ সরবরাহ করিয়া দিয়া শিক্ষিত করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা। জীবনের পূর্ণতা সাধনের জন্য শিক্ষাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপকরণ। শিক্ষাই ইহলোক ও পরলোকের মঙ্গল ও কল্যাণপথ উন্মুক্ত করে। আমাদের ধর্ম্মগুরু হজরত মুহম্মদ শিক্ষাকেই মানবজীবনের একমাত্র ভূষণ বলিয়া উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছিলেন। তিনি নরনারী উভয়ের জন্যই শিক্ষা বাধ্যতামূলক করিয়াছিলেন। কোরাণ তাহার সাক্ষ্য দেয় :

তলাবুল ইল্‌মি কারীদ্বাতুন আলা কুল্লি মুসলিমিন ওয়া মুসলিমাতুন।[৪]

প্রকৃতপক্ষে যে ব্যক্তি শিক্ষিত নয় তাহার জন্মলাভ হইয়াছে বলা যায় না। দেখিবার, শুনিবার এবং অনুভব করিবার শক্তি তাহার একরকম নাই বলিলেও চলে। সে কেবল পশুর মত খাইতে এবং নিদ্রা যাইতে পারে।

এ সম্বন্ধে আমাদের কর্ত্তব্য স্পষ্ট। প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করিবার জন্য সরকার বাহাদুর একটী বিল প্রস্তাব করিয়াছেন। ইহাতে আমাদের সমাজ বিশেষ উপকৃত হইবে। সুতরাং এই বিলের ব্যবস্থা অনুসারে যদি কোন শিক্ষা-কর আমাদের উপর ধার্য্য হয় তাহাতে আমাদের একটুকু আপত্তি করা উচিত হইবে না।

এই সম্পর্কে আমি নারী-শিক্ষার উপর বিশেষ জোর দিতে চাই। নারী শিক্ষিত না হইলে নর পঙ্গু থাকিয়া যায়। আমাদেরও হইয়াছে তাহাই। আমরা পঙ্গু। আমাদের ধর্ম্মগুরু যদিও নরনারীকে সমভাবে শিক্ষিত করিবার আদেশ জারী করিয়া গিয়াছেন তবু আমাদের সংকীর্ণচিত্ত মৌলবী মৌলানা সাহেবগণ নারী-শিক্ষাকে একেবারে বর্জ্জন করিয়াছেন। ফলে, আজ আমাদের নারীমাত্রই অশিক্ষিতা থাকায় আমাদের জাতীয় জীবন অবনতির অভিশাপে অভিশপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। যুগে যুগে দেশে দেশে যে সমস্ত মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে তাঁহাদের জীবনে তাঁহাদের জননীদের প্রভাব কত সুফল প্রসব করিয়াছে তাহা আপনারা অবগত আছেন। আধুনিক জগতের বীর্য্যবান্ উন্নতশির জাতিসমূহ এমনকি তুরস্ক, মিসর, সিরিয়া ও প্যালেষ্টাইনের মুস্‌লিম ভ্রাতৃবৃন্দ আজ নারী শিক্ষার আবশ্যকতা অনুভব করিয়া স্কুল কলেজের দ্বার নারীর জন্য উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। গভীর পরিতাপের বিষয়, মুসলিম ভারতই এ বিষয়ে সাংঘাতিকরূপে পশ্চাৎপদ। আমাদের হিন্দু ভ্রাতৃগণও নারী শিক্ষার আবশ্যকতা প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়া তাহার প্রসারের জন্য প্রাণপণ করিতেছেন।

বন্ধুগণ, আপনাদের অনুমতি হইলে, আমার প্রাচ্য ভ্রমণ বৃত্তান্ত হইতে তুরস্ক, মিসর, সিরিয়া ও প্যালেস্টাইনে নারী শিক্ষার যে আন্দোলন শুরু হইয়াছে তৎসম্বন্ধে সামান্য একটু ইঙ্গিত করিতে ইচ্ছা করি। মিসরের কথাই বলি। সেখানে সংপ্রতি বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এক বৎসরের মধ্যে ১৩৭০টি বাধ্যতামূলক ফ্রি স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শিক্ষা মন্ত্রী এজন্য বিশেষ পরিশ্রম করিতেছেন। এই চেষ্টার তুলনায় আমাদের চেষ্টা কিছুই

www.pathagar.com

নয়। কত-দিন ধরিয়া শিক্ষা বিলটী কাউন্সিলে পেশ আছে কিন্তু তাহার কোন মীমাংসাই এখনও হয় নাই,—কাজ আরম্ভ করা ত দূরের কথা। দেশের লোকও শিক্ষা সংস্কারের প্রতি একেবারে উদাসীন।

মিসরে অবৈতনিক বাধ্যতামূলক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে নারী শিক্ষা দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। অচিরেই শিক্ষাক্ষেত্রে বালিকাগণ বালকগণের সমকক্ষ হইয়া উঠিবে। উচ্চ শিক্ষা ক্ষেত্রেও নারীর অবাধ প্রবেশ। তাহারা সেখানে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। শিক্ষা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে তথাকার নারী সম্প্রদায় পর্দ্দা ত্যাগ করিতেছে। অতি সম্ভ্রান্ত বনিয়াদী পরিবারেও পর্দ্দা শিথিল হইয়াছে। পর্দ্দার সঙ্গে ফেজের বিরুদ্ধেও একটি আন্দোলন শুরু হইয়াছে। উদার শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে মিসরে অন্ন সমস্যা ও বেকার সমস্যা দূর করিবার জন্য নানাপ্রকার শিল্প বাণিজ্য শিক্ষার বহু অনুষ্ঠান প্রতিদিন বৃদ্ধি পাইতেছে। এমন কি মক্তবের ধর্ম্ম শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে পার্থিব কল্যাণ অর্জ্জনের শক্তি সৃষ্টি করিবার জন্য আধুনিক বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কিন্তু একটী বিষয় আমি একটু পরিতাপের সহিত লক্ষ্য করিয়াছি। আধুনিক মিসরীয় ছাত্রছাত্রী ধর্ম্মানুষ্ঠান পালনে উদাসীন হইয়া পড়িতেছে। তাহারা ইউরোপীয় আদব কায়দা, জীবনাযোজন, পোষাক পরিচ্ছদ অবলম্বন করিয়া নমাজ সম্বন্ধে কোরাণের বিধি নিষেধ পালনে অবহেলা করিতেছে। বাহ্যিক আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপ ও অঙ্গভঙ্গী তাহাদের নিকট রুচি-বিরুদ্ধ এবং অসুবিধাজনক বোধ হইতেছে। তাহারা এই বাহ্যিক প্রক্রিয়ার উপর আদৌ জোর দিতে চাহিতেছে না। আমি একটি সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলাম, "শিক্ষা হইতে ধর্ম্মকে বিচ্ছিন্ন করা উচিত নয়, কারণ ধর্মের উপরই চরিত্রের প্রকৃত ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।" তাহাদের সঙ্গে মেলামেশা করিবার যথেষ্ট সুযোগ আমার ঘটিয়াছিল। সেই সময়ে তাহারা অকপটে তাহাদের মনের কথা যে ভাবে প্রকাশ করিয়াছিল তাহাতে আমার মনে হইয়াছিল বস্তুতঃ তাহারা ধর্ম্মপ্রাণ কিন্তু বাহ্যিক আনুষ্ঠানিক আচারের চাপে তাহাদের ধর্ম্মভাব বিনষ্ট হইতেছে। সুতরাং এক্ষেত্রে তাহারা বলে, অবিলম্বে আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়াগুলির সরলতা সম্পাদন করাই এমন কি সম্ভব হইলে সেগুলি ত্যাগ করাই বাঞ্ছনীয় ; কেননা বিচার বিমুখ আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়ার অনাবশ্যক কড়াকড়িতে তাহারা মনে করে তাহাদের আত্মা মৃতপ্রায় হইয়াছে। এটা ভাবিবার কথা বটে।

এই একটী দৃষ্টান্ত হইতে আপনারা বুঝিতে পারিবেন আধুনিক জগৎ এবং আমাদের অন্যান্য দেশের মুস্‌লিম ভ্রাতৃবৃন্দ কত দ্রুত শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রসর হইতেছে। কিন্তু এখন আমাদের উপায় কি?

আপনারা নারায়ণগঞ্জের ইসলামিয়া Education Trust-এর কথা শুনিয়া থাকিবেন। বালক-বালিকাকে সমভাবে শিক্ষিত করিয়া তোলাই এই Trust-এর উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য অনুসারে Trust পরিচালিত স্কুলগুলিতে ধর্ম্মনীতি-শিক্ষা ও শরীরচর্চা বাধ্যতামূলক করা হইয়াছে। এই Trust-এর আর এক উদ্দেশ্য শিল্পবাণিজ্য-শিক্ষা বিস্তার এবং ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করিয়া আমাদের সমাজের আর্থিক সমস্যার সমাধান করা। এই Trust-এর কার্য্যে আপনাদের সহানুভূতি ও সাহায্য নিতান্ত প্রয়োজন। সরকারের মুখপানে দেশের শিক্ষাবিস্তারের জন্য তাকাইয়া থাকিলে চলিবে না। আমাদের এক মুহূর্ত্ত সময় নষ্ট করিবার অবসর নাই। আমাদের সমবেত চেষ্টায় দেশের শিরায় শিরায় শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিতে হইবে। এই সমস্ত শিক্ষাকেন্দ্র হইতে যে সমস্ত শিক্ষিত ছাত্র ছাত্রী

www.pathagar.com

উত্তীর্ণ হইয়া আসিবে তাহারাই সাহিত্যকে জীবন্ত করিয়া তুলিবে। এই সদ্যপ্রতিষ্ঠিত Trust আন্দোলনকে উপযুক্ত যুক্তি পরামর্শ ও আলোচনার সাহায্যে অন্যান্য বিরুদ্ধপন্থী প্রতিষ্ঠানের সংঘর্ষ হইতে রক্ষা করা এবং চিন্তাশীল সাহিত্য-স্রষ্টাগণকে উৎসাহিত করা একান্ত প্রয়োজন।

কিন্তু দুঃখের বিষয় এই সমস্ত শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিবার পথে সমাজের অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার পর্ব্বত প্রমাণ বাধার সৃষ্টি করিতেছে। ভারতে আমরা আচার ও প্রথার বন্ধনে আষ্টে পৃষ্ঠে বাঁধা আছি যদিও সে সমস্ত প্রথা বহুপূর্ব্বেই অর্থহীন হইয়া পড়িয়াছে। আজ সেই প্রথার খোসা আছে শাঁস নাই কিন্তু আমরা খোসাই পূজা করিতেছি। ইহার সঙ্গে আবার মোল্লাশ্রেণীর দৌরাত্ম আরও আমাদের কার্য্যের বিঘ্ন ঘটাইতেছে। মোল্লাগণ দুর্ভাগ্যক্রমে ইসলামের ঔদার্য্যগুণ হইতে একেবারে বঞ্চিত হইয়াছেন। এই সংকীর্ণচিত্ত মোল্লাপীড়িত অর্দ্ধশিক্ষিত বা শিক্ষিত গোঁড়া সম্প্রদায় এমন নিদারুণভাবে রক্ষণশীল যে, তাঁহারা বালিকাদের কথা ত দূরে থাকুক, বালকগণকেও আধুনিক শিক্ষাকেন্দ্রে প্রবেশ করিতে বাধা দেন। তাঁহারা মনে করেন এই সমস্ত কেন্দ্রে শিক্ষালাভ করিলে তাঁহাদের সন্তান-সন্ততি ধর্ম্মহীন হইয়া খোদাতালার পথ হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িবে। এই ভয়ে ভীত হইয়া তাঁহারা হাদিস ফিকাহ আরবী শিখাইয়া আখেরের নেকী হাসিল করিবার লোভে মক্তব মাদ্রাসার জন্য অতিশয় ব্যগ্র হইয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহারা একথা কিছুতেই বুঝিতে চাহেন না যে, এই সমস্ত মক্তব মাদ্রাসার সংখ্যাবৃদ্ধি করিয়া আধুনিক জগতের জ্ঞান বিজ্ঞান আয়ত্ত করিবার পথ তাঁহারা সাংঘাতিকভাবে রুদ্ধ করিয়া ফেলিতেছেন। বর্ত্তমান জগতের শিক্ষা বিস্তারের জন্য কত মনীষী নানা উপায় উদ্ভাবন করিয়া অতি নির্ব্বোধকেও অতিপ্রখর বুদ্ধিসম্পন্ন করিয়া তুলিতেছেন। আর আমরা আজ আমাদের চক্ষু মুদিত করিয়া জ্ঞানবিজ্ঞানের পথ হইতে সরিয়া দাঁড়াইতেছি। ইহা অপেক্ষা আত্মঘাতী আর কি হইতে পারে? যে সমস্ত প্রাচীন প্রাণহীন আচার ও অন্ধ-সংস্কার আমাদের শিক্ষা তথা সাহিত্য-প্রসারের পথ রুদ্ধ করিতেছে তন্মধ্যে আমাদের পর্দ্দাই সর্ব্বাপেক্ষা মারাত্মক। বলাবাহুল্য, আমাদের ধর্ম্মগুরুর জীবদ্দশায় পর্দাপ্রথার এত কড়াকড়ি আদৌ ছিল না। উম্মীয় ও আব্বাসীয় খলিফাদের আমলে মহিলাগণ নিঃসঙ্কোচে বাহিরে চলাফেরা করিতেন—এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ে যাইয়াও জনসাধারণের মজলিসে মুক্তকণ্ঠে বক্তৃতা দিতেন। মুসলিম বিজেতাগণ যখন পারস্য ও বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের সংস্পর্শে আসিলেন তখনই তাঁহারা নারীর মর্য্যাদা ও মূল্য ক্ষুণ্ন করিতে আরম্ভ করিলেন। সেইদিন হইতে মুসলিম পতনের যুগ শুরু হইয়াছে। সুখের বিষয়, আধুনিক মিসর, তুরস্ক, সিরিয়া ও প্যালেস্টাইনের মুসলিম ভ্রাতৃবৃন্দ দ্রুত পর্দা প্রথা ত্যাগ করিতেছেন। তুরস্ক ত সর্ব্বত্র স্বচ্ছন্দগতিতে আপনার ব্যক্তিত্বের উপলব্ধি করিতেছেন।

বন্ধুগণ, আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারি পর্দাপ্রথা বর্জন করিয়া তুরস্ক অশেষ কল্যাণের পথ মুক্ত করিয়াছে। আজ তূর্কীনারী তাই তুরস্কের যাবতীয় জাতীয় আন্দোলনে পুরুষের সমকক্ষ হইয়া তাঁহার শক্তিপ্রয়োগ করিতেছেন। ব্যবসায় বাণিজ্য, অফিস, আদালত, স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটি সর্ব্বত্রই তূর্কীনারীর অবাধ গতি। অহো! খোদাতায়ালার যদি এমনি মরজি হইত যে, আমরা এক কলমের খোঁচায় পর্দাপ্রথা উঠাইয়া দিতে পারিতাম তাহা হইলে কি কল্যাণই না হইত! তাই বলি, আপনারা যদি প্রাণে প্রাণে অনুভব করেন যে, পর্দাপ্রথা আমাদের প্রাণশক্তি খর্ব্ব করিতেছে, তবে আপনারা সত্যকার

www.pathagar.com

দেশপ্রেমিক ও সমাজ হিতৈষীর মত এই সর্ব্বনাশী পর্দাপ্রথা একেবারে তুলিয়া দেওয়ার জন্য প্রাণপণ করুন।

আমাদের অবনতির অন্যতম বিশিষ্ট কারণ সঙ্গীতচর্চায় গোনাহ্‌র ভয়। সঙ্গীত নিষেধ করা হইয়াছে হজরতের দোহাই দিয়া। কিন্তু হজরতের জীবন আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় তিনি কখনও সঙ্গীত নিষেধ করেন নাই, বরং নিজে সঙ্গীত শুনিতেন এবং তাঁহার প্রিয়তমা পত্নী হজরত বিবি আয়েশা সিদ্দীকাকে শুনাইতেন। মানবজীবনের উপর সঙ্গীতের প্রভাব কত বড় সে সম্বন্ধে কোন কথা বলা বাহুল্য। এই বলিলে বোধহয় যথেষ্ট হইবে যে, আধুনিক চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই বলেন শরীরের পুষ্টিসাধনের জন্য আলোক ও বায়ুর যেমন প্রয়োজন আত্মার মুক্তি ও স্ফূর্ত্তির জন্য সঙ্গীতের তেমনি প্রয়োজন। যে শিক্ষাব্যবস্থায় বালক-বালিকাগণের হৃদয়-পুষ্প সৌরভময় করিয়া তুলিবার জন্য সঙ্গীত শিক্ষার স্থান নাই সে ব্যবস্থা আমার মতে অসম্পূর্ণ ও নিষ্ফল। সঙ্গীতের সঙ্গে ললিতকলা শিক্ষা দেওয়ারও ব্যবস্থা করা নিতান্ত আবশ্যক। তাহা না হইলে সুকুমারমতি শিশুদের চিত্তকোরক আদৌ বিকশিত হইতে পারে না। এস্থলেও মোল্লাসাহেবদের অন্ধ বিশ্বাস ও সংকীর্ণ-চিত্ততা আমাদের চিত্ত-বিকাশের পথে কন্টক স্বরূপ হইয়া আছে। তাহারা হজরত মুহম্মদের দোহাই দিয়া চিত্র-চর্চায় বিঘ্ন ঘটাইয়াছেন তাহাদের এই নিষেধ হাস্যকর বৈ আর কিছু নয়। আপনারা আপনাদের রুচি-জ্ঞানকে সাক্ষ্য করিয়া বলুন, রাফেল, ডা ভিনসি, মাইকেল এঞ্জেলো প্রমুখ বিশ্ব-বিখ্যাত চিত্রকরের চিত্র দর্শন করিয়া আপনাদের চিত্ত কি অপরূপভাবে ভরপুর হইয়া উঠে না? ইউরোপের যে কোন অঞ্চলের অতি নগণ্য যাদুঘরেও প্রবেশ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় তত্তৎঅঞ্চলের কবি, গায়ক ও চিত্রকরের অপরূপ সৃষ্টি প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ লোকের চিত্ত আনন্দসমৃদ্ধ করিতেছে। কিন্তু গভীর লজ্জার কথা যে, সংকীর্ণ চিত্ত মুসলিম ধর্ম্মপুরোহিতদের বাড়াবাড়ির ফলে বিগত কতিপয় শতাব্দীর মধ্যে শাস্ত্রপীড়িত মুসলিম-জগতে বিশ্বের দরবারে আসন লাভ করিতে পারে এমন নামজাদা গায়ক, চিত্রকর বা শিল্পী অতি অল্পসংখ্যকই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে, মধ্যযুগের অবসান হইতে আধুনিককাল পর্যন্ত মুসলিম জগৎ বিশ্বের জ্ঞান ভাণ্ডারে তেমন কোন মৌলিক সৃষ্টি দান করিতে পারে নাই। মৌলিক সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা তাহাদের যেন বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। এইক্ষণ মুসলিম ভারত, তুরস্ক, মিসরের ন্যায় অকুতোভয়ে সঙ্গীত, ললিতকলা কাব্যচর্চায় মনোনিবেশ করিলেই তাহার মুক্তি তথা পূর্ণকল্যাণ ও মঙ্গলের ধারা দ্রুত প্রবাহিত হইতে থাকিবে। তখনই ভারতীয় মুসলমান শক্তিমান্ হইয়া জীবনের পূর্ণ আস্বাদ লাভ করিয়া দীপ্ততেজে অগ্রগামী জাতির সহিত প্রতিযোগিতা করিতে সমর্থ হইবে।

আমি গোড়াতেই বলিয়াছি মৌলিকতাই সাহিত্যের প্রাণ ও সঞ্জীবনী শক্তি জোগায়। কিন্তু সকলেই মৌলিক সৃষ্টি করিতে সক্ষম নহে। কারণ সকলের মানসিক শক্তি একরূপ নহে। এজন্য আমি বলি, সাহিত্যসমাজের যে সমস্ত সভ্য মৌলিক সৃষ্টি করিতে অসমর্থ তাঁহাদের পক্ষে ভাল ভাল জ্ঞানসমৃদ্ধ গ্রন্থের অনুবাদে হাত দেওয়া কর্ত্তব্য। বিভিন্ন ভাষায় লিখিত গ্রন্থসমূহ বাংলাভাষায় অনুদিত হওয়া বিশেষ আবশ্যক। শুধু মুসলিম কালচারের পূর্ণ পরিচয় দেওয়ার জন্য আরবী, ফারসী ও উর্দ্দু ভাষায় লিখিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থগুলির অনুবাদ কার্যে আপাততঃ হাত দেওয়া যাইতে পারে। এই অনুবাদ সহজ সরল বাংলা ভাষায় মুদ্রিত করিয়া দরিদ্রতম ব্যক্তির কুটিরেও পৌঁছাইয়া দেওয়া চাই। তবেই বাংলাব্যাপী প্রচলিত অন্ধ-সংস্কার

www.pathagar.com

দূরীভূত হইবে। কোরাণের বাংলা অনুবাদ আরো সুন্দর করিয়া করা উচিত। কোরাণ ও অন্যান্য আরবী ফারসী গ্রন্থসমূহ বাংলা ভাষায় অনূদিত হইলে আমার বিশ্বাস অচিরেই মুস্‌লিম বাংলায় এমন এক নবযুগের সূচনা হইবে যেমন পঞ্চদশ শতাব্দীতে বাইবেল ইংরেজি ও অন্যান্য ইউরোপীয় ভাষায় অনূদিত হওয়ার পর এক নব মুক্তির যুগ আরব্ধ হইয়াছিল। এই সমস্ত অনূদিত গ্রন্থ প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে মুসলিম বাংলায় তথা মুসলিম ভারতে এমন এক নব সংস্কারের যুগ আসিবে যাহাতে অন্ধ সংস্কারের বন্ধন এবং নীতি ও ধর্মের সংকীর্ণ গণ্ডী ছিন্ন হইয়া যাইবে এবং ধর্মের এক নবজোশ ঔদার্য ও প্রেমের পরিচ্ছদে সুশোভিত হইয়া মানব সমাজের সর্ব্বপ্রকার স্বাতন্ত্র্য ও ক্ষুদ্র স্বার্থান্ধতা দূরীভূত করিয়া বিশ্বকল্যাণ ও সত্যকার মঙ্গলকে সার্থক করিবে। আরবী ফারসী গ্রন্থ বাংলায় অনুবাদ করার সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক জগতের জ্ঞান বিজ্ঞান সংক্রান্ত যাবতীয় গ্রন্থ বাংলায় তর্জমা করিয়া ফেলা দরকার। মুস্‌লিম সাহিত্যসমাজের প্রতি এই অনুবাদ কার্যের জন্য আমার বিশেষ অনুরোধ।

অনুবাদের সঙ্গে সঙ্গে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। লাইব্রেরি জনসাধারণের জ্ঞানের পরিধি প্রশস্ত করিবার পক্ষে বিশেষ হিতকর। মুসলিম সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় এরূপ লাইব্রেরির বিশেষ প্রয়োজন ; কারণ মুস্‌লিম বাংলায় পুস্তক ক্রয় করিয়া জ্ঞান বৃদ্ধি করিবার মত ক্ষমতা কয়জনের আছে? লাইব্রেরি সেই ক্ষমতার অভাব দূরীভূত করে। লাইব্রেরির উপকারিতা সম্বন্ধে আমি বেশি কিছু বলিতে চাহি না। সে সম্বন্ধে আপনারা সকলেই অবগত আছেন। তবে এইটুকু বলিতে চাই যে, লাইব্রেরি শুধু নাটক উপন্যাস ও হাল্‌কা কবিতার পুস্তক লইয়াই হয় না। সেখানে সর্ব্বপ্রকার চিন্তাশীল লেখকদের পুস্তক থাকা চাই। আর বড় বড় লেখকদের পুস্তক ধারাবাহিকভাবে পাঠ করা উচিত। পাঠে সর্ব্বদাই একটি বিশিষ্ট নিয়ম অবলম্বন করা আবশ্যক ; কারণ পাঠে শৃঙ্খলা না থাকিলে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় না।

আপনারা জানেন বাঙালি মুসলমানের আর্থিক অবস্থা অতীব শোচনীয়। এই অবস্থা হইতে তাহাদের মুক্তি সাধনের জন্য কিছু করা দরকার। অধিকাংশই কৃষিজীবী ও শ্রমিক শ্রেণীর লোক। তাহাদের মধ্যে সাহিত্যিক রুচি সৃষ্টি করা বিশেষ কষ্টকর। মানুষ মাত্রই রুটির জন্য ব্যগ্র। রুটি সমস্যার সমাধান না হইলে সাহিত্য-সমস্যার সমাধান অসম্ভব। সুতরাং সর্ব্বপ্রথম অর্থকরী শিক্ষার ব্যবস্থা করা নিতান্ত প্রয়োজন। অধিকাংশই রুটির জন্য বাঁচিতে চায়। আমরা আমাদের মুনাজাতে আগে দুনিয়ার খায়ের চাহিয়া পরে আখেরাতের খায়ের চাহি। এজন্য অর্থকরী শিক্ষার বিস্তার যত দ্রুত হয় ততই দেশের ও আমাদের দুঃস্থ সমাজের পক্ষে কল্যাণকর। যে শিক্ষা আমাদের রুটি অর্জনে বিশেষ হিতকর আজ আমাদের সেই শিক্ষা চাই। কিরূপে শ্রমিক কার্যদক্ষ হয়—কিরূপে অল্প পরিশ্রমে অধিক উৎপাদন করিতে পারা যায়—কিসে জমির উর্ব্বরাশক্তি বৃদ্ধি পায় ইত্যাদি বিষয় অবলম্বনে বিস্তর পুস্তক সঙ্কলন করিয়া জনসাধারণের জ্ঞান বৃদ্ধি করিতে বদ্ধপরিকর হওয়া কর্ত্তব্য। এ কার্যেও সাহিত্য সমাজের হাত দেওয়া উচিত। দেশের ও সমাজের আর্থিক, সামাজিক, নৈতিক, বৈজ্ঞানিক ও শিল্প বাণিজ্য সম্পর্কিত বিবিধ সমস্যার প্রতি এই সাহিত্য সমাজের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া উচিত। ইহার কার্য সর্ব্বতোমুখী না হইলে ইহার উদ্দেশ্য সার্থক ও সফল হইবে না। আশা করি সাহিত্যসমাজ দেশের বিভিন্ন রুচির অনুকূল বিবিধ সমস্যার সমাধান কল্পে ইহার শক্তি নিয়োজিত করিয়া সমাজের উন্নতি পূর্ণাঙ্গ করিতে চেষ্টা করিবেন।

www.pathagar.com

এইক্ষণ আমার এই মামুলী কথাগুলি শুনিয়া আপনারা যে ধৈর্য ও ঔদার্যের পরিচয় দিয়াছেন তজ্জন্য আমি আপনাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। আমি জানি আমার এই বক্তৃতায় কোন মৌলিকতা নাই। কেবল আমি আমাদের দেশের বিশেষতঃ মুসলিম সমাজের অত্যাবশ্যকীয় সমস্যাগুলির প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি মাত্র। চতুর্দিক নৈরাশ্যের অন্ধকার ঘনীভূত হইয়া উঠিতেছে—সমাজের অধিকাংশই উদাসীন। তবু তাহারই মাঝে সাহিত্যসমাজের সারথিগণের দুঃসাহস দেখিলে প্রাণে আশার সঞ্চার হয়। তাঁহারা অদম্য উৎসাহে বাংলার পতিত মুস্লিম সমাজকে মুক্তির পথে আনিবার জন্য বড় কঠিন কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। খোদাতায়ালা তাঁহাদের এই মহৎকার্যে অধিকতর উৎসাহ ও সাহস প্রদান করুন মনে প্রাণে এই প্রার্থনা করি। যদি এই তরুণ স্বার্থত্যাগী সারথিগণ তাঁহাদের এই কঠিন ব্রতে আরও কিছুদিন ধরিয়া টিকিয়া থাকিতে পারেন তবে আমি নির্ভয়ে বলিতে পারি তাঁহারা অদূর ভবিষ্যতে আমাদের এই অন্ধকারাচ্ছন্ন সমাজের জন্য এক অতি সুন্দর, সুখদায়ক ও উজ্জ্বল প্রভাতের আগমন অনিবার্য করিয়া তুলিবেন। তখন আমরা সকলে আধুনিক ভারতের গৌরব, কবি ইকবালের কণ্ঠে গাহিতে পারিব :

ইকবালকা তারানা বাঙ্গে দারা হেঁ গুয়া
হুতা ছেঁ জাদা পব্মা ফের কার রওয়া হামারা।[৫]

www.pathagar.com

চতুর্থ বার্ষিক অধিবেশনের অভ্যর্থনা-সভাপতির অভিভাষণ

ডক্টর সৈয়দ মোয়াজ্জম হোসেন

ভদ্র মহোদয়গণ,

আমি সাহিত্যিক নহি, সাহিত্যের আসরে আমার স্থান নাই, সাহিত্য-সাধনা করিবার সময় বা সুযোগ আমার হয় নাই। সাহিত্য-সম্মিলনীর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণে কিছুটা সাহিত্যের রঙ রস ও গন্ধ থাকা বাঞ্ছনীয়, অনেকেরই হয়ত সে ধারণা থাকিবে। কিন্তু আমি জানি অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হিসাবে আমার সাহিত্যিক কর্ত্তব্য কিছুই নাই। আপনাদিগকে এ সাহিত্যের মজলিসে সাদরে গ্রহণ করার ভার আমার উপর ন্যস্ত হইয়াছে। এ কাজের আমি কতটুকু উপযোগী সে সম্বন্ধে আমার নিজেরই ঘোর সন্দেহ আছে।

আমার বিলাত যাত্রার পূর্ব্বক্ষণে "মুসলিম সাহিত্য-সমাজে"র ভিত্তি পত্তন হয়। এর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তখনই খুব আশান্বিত হইয়াছিলাম। সুদীর্ঘ কাল পরে দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দেখি এ তরুণ সমাজ সময় ও যুগধর্ম্মের সঙ্গে তালে তালে পা ফেলিয়া বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে সংসারটা সেখানে ছিল আজ আর সেখানে নাই। চলার আনন্দে সব কিছু ছুটিয়া চলিয়াছে। মানুষের চিন্তারাজ্যেও বিপুল সচলতা ও তুমুল আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে। দেশ বিদেশে ঘুরিয়া যে সামান্য অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিতে পারিয়াছি তাহাতে আমার মনে হয় চিন্তার দৈন্যই মানুষের অতি ভীষণ, মারাত্মক দৈন্য। যাহাদের মন সজাগ বুদ্ধি-বৃত্তি যাহাদের তীক্ষ্ণ ও প্রখর, তাহারাই আজ সর্ব্ববিষয়ে নেতৃত্ব করিতেছে। তাহারাই বর্ত্তমান জগতে বর্দ্ধিষ্ণু, জীবন্ত, উন্নতিশীল ও সচল বলিয়া বিখ্যাত।

দেশ বিদেশের লোকের সঙ্গে মিশিয়া আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে সাহিত্যই জাতীয় জীবনের ভিত্তি. কোন জাতির শতধাবিচ্ছুরিত জীবন-স্পন্দন একমাত্র সাহিত্যের মধ্যেই ফুটিয়া উঠে। এ নিছক সত্য কথা, কেবল কথার কথা নয়। জীবনের স্ফূর্ত্তি যেখানে যত বেশি সাহিত্যের বিকাশও সেখানে তত সুস্পষ্ট। সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্ম্মনৈতিক ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে একটা জাতির ভাবধারা প্রবাহিত হয়। মানুষের জীবনের গণ্ডী যত প্রশস্ত সাহিত্যের ক্ষেত্র ও সেখানে তত বিস্তৃত। "Literature is the criticism of life"—এ অতি প্রয়োজনীয় কথা। পরিপুষ্ট, পূর্ণাঙ্গ জীবনের জ্বলন্ত ছবি সাহিত্যের মধ্যেই আমরা খুঁজিয়া পাই। জীবন যেখানে একঘেয়ে, নীরস, বৈচিত্র্যহীন ও অচঞ্চল সাহিত্যও সেখানে আড়ষ্ট ও মরণাপন্ন।

মুসলমান সমাজ শিক্ষা ও চিন্তার ক্ষেত্রে নিতান্ত পশ্চাৎপদ। বিদেশে ঘুরিয়া মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়াছি, ভারতীয় মুসলমানকে বিদেশিয়েরা মোটেই চিনে না। আমি যখন বলিয়াছি যে বাংলাদেশে শতকরা ৫৫ জন মুসলমান অধিবাসী তখন তাহারা আমাকে প্রশ্ন করিয়াছে, তবে রবীন্দ্রনাথের মত লোক কয়টি? ইহার কি উত্তর আছে? অন্যান্য জাতির সাধনা,

www.pathagar.com

সজীবতা, চিন্তাচর্চা ও সাহিত্যিক প্রচেষ্টার সঙ্গে যখন আমাদের সমাজের স্থবিরতা ও নিস্পন্দভাব তুলনা করি তখন মনে বড় দুঃখ হয়। মনে হয় আমরা কোথায় পড়িয়া আছি। কিন্তু পরক্ষণেই আবার দেখি আশার ক্ষীণালোক মিটি মিটি করিয়া জ্বলিতেছে। দেশ বিদেশের তরুণদের মত আমাদের তরুণেরাও বসিয়া নাই। এখানে সেখানে তাহারা আজ তাহাদের চিন্তা ও কর্ম্মের আসর খুলিয়াছে। তাহাদের আদর্শ ও কর্ম্মপদ্ধতি সম্বন্ধে হয়ত আমাদের প্রবীণেরা খুব আশান্বিত নহেন। আর এরূপ মতদ্বৈধ ও সংঘর্ষ থাকা খুবই বাঞ্ছনীয়, কারণ বৈষম্যই চিরকাল উন্নতির পরিপোষক। একথা ভুলিলে চলিবে না যে সমাজের বাস্তব মঙ্গলসাধনই উভয় দলের চরম ও পরম লক্ষ্য। প্রবীণের অভিজ্ঞতা, সুচিন্তা ও সাবধানতা আর তরুণের উদ্দামতা কর্ম্মকোলাহল ও ব্যস্ততা যদি পাশাপাশি কাজ করিতে পারে তবেই সমাজের দৈন্য ঘুচিবে।

'সাহিত্য সমাজ' একদল শক্তিশালী সাহিত্যিক ও চিন্তাশীল লেখক ইতিমধ্যেই গড়িয়া তুলিয়াছে। আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে এর কর্ম্ম ও সাধারণ ক্ষেত্র আরও বিস্তৃত এবং বহুধা বিভক্ত হইবে। অতীতের স্বপ্ন আমরা বহুদিন দেখিয়া আসিতেছি ; আজ আমাদিগকে ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখিতে হইবে। বর্ত্তমানকে ভিত্তি করিয়া আমাদের স্বপ্নসৌধ গড়িতে হইবে। তবেই আমাদের জয়যাত্রা সফল হইবে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি বলবার মত আমার কিছুই নাই। আপনাদিগকে আমি আমার সাদর সম্ভাষণ জানাইতেছি। যথোপযুক্তভাবে আপনাদিগকে অভ্যর্থিত করিবার মত আয়োজন আমাদের কিছুই নাই।

আমাদের আয়োজন অতি সামান্য। পরস্পরের চিন্তা ও ভাবের সঙ্গে সুপরিচিত হইবার জন্যই আজ আমরা এখানে সমবেত হইয়াছি। আমাদের সকলের সমবেত সহযোগিতা ও সহানুভূতি আমাদের এ প্রচেষ্টাকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তুলুক, ইহাই প্রার্থনা। সাহিত্যের পূত আবহাওয়ায় আসুন আজ আমরা ব্যক্তিগত হিংসা, দ্বেষ ও মতানৈক্য ভুলিয়া শুদ্ধ ও বুদ্ধ হই। আমিন।

www.pathagar.com

চতুর্থ বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতির অভিভাষণ

খান বাহাদুর নাসির উদ্দীন আহমদ

বন্ধুগণ,

আমার মত অযোগ্য ব্যক্তিকে সভাপতি নির্ব্বাচন করে আপনারা কম দুঃসাহসের পরিচয় দেন নি। আমার পক্ষেও এরূপ দায়িত্বপূর্ণ পদ গ্রহণ করা কম ধৃষ্টতার পরিচায়ক নয়। তবে আমার অজুহাত এই যে আমি সুহৃদ্‌বর ওদুদ সাহেবকে অনেক অনুরোধ করেছিলাম যে আমার মত সম্পূর্ণ অযোগ্য অক্ষম বৃদ্ধ ব্যক্তিকে আসরে নামিয়ে যেন সং না সাজান। কিন্তু তিনি কোন মতেই আমাকে রেহাই দিলেন না ; তাই আমাকে আপনাদের আদেশ শিরোধার্য্য কর্‌তে হয়েছে। উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীর মধ্যে যে কেহই যে এ কাজ আমার চেয়ে অধিকতর দক্ষতার সহিত সমাধা কর্‌তে পারতেন, তা' বলা বাহুল্য। আমার ভ্রমপ্রমাদ ত্রুটি বিচ্যুতি অনেকেই হ'বে, তবে আশা আছে আপনাদের উদারতা গুণে সে সব মার্জ্জনা করে নেবেন।

যদিও এ যাবৎ আমার সুযোগ ও সৌভাগ্য হয়নি আপনাদের সাহিত্য সমাজে যোগ দিতে, তবুও তিন বৎসরের "শিখা" আমি মনোযোগ সহকারে পাঠ করেছি ও তদ্বারা বিশেষ উপকৃত হয়েছি। মুসলমান সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান ইত্যাদি সম্বন্ধে এমন সুচিন্তিত ও সুলিখিত প্রবন্ধাবলী একত্রে কমই পাঠ করবার সুযোগ হয়েছে। আপনারা যে এরি মধ্যে আপনাদের মহৎ উদ্দেশ্যে এতদূর সফলতা লাভ কর্‌তে পেরেছেন তা' শ্লাঘনীয়। আপনাদের সাহিত্য-সমাজ স্বতঃই আমাকে মুসলমানদের গৌরবের যুগের "ইখ্‌ওয়ানুস্‌সফা" ভ্রাতৃমণ্ডলীর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। প্রার্থনা করি আপনাদের সাহিত্য-সমাজ সফল হোক্‌-সার্থক হোক্‌।

আপনাদের Motto টি—"জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি সেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব"—আমার বড়ই ভাল লেগেছে ; এ সুন্দর আদর্শ লক্ষ্য করে চল্‌লে সমাজের অশেষ উন্নতি হ'বে তা'তে সন্দেহ নেই। আজ এ motto মুসলমানদের নিকট কেমন কেমন ঠেকা বিচিত্র নয়, কিন্তু এই ছিল আদি মুসলমানদের motto। এই আদর্শ অনুসরণ করে চলে' মুসলমানেরা এক সময় পৃথিবীর মধ্যে সকলের চেয়ে শিক্ষিত উন্নত ও সভ্য জাতিতে গড়ে উঠেছিল। কোরাণে জ্ঞানের মহিমা বহুস্থানে কীর্ত্তিত হয়েছে। প্রথম Revelation সুরা "ইকরায়" লেখনীর প্রশংসা কীর্ত্তিত হয়েছে। 'আল্‌লাজি আল্লামা বিল কলমে আল্লামাল ইনসানা মালাম ইয়ালাম', এ ছাড়া অসংখ্য হাদিসে জ্ঞানান্বেষণকে মুসলমানদের অবশ্য কর্ত্তব্য বলে নির্দ্দেশ করা হয়েছে। যথা—

"জ্ঞান চর্চ্চা প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর পক্ষে ফরজ,"

"জ্ঞানের অন্বেষণে আবশ্যক হলে চীনেও যাও।"

"শিশুকাল হতে মৃত্যু পর্যন্ত জ্ঞান অন্বেষণ কর।"

"জ্ঞানের একটি বচন শত শত প্রার্থনার আবৃত্তির চেয়ে মহত্তর।"

www.pathagar.com

"জ্ঞানীর কলমের কালি শহিদের রক্তের চেয়েও পবিত্রতর"

"একটা বুদ্ধির কথা শিখা, ও অন্য একজন মুসলমানকে শিখান, এক বৎসরের এবাদতের চেয়েও মূল্যবান।"

"খোদা বুদ্ধির চেয়ে উৎকৃষ্টতর আর কিছু সৃষ্টি করেন নি।"

"যে জ্ঞানান্বেষণের জন্য গৃহ ত্যাগ করে সে খোদারই পথে চলে।"

"এক ঘণ্টা জ্ঞান-বিজ্ঞানের উপদেশ শ্রবণ করা, সহস্র শহিদের জানাজায় যোগ দেওয়া বা সহস্র রজনী দাঁড়িয়ে উপাসনা করার চেয়েও বেশী পুণ্যের।"

"জ্ঞানীকে যে সম্মান করে সে আমাকে সম্মান করে।"

"যে শিক্ষার জন্য জীবন দান করে সে অমর।"

বাস্তবিক অন্য কোনো ধর্ম্মপ্রচারকই জ্ঞানকে এত উচ্চ আসন দেন নি। এ ভাগ্যের এক ক্রুর পরিহাস যে তাঁরই অনুবর্ত্তিগণ আজ পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে অশিক্ষিত মূর্খ ও নির্ব্বোধ বলে নিন্দিত।

ইস্‌লামে Reason-কে কত বড় স্থান দেওয়া হয়েছে তা' বলে শেষ করা যায় না। কোরাণের বহু স্থানে Reason-এর প্রতি appeal করা হয়েছে। আমার মনে হয় দুর্দ্দমনীয় জ্ঞান-স্পৃহা ও ব্যাকুল সত্যানুসন্ধানই ইস্‌লামের এক প্রকাণ্ড বিশিষ্টতা। ইব্‌নে রোশ্‌দের জীবনী লেখক ফরাসি মনস্বী লিখেছেন—

"There is nothing to prevent our supposing that Ibn Roshed was a sincere believer in Islamism specially when we consider how little irrational the supernatural element in the essential dogmas of this religion is, and how closely this religion approaches purest Deism."

এই প্রসঙ্গে আমি ইস্‌লামের অন্যান্য দু'একটি বিশিষ্টতা সম্বন্ধে কিছু বলার লোভ সম্বরণ কর্‌তে পার্‌ছি না। ইস্‌লাম অত্যন্ত সরল ধর্ম্ম। এতে প্রাণহীন আচার অনুষ্ঠানের কোনো স্থান নেই। পৌরোহিত্য বা Priesthood ইস্‌লামে নেই। স্রষ্টা এবং সৃষ্টের মধ্যে কোনো তৃতীয় ব্যক্তিকে টেনে আনা হয় নি। জ্ঞান-শিক্ষা প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর জন্য ফরজ করার উদ্দেশ্য এই যে প্রত্যেকে নিজ নিজ ভাল মন্দ স্বাধীন ভাবে বিচার কর্‌তে শিখবে, এবং অন্যের মধ্যস্থতা ব্যতিরেকে নিজের আশা-আকাঙ্ক্ষা, দুঃখ-বেদনা খোদার নিকট নিবেদন কর্‌তে পারবে।

কোরানের উদারতা বা 'Catholicity' বিস্ময়কর। সত্যকে সর্ব্বত্রই সম্মান করা হয়েছে। কোরান ভিন্ন এমন উদারতাপূর্ণ পরমত সহিষ্ণুতা অন্য কোনো ধর্ম্মগ্রন্থে দেখা যায় না। "লা ইক্‌রা ফিদ্দিন অর্থাৎ ধর্ম্ম সম্বন্ধে কোনোই বল প্রয়োগ খাটিবে না। বিশেষ করে', "এমন কোনো জাতি নেই যা'দের মধ্যে কোনো Prophet-এর আবির্ভাব হয়নি"—এই উদার ঘোষণার দ্বারা কোরান সমস্ত সঙ্কীর্ণতাকে চূর্ণ করে দিয়েছে! কোরানের এই ঘোষণা-বাণী মানলে স্বতঃই কি একথা মনে হয় না যে ভারতের মত বিপুল মহাদেশে না জানি কত পয়গম্বরের আবির্ভাব হয়েছে! হিন্দুদের পর-ব্রহ্মে'র কল্পনা নিশ্চয়ই কোন পয়গম্বরের

www.pathagar.com

ইস্‌লাম সমস্ত মানবকে সমান চোখে দেখেছে। ধনী-নির্ধন, শ্বেত-পীতের ভিতর বিভিন্নতা করেনি। এর ছায়া-সুনিবিড় বুকে যে আশ্রয় মেগেছে তা'কে ফিরে যেতে হয় নি। ইস্‌লামে কোন "আশ্‌রাফ" "আত্‌রাফ" নেই। বাস্তবিকই Islamic brotherhood মিথ্যা কাহিনী নয়। যদি কোনো ধর্ম্ম সামাজিক জীবনে equality ও fraternity-র আদর্শ পৃথিবীতে প্রচার এবং শুধু প্রচার নয় কার্য্যে পরিণত করে থাকে—সে ইস্‌লাম। রাষ্ট্র-জীবনেও ইস্‌লামের Democracy এক বিস্ময়কর বস্তু। পাদ্রী J. R. Mott-ও তাই স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে "The most perfect form of Democracy has only been approached by Islam." "খোলাফায়ে রাশেদিন" কি পৃথিবীর ইতিহাসের এক গৌরবময় পৃষ্ঠা নয়?

ইস্‌লাম স্বাভাবিক ধর্ম্ম। এর কোরাণিক বিধানগুলি মানুষের প্রবৃত্তি ও তা'র অবস্থার চির-পরিবর্ত্তনশীলতার প্রতি লক্ষ্য রেখে প্রণয়ন করা হয়েছে। হজরত বলেছেন, "আমি মানুষ ব্যতীত আর কিছুই নই। যখন আমি তোমাদিগকে ধর্ম্ম সম্বন্ধে কোনো আদেশ দিই তা' গ্রহণ করবে, আর যখন সাংসারিক বিষয়ে কিছু বলি তখন মনে রাখবে আমিও মানুষ"; অন্যত্র দূর ভবিষ্যতের বিরাট আবর্ত্তন বিবর্ত্তন উপলব্ধি করেই যেন তিনি বলে গেছেন, "তোমরা এমন যুগে এসেছ যে তোমাদিগকে এখন যা বলা হচ্ছে তার এক দশমাংশ পরিত্যাগ করলেই তোমাদের ধ্বংস সুনিশ্চিত, কিন্তু এমন কালও আসবে যখন এখন যাহা বলা হচ্ছে তার এক দশমাংশ প্রতিপালন করলেই যে কেহ মোক্ষলাভ করতে পারবে।"

এই হাসিকান্নাভরা পৃথিবীতে সুখে-দুঃখে আন্দোলিত মানুষের জন্যেই ইস্‌লাম। ইস্‌লামের আদর্শ পূর্ণ মানুষ গড়ে তোলা। মানুষের কোনো বিশিষ্ট কামনা-বাসনা দমন করে তার Particular faculty-র development ইস্‌লাম চায়নি। সমগ্র মানুষটীকে তার সহস্র কার্য্যকারিতার ভিতর দেখতে চেয়েছে ইস্‌লাম। ইস্‌লামে তাই তথা-কথিত বৈরাগ্যের স্থান নেই।

"বৈরাগ্য সাধন মুক্তি সে আমার নয়/অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়/লভিব মুক্তির স্বাদ"—বিংশ-শতাব্দীর যে সত্যান্বেষী কবি এ বাণী ঘোষণা করেছেন তিনি আমাদের মনে হয় আরবের হজরত মোহাম্মদের দ্বারাই অনুপ্রাণিত হয়েছেন।

এই যে সুন্দর সুষ্ঠু ইস্‌লাম পৃথিবীতে যে কী কল্যাণ বহন করে এনেছিল এক সময়, সে কথা ইতিহাসের বিষয়; বিস্তারিতভাবে তা'র আলোচনা করবার দরকার নেই। এই বললেই চলবে যে মধ্যযুগে একমাত্র মুসলমানরাই পৃথিবীর সভ্যতা ও কালচার [Culture] কে জীবিত রেখেছিল এবং তা'দেরি সাহিত্য, কলা, দর্শন, বিজ্ঞানের চর্চ্চা ও আবিষ্কার ইউরোপে Renaissance-এর যুগ আনয়ন করেছিল। বাস্তবিক Reason-এর আলো সম্পাতে উজ্জ্বল করে ধরা, বুদ্ধির কুঞ্জি নিয়ে তার মর্ম্মকোষ থেকে নব নব আবিষ্কারের মণি আহরণ করাই ছিল তৎকালীন মুসলমানের আকুল স্পৃহা। Draper-এর মতে Essential characteristics of their (আরবদের) method were experiment and observation, এবং এর ফলে বিজ্ঞানের চর্চ্চায় তাঁরা কিরূপ অগ্রসর হয়েছিলেন তা' ভাবলে বিস্মিত হ'তে হয়। এমন সব আবিষ্কারও তাঁরা করেছিলেন যা' বর্ত্তমান জগতকেও নূতন বলে সময় সময় তাক লাগিয়ে দেয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে তৎকালীন আরবীয় স্কুল কলেজে Evolution-এর doctrine পর্য্যন্ত পড়ানো হ'ত যা' এ যুগের বিস্ময়কর আবিষ্কার বলে সাধারণের

www.pathagar.com

ধারণা। এই Evolution-এর Process আরবেরা অজৈব বা খনিজ দ্রব্যের মধ্যে পর্য্যন্ত দেখেছিলেন। বাস্তবিকই world culture-এ ইস্‌লামের যে কী অপূর্ব্ব দান তা' ভাবলে গর্ব্বানুভব না করে পারা যায় না। S. P. Scott বলছেন-- "Modern science unquestionably owes everything to Arab genius," এদিকে আল্‌বেরুনির 'ইন্ডিকা' পুস্তকের অনুবাদক Dr. Sachau বলছেন— "Were it not for Al-ashari and Al-ghezali the Arabs would have-been a nation of Galileos and Newtons."

কিন্তু বহুদিন মুসলমানেরা তাদের সভ্যতা বজায় রাখতে পারলো না। যে বুদ্ধিবৃত্তি বা Reason-এর পরিচালনা ও অদম্য জ্ঞানস্পৃহা তা'দের উন্নতির কারণ হয়েছিল তা' পরিত্যাগ করাই তাদের দুর্গতির কারণ হ'ল। ইল্‌ম ও ইমানের আদর্শ বিকৃত হয়ে গেল। শিয়া, সুন্নি, হাম্বলি, হানাফী প্রভৃতি বহু সংখ্যক দল ও মতবাদের সৃষ্টি হয়ে ইস্‌লাম শতধা বিছিন্ন হয়ে পড়ল। প্রত্যেক দল ভাব্‌তে সুরু কর্‌লে যে প্রকৃত ইমান বা ইস্‌লাম তাদেরি ; অন্য পক্ষে মোতাজিলা-বাদ তথা Rationalism বিলুপ্ত হয়ে গোঁড়ামি দেখা দিল। যে 'ইল্‌মকে' কেবল 'ইলমের' জন্যই আমল করা নারী-পুরুষের ফরজ করা হয়েছিল সেই ইল্‌মের অর্থ সঙ্কীর্ণ করে শুধু 'দিনীয়াত' আলোচনায় সীমাবদ্ধ করা হল। ফলে স্বাধীন চিন্তা হারিয়ে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে দর্শন-বিজ্ঞান শিল্প-কলার দিকে কিছু Contribute কর্‌তে না পারায় মুসলমানেরা সমস্ত বিষয়ে অন্যান্য জাতি হ'তে নিচে পড়ে গেল। জীবন্ত ইস্‌লামের পরিবর্ত্তে তাই আজ দেখতে পাই আচার-পদ্ধতি-র ইস্‌লামের কঙ্কাল, আর প্রাণবন্ত মুসলমানের স্থানে তাই আজ দৃষ্ট হয় সংস্কারাচ্ছন্ন Parrot মুসলমান বা মোল্লা, যার চিন্তার উৎস Rituals বা dogma-র পাথর চাপে নিরুদ্ধ হয়ে গেছে। একটু চিন্তা কর্‌লে দেখা যাবে এই যে পরবর্ত্তিযুগের Ritualistic ইস্‌লাম এ মানবের কোনো কল্যাণে আসেনি। পরন্তু মুসলমান জাতিগুলির মধ্যে এক অভিসম্পাতের মত কাজ করেছে।

কিন্তু যে জাতির ভিতর জীবনের ধারা একেবারে শুষ্ক হয়ে যায়নি তার মৃত্যু নেই। যে ধর্ম্মের ভিতর শাশ্বত সত্যের অচঞ্চল আলো ঘুমিয়ে আছে তা' আবার কোনো শুভ মুহূর্ত্তে প্রদীপ্ত হয়ে জ্বলে উঠবে। সাড়া পাওয়া যায় মুসলমানদের প্রাণ স্পন্দন যেন Stethoscope-এ ধরা পড়ে। ইউরোপ ও আমেরিকার সভ্যতার সংস্পর্শে এসে মুসলমানদের সুপ্ত চিন্তাশক্তি যেন ধাক্কা খেয়ে জেগে উঠছে। আবার "দেশ দেশ নন্দিত করে" ইস্‌লামের ভেরী যেন তাই মন্দ্রিত হয়ে উঠছে। ইস্‌লামের এই নবজাগরণ ইউরোপের Protestantism-এর সঙ্গে তুলিত হওয়ার যোগ্য।

বর্ত্তমান যুগ হয়েছে বুদ্ধির যুগ। এই Rationalistic world culture ও ইউরোপীয় জাতিগুলির intense nationalism-এর আদর্শের সংস্পর্শে এসে তুরস্ক, আরব, আফগানিস্থান, ইজিপ্ট প্রভৃতি মুসলিম দেশগুলির মধ্যে নব জাগরণের বান এসেছে। তুরস্কে পৌরহিত্য প্রথা বর্জ্জন ইস্‌লামের প্রকৃত আদর্শানুযায়ী-ই হয়েছে। খেলাফত খোলাফায়ে রাশেদিনের সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হয়েছিল। পরে স্বার্থান্বেষী লোকেরা পরবর্ত্তি যুগের এই অন্তঃসারশূন্য খেলাফতকে বাঁচিয়ে রেখেছিল ! এই bogus খেলাফত থাকায় মুসলমান জগতের ক্ষতিই হয়েছে উপকার হয় নি। Pan-Islamism-এর idea ও মুসলমান জগতের সত্যিকার কোনো উপকার কর্‌তে পারে নি, তুরস্ক এসব খেয়ালি পোলাওয়ের স্বপ্ন ত্যাগ করে খেলাফত, Pan Islamism প্রভৃতি বর্জ্জন করে ভালই করেছে। ভারতীয় অনেক

www.pathagar.com

মুসলমান 'তুরস্কে ইস্‌লাম আর State religion নয়' এই ঘোষণার জন্য মুস্তফা কামালের প্রতি দোষারোপ করে থাকেন। কিন্তু আমাদের মনে হয় এটা ভালই হয়েছে। যে State-এর অধীনে বহু ধর্ম্মাবলম্বী লোকের বাস তার কোনো বিশেষ ধর্ম্মমতকে favour করা সঙ্গত নয়। বিশ্বমানবতার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তুরস্ক এই পরিবর্ত্তন করতে সমর্থ হয়েছে এবং মনে হয় ভবিষ্যতে সমস্ত State এই তুরস্কের এই উদাহরণ অনুসৃত হ'বে। যদি British Government ঘোষণা করেন যে আজ হ'তে Christianity (Church of England) আর State religion নয় তা' হ'লে হিন্দু মুসলমান উভয়েই কি সন্তুষ্ট হয় না? এ খুবই আশার বিষয় যে সমস্ত মুসলিম দেশগুলি Time sprit কে অনুসরণ করে চলবার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠেছে। ভারতের মুসলমানদের মধ্যেও Rationalism-এর প্রসার লক্ষিত হয়। ভারতে এ আন্দোলন খুব ধীরে চল্‌ছে তথাপি মনে হয় এর উন্নতি অনিবার্য্য। স্বাধীন চিন্তার হাওয়া বাংলা দেশেও যে এসেছে তার পরিচয় এই ঢাকা মুসলিম সাহিত্য সমাজ হ'তেই পাওয়া যায়।

এখন বাঙ্গালী মুসলমানদের অবস্থা কিছু আলোচনা করে দেখা যাক। প্রথমেই চোখে পড়ে শারীরিক, মানসিক, আর্থিক, সামাজিক—এক কথায় এদের সর্ব্বাঙ্গীন দুর্দ্দশার ছবি। অথচ এদের দুর্দ্দশা বোঝাবার মত শক্তিও যেন এরা হারিয়ে ফেলেছে। ভারতের অন্যান্য প্রদেশের মুসলমানদের অবস্থা ভাল না হ'লেও এদের চেয়ে ভাল। বাঙ্গালী মুসলমানেরা একরূপ চাষী শ্রেণিতে পরিণত হয়েছে। শিক্ষিতের সংখ্যা এত কম যে তা' বলতেও লজ্জা হয়। এই শিক্ষা-হীনতার জন্য মোল্লা, মোক্তার, উকিল, জমিদার, তালুকদার, মহাজন প্রভৃতি এদের অহরহ শোষণ করতে পারছে এবং এই সমস্ত লোকের এক স্বার্থ হয়ে দাঁড়িয়েছে এদের মূর্খ রাখা। এই সব শোষকদের মধ্যে মোল্লারাই হয়েছে সব চেয়ে ভীষণ। এরা টাকাত নিচ্ছেই অধিকন্তু ভ্রান্ত আদেশ নির্দ্দেশের বেড়া জালে এদের ভবিষ্যত উন্নতির পথও বন্ধ করে দিচ্ছে।

তথাকথিত আলেমগণের শিক্ষার ফলে মুসলমানদের মধ্যে ভয়াবহরূপে এক পরকালের মোহ সৃষ্টি হয়েছে। এদের ধারণা হয়েছে এ পৃথিবী তাদের নয় ; যারা যত ইমানদার খোদাতালা পৃথিবীতে তা'দের তত রোগ শোক কষ্ট দিয়ে পরীক্ষা করেন, এবং যারা এখানে যত কষ্ট ভোগ করেন পর জগতে তারা বেশি সুখভোগ করবেন। এই পর-কালের মোহ, বাস্তবের প্রতি সেই নিদারুণ উদাসীনতার ফল (Lamentable lack of appreciation of stern realities of life) যা বর্ত্তমানে মুসলিম জগতকে ছেয়ে ফেলেছে। এরূপ শিক্ষা প্রকৃত ইস্‌লামের পরিপন্থী। এ পৃথিবীকে মুসলমানদের ভাল করে চিন্তে হ'বে। যে সব সুন্দর জিনিস পৃথিবীর দেবার আছে তা' খোদার দান বলে কৃতজ্ঞ মনে গ্রহণ করতে হ'বে এবং ইনছানের উপকারার্থে সেগুলি কাজে লাগাতে হ'বে। এই জগতই আমাদের একমাত্র ও প্রকৃত কর্ম্মক্ষেত্র একথা ভুল্‌লে চলবে না।

এদিকে অতীতের মোহ মুসলমান সমাজকে এক অভিশাপের মতো পেয়ে বসেছে। এ পৃথিবীতে আমরা আছি এটা যেমন সত্য, বর্ত্তমানে আমাদের কাজ কর্ত্তে হ'বে, এটাও তেমনি সত্য। অথচ আমরা আমাদের পূর্ব্বপুরুষের গৌরব-কাহিনী কীর্ত্তন করেই দিন কাটিয়ে দিচ্ছি। অতীতের গাথা আমাদের বুকে কেবলমাত্র আশার গীতি জাগিয়ে তোলে, বর্ত্তমানের পথে চলার যেন প্রেরণা যোগায়। Let us live in the present with an eye to the

www.pathagar.com

future. এই সম্পর্কে মুসলমানদের যে চেহারাটা মনে জাগে সেটা এই যে তারা যেন "না ঘাট্‌কা, না ঘর্‌কা।" শত শত বৎসর তারা এদেশে আছে অথচ তা'দের দৃষ্টি যেন আরবের খর্জুর বন ও পারস্যের দ্রাক্ষা কুঞ্জে নিবদ্ধ। ফলে ভারতীয় বলে নিজেদের ভাব্‌তে পাচ্ছে না অথচ আরবী পারসীকও হ'তে পারছে না। মাতৃভূমিকে স্বর্গাদপী গরিয়সী বলে তারা এখনও ভাব্‌তে শিখেনি। রাস্তা দিয়ে হিন্দু মুসলমান যুবকরা যখন চলে আমি অনেক সময় লক্ষ্য করেছি, হিন্দুদের চলাফেরা দেখে মনে হয় তারা যেন নিজের দেশের মাটির উপর দিয়ে চলেছে—দেশ যেন তাদেরই। আর মুসলমানেরা এমনভাবে চলে যেন তারা এখানকার মুসাফির। এ হতভাগ্য 'কত্তম' কি এখনও ভাব্‌বে না যে বাংলা যদি তার দেশ নয়—আরব পারস্য আফগানিস্থান যদি তার দেশ নয় [সে সব দেশ যে তার নয় তা'কি সেবারকার হিজরতের পরেও বুঝবে না?][১] তবে কি সে শূন্যে বাসা নির্ম্মাণ করবে?

দেশকে পর করে দিয়ে দেশের ভাষা মাতৃভাষাকেও মুসলমানেরা ঘৃণার চক্ষে দেখেছে। যদি মাতৃভাষার সঙ্গে বাঙ্গালী মুসলমানদের নিবিড় ভাবে পরিচয় থাকত, দেশপ্রেম বোধ হয় অন্তরে তার জাগরিত হত। কিন্তু বাংলাকে সে এতদিন উপেক্ষা করেছে ; তাই তার চিন্তাশক্তি প্রসার লাভ কর্‌তে পারেনি। হিন্দুস্থানের মুসলমানেরা যতটুকু উন্নতি কর্‌তে পেরেছে আমার মনে হয় তা' তাদের মাতৃভাষা উর্দ্দু চর্চ্চার ফলে। তাদের ভিতর বহু চিন্তাশীল লেখক, কবি, সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক, দার্শনিক, রাজনীতিবিদ জন্মগ্রহণ করেছেন কিন্তু বাঙ্গালী মুসলমানদের মধ্যে এরূপ কোন লোক জন্মেন নি বলা অন্যায় হ'বে না। বাঙ্গালী মুসলমানের মাতৃভাষাকে অবহেলা করার দুর্বুদ্ধি কেন হলো? অথচ পূর্ববর্ত্তিযুগের মুসলমানেরা বাংলা সাহিত্যের উন্নতি কল্পে কি করেছেন তা' বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ঐতিহাসিকগণের জানা আছে। দিগ্বিজয়ী মুসলমানেরা যখন পারস্য জয় করেন—তাঁরা পারস্য ভাষাকে আরবী অক্ষরে গ্রহণ করেন। ভারতে এসে তাঁরা হিন্দিকে গ্রহণ করে আরবী অক্ষরে লিখতে আরম্ভ করেন। এই ভাষাই উর্দ্দু নামে পরিচিত। বঙ্গদেশে এসে তাঁরা বাংলাকেও আরবী অক্ষরে লিখতে আরম্ভ করেন। এই চেষ্টা বিশেষভাবে চট্টগ্রামে শুরু হয়েছিল। অবশ্য এ চেষ্টা সফল হয়নি। রাজ-ভাষা উর্দ্দু-পার্সির প্রচলন ক্রমে অধিকতর হয়ে উঠ্‌ল। মুসলমানদের ভাষা সাহিত্যের সফলতার পরাকাষ্ঠা দেখা যায় পারস্য ভাষার ব্যবহারে। ফারসী ভাষার উন্নতি ভাষা সাহিত্যে অতুলনীয়। উর্দ্দুরও উত্তরোত্তর উন্নতি হচ্ছে কিন্তু বাংলার কিছু উন্নতি হয়ে উঠ্‌লনা। কারণ উচ্চ শ্রেণীর মুসলমানেরা বাংলা ভাষাকে বরাবরই তাচ্ছিল্যের চক্ষে দেখে আস্‌ছিলেন। কিন্তু আমাদের নিরক্ষর গ্রাম্য কবিরা যে সব সুন্দর কবিতা সঙ্গীত গাথা রচনা কর্‌তে পেরেছিলেন তা'র লালিত্য, মাধুর্য্য, কমনীয়তা অপূর্ব্ব। ময়মনসিংহ Ballads-এর মধ্যে মুসলমান কবিদের বহু রচনা আছে। সাহিত্য রসিকদের মতে পূর্ব্ববঙ্গের এই সব গীত ও গাথা অমূল্য বস্তু। যখন মিলা মিশায় হিন্দু মুসলমান পরস্পরের মধ্যে প্রীতি বন্ধনের সূত্রপাত হয়—একে অন্যের আচার পদ্ধতিগুলিকে সম্ভ্রমের চক্ষে দেখতে আরম্ভ করে—কখনও বা অনুকরণ কর্‌তে থাকে—তখনই পণ্ডিত ও মোল্লারা Religion in danger বলে চীৎকার করে উঠে, তখনই আবার Reaction আরম্ভ হয়। এই Reaction-এর ফলে আমাদের গ্রাম্য কবিদের কবিতার উৎস শুষ্ক হয়ে গিয়েছে। যদি হাফেজ প্রভৃতির কবিতার 'ময়' সাকি, ও 'ময়খানা' ইত্যাদি আধ্যাত্মিক অর্থে গৃহীত হ'তে পারে 'রাই' 'কানু' 'ত্রিবেণী', ইত্যাদির অর্থ আধ্যাত্মিক ভাবে নিলে কী যে অনর্থ সাধিত

www.pathagar.com

হয় বোঝা কঠিন। কত যে প্রতিভা এই Reaction-এর ফলে অকালে বিনষ্ট হচ্ছে তা' ভাবতেও কষ্ট হয়। যে গীত রচনা করতে পারে তাকে তা' করতে দেওয়া হ'বে না, যে গাইতে জানে তাকে গাইতে দেওয়া হ'বে না, যে চিত্র আঁকতে পারে তাকে চিত্র আঁকতে দেওয়া হ'বে না, যে অভিনয় করতে জানে তাকে সে শক্তির বিকাশ করতে দেওয়া হ'বে না—পদে পদে বাধা বিপত্তি। ফল এই হয়েছে, বঙ্গীয় মুসলমান সমাজে হাসি ও আনন্দ এক কথায় 'Joi deviver' নষ্ট হয়ে গিয়েছে। এই সব প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে সাহিত্য শিল্পের বিকাশ অসম্ভব। বাঙ্গালী মুসলমানের তাই সাহিত্য প্রভৃতি কিছুই নাই বল্‌লেই চলে। কলা, শিল্প, সাহিত্যের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য স্বাধীন চিন্তা Freedom of thought and experssion-এর একান্ত আবশ্যক।

এই মাতৃভাষা শিক্ষা দেওয়ার জন্য গ্রামে গ্রামে বাধ্যতামূলক বাংলা শিক্ষার ব্যবস্থা করা একান্ত দরকার। যে Primary Education বা প্রাথমিক শিক্ষার বিষয় আলোচনা চল্‌ছে তার প্রচলন যত শীঘ্র করা হয়, ততই মুসলমানদের মঙ্গল। Literacy-তে মুসলমানেরা depressed class-এর হিন্দুদের চাইতেও নিম্নে, ব্রাহ্মণ বৈদ্য ও কায়স্থের সঙ্গে তো তুলনা করা চলেই না, কেননা তা'দের স্ত্রী-পুরুষ ধরতে গেলে Cent percent-ই Iiterate. Literacy-র প্রসার না হ'লে সমাজের উন্নতি হ'বে না—সমাজের চিন্তা করবার শক্তি আস্‌বে না। অথচ সমাজের চিন্তা করবার শক্তি যে পর্যন্ত না আসে, বা বৃহৎ কল্পনা বা Idea তাকে অনুপ্রাণিত না করে সে পর্য্যন্ত এর উন্নতির কোনোই আশা নেই। সামাজিক বা জাতীয় জীবনে আর্থিক অভাব তত গুরুতর নয়, যত গুরুতর এই চিন্তা বা ভাবের দৈন্য। মাতৃভাষার ভিতর দিয়ে বর্ত্তমান জগতের ভাবধারার সাথে পরিচিত করে দিতে হ'বে আমাদের সমাজকে তা' হ'লেই আমাদের উন্নতির পথে অগ্রসর হওয়া সহজ হ'বে। জার্ম্মান কবি Goethe-র কথাটি যেন আমাদের মনে থাকে, "It is easy to act but difficult to think." বাস্তবিকই যে জাতি যে দিন থেকে চিন্তা করতে শিখেছে সেই দিন হ'তে তার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি দেখা দিয়েছে। জার্ম্মান জাতির ইতিহাস এ বিষয়ে খুব উপদেশপূর্ণ।

ধর্ম্মজ্ঞান সম্বন্ধে বলা চলে যে, যে পর্যন্ত না আমাদের ধর্ম্মগ্রন্থগুলি মাতৃভাষায় অনুদিত হয়, সে পর্য্যন্ত আশা করা বৃথা যে আমরা সত্যিকার ধার্ম্মিক হ'তে পারবো। Europe-এ Reformation এসেছিল Bible vernacular-এ তর্জ্জমা হওয়ার পরে। আজ বাংলা সাহিত্যকে হিন্দু সাহিত্য বলে আমরা আক্ষেপ করে থাকি, যদি উর্দ্দু ফারসীর মোহ ত্যাগ করে বাঙ্গালী মুসলমানেরা নিজদের মাতৃভাষা শিখবার চেষ্টা করতো তা' হ'লে তাদের এ আক্ষেপ করতে হতো না ; অথচ মাতৃভাষা শিক্ষা করা কী সহজ ! শুধু কয়েকটি অক্ষর পরিচয় হ'লেই একটা ভাষা শিখা যায়। ব্যাকরণের কোনো বালাই নেই। সামান্য অক্ষর পরিচয়ের সঙ্গেই একটি সাহিত্যের দ্বার উন্মুক্ত হয়ে যায়। আজ কাল বাংলা বইগুলিও এমন ভাষায় লেখা হচ্ছে, যে তা' বুঝতে কারও কষ্ট হয় না। Law of demand and supply অনুসারে একটি বিরাট মুসলিম সাহিত্যের অচিরেই সৃষ্টি হ'বে। অর্থনীতি, সমবায়, কৃষি, স্বাস্থ্যনীতি, পশুচিকিৎসা প্রভৃতি আবশ্যকীয় বিষয় সম্বন্ধে মুসলমানদের জানা একান্ত আবশ্যক। এসব বিষয়ে সহজে ভাষায় বই লিখতে হ'বে। তাহ'লে আমাদের কৃষকদের জীবন সুস্থ, সবল ও সুন্দর হয়ে উঠবে। আমাদের এ কথা মেনে নিতে হ'বে যে মাতৃভাষার মত এমন আবশ্যকীয় তথা পবিত্র ভাষা আর নেই।

www.pathagar.com

আরবী ফারসী উর্দ্দু বা মাদ্রাসা মক্তবের মোহে পড়ে মুসলমানদের যে কি অনিষ্ট সাধন হচ্ছে তা' বলে শেষ করা যায় না। এই শিক্ষাতে বুদ্ধি কোনরূপ প্রসার লাভ করতে পারে না। এতে অযথা সময় শক্তি ও অর্থের অপব্যয় হয়। Dr. Stoddard তাই এই শিক্ষা প্রণালী সম্বন্ধে যা বলেছেন তা' প্রণিধানযোগ্য—

"The traditional Education in the entire orient from Morocco to China was a mere memorising of sacred texts combined with exercises of religious devotion. The Mahomedan or Hindu student spent long years reciting to his master (a 'holy man') interminable passages from books which being written in classic Arabic or Sanskrit, were unintelligible to him, so that he usually did not understand a word of what he was saying. No more deadening system for the intellect could possibly have been devised. Every part of the brain except the memory, atrophied and the wonder is that any intellectual or original thinking ever appeared."

অনেক সময় আমাদের মাদ্রাসার ছাত্রদের অবস্থা, তাদের ভবিষ্যতের কথা সব ভেবে মনে কষ্ট হয়। দেখেছি গ্রীষ্মে শীতে বর্ষায় বড় বড় কেতাব নিয়ে এই সব ছেলেদের মাদ্রাসায় যেতে। মুখে তাদের ক্ষুধার চিহ্ন, গায়ে উপযুক্ত বস্ত্রের অভাব—জায়গীরে থেকে দশ বার বছর কত কষ্ট করে পড়ছে! অথচ তাদের ভবিষ্যৎ কি? স্মরণ আছে একবার কোন District board-র meeting-এ প্রস্তাব হয়েছিল যে New Scheme মাদ্রাসার Experiment-এর জন্য সাহায্য বন্ধ করে দিয়ে Old Scheme মাদ্রাসায় সাহায্য দেওয়া হোক, কারণ New scheme মাদ্রাসায় পড়া যুবকরা জানাজার নামাজ পড়াতে পারে না!! এতে মনে হয় যেন সমস্ত মুসলিম বঙ্গ মৃত বা মৃতপ্রায় হয়ে আছে, কেবল আমাদের মৌলবী মৌলানা সাহেবেরা দয়া করে জানাজা পড়ে কবরস্থ করলেই হয়। আজকাল মাদ্রাসার সংখ্যা খুব বেড়ে যাচ্ছে। এক গ্রামে একটা মাদ্রাসা হ'লে অন্য গ্রামের লোকেরা অন্য একটি না খুলতে পারলে তাদের মানের লাঘব হল বলে মনে করে। আমি দেখেছি গ্রামে গ্রামে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে আর District board-এর Free primary school ছাত্রাভাবে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

মাদ্রাসা শিক্ষা বহু কারণে আমাদিগকে ত্যাগ করতে হ'বে। এই গোটা System টিই বিজ্ঞানসঙ্গত নয়। Stoddard থেকে ইতোপূর্ব্বে যে Quotation দেওয়া গেছে তা' থেকেই বেশ বোঝা যায়। যদিও New scheme মাদ্রাসা Old scheme মাদ্রাসার তুলনায় মন্দের ভাল বলা যেতে পারে তবুও আমার বিশ্বাস পরিণামে এও মুসলমানদের জন্য অনিষ্টকর হ'বে। জীবন এক নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম। পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে হ'লে আমাদের সমস্ত শক্তিই নিয়োজিত করতে হ'বে এই জীবনসংগ্রামের জন্য। এখানে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, সমাজে সমাজে, জাতিতে জাতিতে অহর্নিশি জীবনমরণ সংগ্রাম চলছে, এই যুদ্ধে জয়ী হ'তে হ'লে অযথা শক্তির অপচয় করলে চলবে না। পারিপার্শ্বিক অবস্থার দিকে লক্ষ্য রেখে আমাদের শিক্ষাদীক্ষা জীবনচালন প্রণালী গঠন করতে হ'বে। মাদ্রাসা শিক্ষা এই জীবন যুদ্ধের জন্য আমাদিগকে কতটা উপযুক্ত করে গড়তে পারে তা' বিবেচনার বিষয়। এতে ইতিহাস ভূগোল অর্থনীতি প্রভৃতি modern subjects শিক্ষা দেওয়ার সুবিধা নেই অথচ এগুলি শিক্ষা না করলে বর্ত্তমান জগতে জীবিকা অর্জ্জনই কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। অন্য পক্ষে এখানে এমন কতকগুলি ভাষা ও বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয় যা বাঙ্গালীর জীবিকার্জ্জনের জন্য আদৌ আবশ্যকীয় নয়। এই মাদ্রাসা শিক্ষার প্রতি আমাদের মুসলমানদের অতিরিক্ত নজর থাকাতে শিক্ষা বিষয়ে তথা আর্থিক অবস্থা প্রভৃতি অন্যান্য বিষয়েও প্রতিবেশী হিন্দুদের চাইতে

www.pathagar.com

অনেক পিছনে পড়ে যাচ্ছি। তাই আমার বক্তব্য যে আরবী ফারসী শিক্ষার ব্যবস্থা Classics রূপে স্কুল কলেজ ও ইউনিভার্সিটিতে হওয়াই যথেষ্ট। মাদ্রাসা শিক্ষার আবশ্যকতা কি? যদি ধর্ম্মজ্ঞান বিস্তারের জন্য এর আবশ্যক হয়, সে উদ্দেশ্য তথাকথিত মাদ্রাসায় সাধিত হচ্ছে না, সে জন্য দরকার মাতৃভাষায় ধর্ম্মগ্রন্থগুলির অনুবাদ—কেননা একমাত্র তাতেই সর্ব্বসাধারণের পক্ষে ধর্ম্ম-শিক্ষা সম্ভবপর হ'বে। যদি Classics পড়ার জন্য এর আবশ্যক হয়—সে উদ্দেশ্য সাধিত হ'বে এগুলি বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে ইউনিভার্সিটিতে পড়ালে। বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে পড়া হয় বলে আজকাল আরবী ও সংস্কৃতের চর্চ্চা জার্ম্মানি ও ফ্রান্সে যেরূপ হয় আরব বা ভারতে সেরূপ হয় না।

State দেশের দশজনের জন্য তার অনুষ্ঠানগুলি ও সাধারণের উপকারের জন্যই। সেগুলি ভাল না হ'লে দেশের প্রয়োজনানুসারে তাদের সংশোধন করা যেতে পারে, কিন্তু সেগুলিকে boycott করে স্বতন্ত্র অনুষ্ঠানের প্রবর্ত্তন করতে যাওয়া মারাত্মক। গবর্ণমেন্ট প্রবর্ত্তিত ইউনিভার্সিটি যদি মুসলমানদের সমস্ত অভাব পূরণ করতে না পারে তাহ'লে ইউনিভার্সিটির আবশ্যকানুযায়ী সংস্কার করে নেওয়া দরকার, তা' থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া কিছুতেই সঙ্গত নয়।

আমাদের মেয়েদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাল্য-বিবাহ পর্দ্দা সম্বন্ধে ইতোপূর্ব্বেই অনেক আলোচনা হয়ে গেছে। নূতন করে এ বিষয়ে বল্‌বার কিছুই নেই; তবুও অতি সংক্ষেপে দু'চারটি কথা বলতে হচ্ছে। কেননা কিছু না বললে কেউবা মনে করেন বিষয়টিকে আমি ততটা গুরুতর বলে মনে করি না। ঠিক তার উল্টো—ভারতীয় মুসলমানের জন্য পর্দ্দা ও স্ত্রীশিক্ষা সমস্যা যেরূপ গুরুতর হয়ে উঠেছে এরূপ আর দ্বিতীয়টী নেই। একথা আজ সর্ব্ববাদীসম্মত যে শিক্ষা ব্যতীত জাতির উন্নতি অসম্ভব। অন্যপক্ষে পর্দ্দা উঠিয়ে না দিলে তাদের উপযুক্ত শিক্ষার ও স্বাস্থ্যের উন্নতির ব্যবস্থা করা অসম্ভব এটাও প্রমাণিত হয়েছে। এইসব খেয়াল করে উন্নততর মুসলিম দেশগুলি পর্দ্দা তুলে দিয়েছে, এবং মেয়েদের উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা করেছে। বাস্তবিকই মেয়েদের শিক্ষা না দিলে দেশের মঙ্গল কি করে সম্ভবপর হ'বে? মেয়েরা পঙ্গু হয়ে থাক্‌লে সমাজের এক অর্দ্ধেক যে কেবল পঙ্গু হয়ে রইল তা' নয়—বাকী অর্দ্ধেকও অকেজো হয়ে পড়ে। এ পর্য্যন্ত মেয়েদের আমাদের দেশে কেবল Child bearing machine করে রাখা হয়েছে। কিন্তু একটা machine-এর দ্বারাও ভালো কাজ পাবার জন্য তার যতটা যত্ন নেওয়া দরকার মেয়েদের প্রতি তাও আমরা নেইনি। সুন্দর স্বাস্থ্যবান সন্তান ধারণ করতে হ'লে মাকে স্বাস্থ্যবতী হ'তে হ'বে, কিন্তু কৈ, আমাদের মেয়েদের স্বাস্থ্য কোথায়? অস্বাস্থ্যকর গৃহে আজীবন বদ্ধ থাকার দরুণ তাদের মনও দিন দিন সঙ্কীর্ণ হয়ে যাচ্ছে—তাদের স্বাস্থ্যও তেমনি খারাপ হয়ে যাচ্ছে। Dr. Bentley প্রভৃতির Health report দেখ্‌লে জান্‌তে পারা যায় যে কী ভয়াবহরূপে মুসলমান মেয়েরা যক্ষ্মা রোগে মারা যাচ্ছে। এর একমাত্র কারণ খোলা হাওয়া ও আলোর অভাব—অর্থাৎ পর্দ্দা। এদিকে এই স্বাস্থ্যহীনা মেয়েরা যেসব সন্তান প্রসব করছেন তা'রা স্বভাবতই হীন স্বাস্থ্য নিয়ে এসে জাতিকে দুর্ব্বল করে ফেল্‌ছে। বাস্তবিক এই পর্দ্দা যে কী ঘৃণিত অনুষ্ঠান তা' ভাবতেই লজ্জা হয়। এটি নারীত্বের প্রতি এক নিদারুণ অপমান বা Standing insult স্বরূপ। এ সর্ব্বক্ষণই যেন মনে করিয়ে দিচ্ছে যে Sex-life ছাড়া অন্য কোনো জীবন মেয়েদের নেই। এই পর্দ্দা প্রথার ফলে আমার মনে হয় আমাদের মেয়েদের অতি অল্প বয়সেই Sex consciousness

www.pathagar.com

এসে পড়ে। এখনও এই সব কুৎসিত প্রথা বাঁচিয়ে রাখায় ভারতীয় মোস্‌লেম সমাজকে মধ্যযুগের যাদুঘর বা museum বলেই মনে হয়। যদি মানুষ হিসেবে মেয়েদের দাবীর কথা আলোচনা করা যায়—তা হ'লে বল্‌তে হয় পুরুষের কোন অধিকারই নেই মেয়েদের এরূপ আটকে রাখার। যদি ধর্ম্মের কথা বলা হয়—তা হ'লে দেখতে পাই ইস্‌লামে এমন কোন নির্দ্দেশ নেই যদ্বারা এই রূপ অবরোধ প্রথা সমর্থন করা চলে! যদি এর ভাল মন্দের আলোচনা করা হয় তা' হ'লে দেখতে পাই এর চাইতে অনিষ্টকর institution মানুষের কল্পনা কোথাও কোন দিন সৃষ্টি করে নি।

মেয়েদের শিক্ষার দরকার কেন? যদি মেয়েদের আর কিছুই না হ'তে হয়, তাদের গৃহিণী ও মাতা এ দুটিতো নিশ্চয়ই হ'তে হ'বে। শিক্ষার অভাবে তাঁরা বর্ত্তমান জগতের প্রয়োজনানুযায়ী সুগৃহিণী হ'তে পার্‌ছেন না। সুজননী ত নয়ই। শিক্ষা না পাওয়ায় তাদের মনের প্রশস্ততা জন্মাতে পারে না; এমনকি স্বাস্থ্য প্রভৃতি সম্বন্ধে সাধারণ যে জ্ঞান সকলের থাকা দরকার তাও তাদের হয় না। সে কারণে কি গৃহস্থালী কি সন্তান পালন কোনটাই তারা সুচারুরূপে সম্পন্ন কর্‌তে পারেনা। মায়েদের অজ্ঞতার দরুণ অনেক শিশুই যে অকালে মৃত্যু মুখে পতিত হয় তা' বোধ হয় আমরা নিজ নিজ অভিজ্ঞতা হ'তে সাক্ষ্য দিতে পারবো। এই গেল সাধারণ গৃহস্থালী কাজের জন্য শিক্ষার আবশ্যকতা। কিন্তু এ সামান্য শিক্ষাই মেয়েদের জন্য যথেষ্ট নয়। বৃহত্তর জাতীয় জীবনে যোগ দেওয়ার জন্য তাদের উচ্চশিক্ষা পেতে হ'বে। স্বামীর সহধর্ম্মিণী, সহকর্ম্মিণী হবার জন্য স্বামীর উপযুক্তা তাকে হ'তে হ'বে। পণ্ডিত স্বামীর স্ত্রী মূর্খ হ'লে সে সংসার সুখের হ'তে পারে না। মূর্খ স্ত্রী পণ্ডিতের কিরূপ ভাবে সহকর্ম্মিণী হ'তে পারে? বিশেষ কথা আমাদের দৃষ্টিকে বিস্তৃত কর্‌বার সময় এসেছে, ক্ষুদ্র সংসার প্রাঙ্গণ ছেড়ে বৃহত্তর জাতীয় জীবন—তার সমাজ ও সভ্যতার বিষয়—ভাব্‌তে হ'বে। নারীর শারীরিক বীর্য্য, বুদ্ধি, প্রতিভা প্রভৃতি হেলার বস্তু নয়। তার সেই ঘুমন্ত শক্তি পুরুষের শক্তির সঙ্গে মিলিত কর্‌তে হ'বে; তা' হ'লেই জাতির কল্যাণ হ'বে। আজ ইংরেজ আমেরিকান তুর্কি প্রভৃতি জাতির কথা ভাব্‌লেই এর সত্যতা প্রমাণিত হয়।

অন্য বিষয়ে আলোচনা কর্‌বার পূর্ব্বে বাল্যবিবাহ তথা শার্দ্দা আইন সম্বন্ধে দুটি কথা বলা বোধ হয় অবান্তর হ'বে না। বাল্যবিবাহ যে দূষণীয় এতে সন্দেহ নাই। এতে একদিকে যেমন মেয়েদের স্বাস্থ্য এবং তজ্জন্য সন্তানের স্বাস্থ্য খারাপ করে, অন্যপক্ষে মেয়েদের শিক্ষায় ভয়ানক বাধা জন্মায়। তা' হ'লে শার্দ্দা আইন সম্বন্ধে এত আপত্তি কেন? Orthodox party বল্‌ছেন সমাজ নিজে ধীরে ধীরে এ প্রথা ত্যাগ করবে, সেজন্য আইন কেন? কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে বলতে গেলে শাস্ত্র ও শরিয়ত প্রপীড়িত ভারতে আইন ছাড়া কি এ দূর করার সম্ভাবনা আদৌ আছে? আইন না হ'লে সতীদাহ প্রথা এতদিন উঠে যেত কি? মুসলমানদের ত বাল্যবিবাহ সম্বন্ধে আইন হওয়ায় কোনো আপত্তিই থাকতে পারে না, কারণ ইস্‌লামের বিধি অনুযায়ী বাল্য বিবাহ একরূপ হ'তে পারে না। মুসলমান সমাজের বিবাহ Social contract বা civil marriage-এর মত। তা'হলেই বোঝা যায় Contracting parties নিশ্চয়ই বালেগ বালেগা হ'বেন—না হ'লে free consent দেওয়া সম্ভব কি? Muhammedan Law তে adult marriage সম্বন্ধে যেরূপ সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ আছে এমন আর কোথাও নেই। 'বাপ' ও 'দাদা' ভিন্ন অন্য কেউ না-বালেগা অবস্থায় কোনো মেয়ের বিয়ে দিলে, বালেগা হওয়া মাত্র সে মেয়ে ইচ্ছা করলে সে বিয়ে বাতিল করে দিতে পারে। মুসলমান আইনের অন্তর্নিহিত

www.pathagar.com

উদ্দেশ্য এই যে, উপযুক্ত বয়সে মেয়েদের বিয়ে দেওয়া হয়। পিতা পিতামহের discretion –এর জন্য একটা exception clause রাখা হয়েছে মাত্র। কিন্তু এই discretion অনেক স্থলে স্বেচ্ছাচারিতায় পরিণত হয়েছে। অনেক সময় নিজ নিজ স্বার্থের বশীভূত হয়ে পিতা পিতামহ অল্প বয়সের মেয়েদের অনুপযুক্ত পাত্রে সমর্পণ করে তাদের সমস্ত জীবন নষ্ট করে দিচ্ছে। সময় এসেছে পবিত্র ইস্‌লামিক আইনের মহান উদ্দেশ্যের ধারার অনুসরণ করার। যাঁরা শুধু literal sense নিয়ে ইস্‌লামের প্রকৃত উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করার প্রয়াস পান, তাঁরা ভেবে দেখেন না যে ইস্‌লামের কতদূর অনিষ্ট করছেন।

নারীসমস্যা সম্বন্ধে আমাদের সমাজের অনেক হিতৈষীরা এ পর্যন্ত বহু প্রবন্ধ লিখেছেন ও বক্তৃতা করেছেন ; কিন্তু কার্য্য কালে কেউই বিশেষ কিছু করেন নি। তাঁরা বোধ হয় ভুলে যান যে an ounce of example is worth a ton of precepts. যা ন্যায় বলে মনে করা যায় তা' না করার চাইতে কাপুরুষতা নেই।

মুসলমানদের আর্থিক অবস্থা সব চেয়ে হৃদয়বিদায়ক। অর্থই জাতির শোণিত wealth is the blood of a community. যদি কোনো লোকের শরীরে কোন জখম হয় এবং তা' হ'তে ক্রমাগত রক্তপাত হ'তে থাকে তা' হ'লে যেমন তার মৃত্যু অনিবার্য, মুসলমানদেরও শোণিতরূপ অর্থ ক্রমাগত বের হয়ে তারা যেরূপ নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছে, এবং তা' নিবারণার্থে যেরূপ কোনো ব্যবস্থা করাও হচ্ছে না, তাতে এ সমাজ সত্বরই ধ্বংসমুখে পতিত হ'বে। ধীর ভাবে আমাদের সুদ সমস্যাটিকে বিচার করে দেখা কর্ত্তব্য। অর্থাভাব হেতু আমাদিগকে ক্রমাগত মহাজনের নিকট হ'তে ঋণ করে সুদ দিতে হচ্ছে কিন্তু হারাম বলে ঋণ দিয়ে সুদ নেবার বিধি আমাদের নেই। কি sprit–এ রেবা নিষিদ্ধ হয়েছিল এবং কোন সুদ রেবা, তা' বিবেচনা করে না দেখে আমরা শনৈঃ শনৈঃ ধ্বংসের পথে অগ্রসর হচ্ছি। যাতে লোকের উপর জুলুম করা হয় এরূপ সুদ গ্রহণ করা পাপ। কোরানের মধ্যে usury condemn করা হয়েছে।

ইয়া অইওহাল্ লাজিনা আ'মানুলা তা' কুলুর্বে বা আ'দ্ আফাম মুদা–আ–ফাতান্।

"Do not devour usury making addition again and again or doubling and redoubling"

Banking system–এর সুদে ব্যক্তিবিশেষের উপর জুলুম হয় না, কাজেই আমাদের এটাকে রেবা বলে হারাম করা সঙ্গত হ'বে না। অন্যপক্ষে বাজারদর সুদ Market rate of interest নিয়ে কর্জ্জ দেওয়াও অসঙ্গত বোধ হয় না। আমার কোন বন্ধুর কথা জানি, যিনি Provident fund–এর সুদ হারাম মনে করে বছরে হাজার টাকা করে গবর্ণমেন্টকে ছেড়ে দিচ্ছেন। এখন মনে করুন এই টাকাগুলি মুসলমান শিক্ষার জন্য কিংবা এই দুর্ভিক্ষের দিনে Relief work এ ব্যয়িত হ'লে কি দেশের উপকার হত না? বালুর ঘাটের দুর্ভিক্ষের সময় সে বন্ধুকে আমরা অনুরোধ করেছিলাম যে তুমি এটাকা নিয়ে নিজে ব্যবহার না করে এই দুর্ভিক্ষ পীড়িতদের অন্ন বস্ত্রের সংস্থানের জন্য ব্যয় কর। কিন্তু বন্ধুবর কিছুতেই সম্মত হ'লেন না। এরূপে কত লক্ষ লক্ষ টাকা যে মুসলমানেরা নিজেদের নির্ব্যুদ্ধিতার জন্য হারাচ্ছে তার ইয়ত্তা নেই। অথচ এই সমাজের লোকই অন্নাভাবে মরছে, অর্থাভাবে পীড়িতের চিকিৎসা হচ্ছে না এবং সহস্র সহস্র মেধাবী ছেলেমেয়েদের শিক্ষার সংস্থান হচ্ছে না। মুসলমানদের রেবার বিকৃত অর্থ করে যে কোন সুদকে নিষিদ্ধ মনে করায়, গোটা সামাজিক জীবন লাভ ও ক্ষতি যার

www.pathagar.com

উপরে ভিত্তি করে সমস্ত ব্যবসা বাণিজ্য চলে—সেই লাভ ও ক্ষতির ধারণাটি তাদের ভিতর লোপ পেয়ে গিয়েছে। ফলে মুসলমানেরা বেহিসাবী হয়ে পড়েছে। তাই তাদের ভিতরে দেখা যায় অমিতব্যয়, অপব্যয়, সঞ্চয়ের প্রতি উদাসীনতা।

বাঙালি মুসলমানের অবস্থা আলোচনা প্রসঙ্গে তার প্রতিবেশী সম্বন্ধে দু একটি কথা না বল্‌লে এ প্রসঙ্গ একেবারেই অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

হিন্দু আজ শিক্ষা-দীক্ষা সর্ব্ব-বিষয়ে মুসলমান হ'তে প্রায় পঞ্চাশ বছর এগিয়ে গেছে। তারা বিশ্ব-সভ্যতায় ইতোমধ্যেই অনেক কিছু দান করেছে। জগদীশ চন্দ্র বসু, প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী আজ তাই জগদ্বিখ্যাত। ব্যবসা বাণিজ্য, আর্থিক উন্নতির ক্ষেত্রেও হিন্দু আজ দিন দিন খুবই সফলকাম হচ্ছে। তুলনামূলক সমালোচনা কর্‌লে তাই দেখা যায় হিন্দু আজ জমিদার, মুসলমান তার প্রজা, হিন্দু আজ চিকিৎসক, মুসলমান চিকিৎসিত রোগী, হিন্দু প্রফেসার, মুসলমান ছাত্র, হিন্দু উকিল, মুসলমান মক্কেল, হিন্দু সওদাগর, মুসলমান তার খরিদ্দার, হিন্দু উত্তমর্ণ বা মহাজন, মুসলমান অধমর্ণ বা দায়িক্—এক কথায় জাতীয় জীবনে সমস্ত দিকে হিন্দুর প্রভাব অনুভূত হয়। মুক্তি কিসে হিন্দু সে কথা বুঝতে পেরেছে। মুসলমান এখনও যেন অন্ধকার হাতড়ে বেড়াচ্ছে। হিন্দুর কর্ম্মধারা আজ সহস্রমুখে উৎসারিত হচ্ছে—আর মুসলমান এখনও যেন নেশাখোরের মত ঝিমোচ্ছে। হিন্দু যুবকেরা আজ কী প্রাণোম্মাদনায়ই না মত্ত ; তারা বন্যা দুর্ভিক্ষের সময় যে অদম্য উৎসাহের সহিত পীড়িতদের শুশ্রূসা করে, তা' অতীব প্রশংসার বিষয়। হিন্দুর সেবাশ্রম night স্কুলরূপ বহু সদনুষ্ঠান দেশে প্রভূত কল্যাণ সাধন করছে।

অবশ্য সমাজ হিসাবে হিন্দুদের মধ্যে এখনও বহু কু-প্রথা আছে—সে সবের সংস্কার হওয়া একান্ত দরকার। তাদের অস্পৃশ্যতা, বর্ণবিভাগ প্রভৃতি সমস্যাগুলির এখনও সুমীমাংসা হয় নি। তাদের বিধবাদের দশা এখনও আগের মতই মর্ম্মবিদারক ; পণপ্রথা এখনও বহু পরিবারের সর্ব্বনাশ সাধন কর্‌ছে। কিন্তু এদিকেও হিন্দুরা চুপ করে বসে নেই। এই বাংলাতেই গত একশত বছরের মধ্যে কত না মহাপ্রাণ সংস্কারক এলেন, তাদের সমাজের সংস্কারের জন্য। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ, কেশব প্রভৃতির নাম প্রাতঃস্মরণীয়। কিন্তু বাংলার বাহিরের দু' একজনের কথা ছেড়ে দিলে গোটা ভারতীয় মোসলেম সমাজে এমন একজন সমাজ-সংস্কারকও জন্ম নেন নি, যাঁ'র কথা মনে করে এতটুকু গর্ব্বও অনুভব করা যায়। বাস্তবিকই আজ দেড়শত দুশত বছর ধরে বাঙ্গালীর, তথা ভারতীয় মুসলমানদের ভিতর কী মৃত্যুসম অবসাদ, কী ভীষণ চিন্তার দারিদ্র্য—ভাবের দৈন্য, ভাবুকের অভাবই না দৃষ্ট হয়। ফলে মুসলমানদের ভিতর এখনও সেই ঘৃণিত পর্দ্দা-প্রথা তেমনি অপ্রতিহতভাবে বিরাজ করছে—মৌলানা মৌলবী সাহেবদের দাওয়াৎ খাওয়ার ঘটা কথায় কথায় কাফেরি ফৎওয়া দেওয়া তেমনি জোরে-শোরেই চল্‌ছে। আজ মুসলমানদের একতার আদর্শ নিয়ে হিন্দুরা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সমন্বয়ের চেষ্টায় উঠে পড়ে লেগেছে। ব্রাহ্ম, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, জৈন, শিখ প্রভৃতি সম্প্রদায়গুলিকে—যারা ইতঃপূর্ব্বে অহিন্দু বলে পরিচিত ছিল, আজ হিন্দু সমাজে ফিরিয়ে নেওয়া হচ্ছে—আর তারা হিন্দু বলে পরিচিত হচ্ছে—কিন্তু মুসলমানেরা আজ নিজেদিগকে শত ভাগে বিভক্ত করে দুর্ব্বল হয়ে পড়ছে। শিয়া, সুন্নি, হানাফি, হাম্বালী প্রভৃতি দল ত আগে হ'তে ছিল, এখন বাংলাদেশে এক হানাফী বিভাগই না কত খণ্ডে বিভক্ত হয়ে বিভিন্ন মৌলানা সাহেবদের নেতৃত্বে পরস্পরকে গালাগালি ও কাফেরী

www.pathagar.com

ফৎওয়া দিয়ে, ও বিবাহ-সাদী, খাওয়া দাওয়া প্রভৃতি সামাজিক কার্য্যকলাপে পরস্পরকে একঘরে করে, কি ভয়াবহভাবেই না ইস্‌লামকে বিচ্ছিন্ন, বিভক্ত ও শক্তিহীন করে তুল্‌ছে। এক কথায় বলতে গেলে, বর্ত্তমানে হিন্দুরা পরকে আপন করে নিচ্ছে, আর মুসলমানরা আপনকেও পর করে দিচ্ছে।

ইতঃপূর্ব্বে মুসলমানেরা স্বাস্থ্য ও শারীরিক বীর্য্য হিসাবে দেশের গৌরব ছিল। কিন্তু আজকাল তারাই দুর্ব্বল ও ভীরু বলে কলঙ্কিত হচ্ছে। হিন্দুরা শারীরিক স্বাস্থ্য উন্নতির জন্য প্রাণপণ চেষ্টা কর্‌ছে। আজ খেলাধূলায় দেশ বিদেশ হ'তে তারা জয়মাল্য নিয়ে আসছে। শারীরিক স্বাস্থ্যের সঙ্গে মানসিক শৌর্য্যও তাদের ক্রমে বেড়ে যাচ্ছে। বিমানপোত চালনা প্রভৃতি সাহসিক কার্য্যে তারাই আজ অগ্রগণ্য। মুসলমান এ সব কি করে করবে? তাদের মৌলানা সাহেবেরা যে বলেছেন এসব হারাম! হায় হতভাগ্য সমাজ!

মুসলমানদের কর্ত্তব্য তুরস্ক, ইজিপ্ট, পারস্য প্রভৃতি মুস্‌লিম দেশগুলির বর্ত্তমান যুগের ইতিহাস অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করা। হালিদা এদিব, সেখ মুহম্মদ আব্দুহ্ প্রভৃতি বিদেশীয় লেখক লেখিকাদের লেখা পড়্‌লে, তাদের ভিতর উন্নত হবার স্পৃহা জাগরিত হ'বে। তাদের চোখের সাম্‌নে ভবিষ্যত উন্নতির পথ খুলে যাবে। বিশেষ করে তাদের প্রতিবেশী হিন্দু সমাজ সহস্র সহস্র বৎসর ব্যাপী কুসংস্কার ও অবসাদের শৃঙ্খল থেকে বীর সামসনের মত কি অদম্য Determination-এর বলে মুক্ত, এবং শনৈঃ শনৈঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হচ্ছে তা' তাদের অনুধাবন করা দরকার।

এই সম্পর্কে গত কয়েক বৎসর হিন্দু-মোসলেম বিরোধের কথা স্মরণ হয়ে মনে বড়ই দুঃখের উদ্রেক হচ্ছে। এ নিতান্তই লজ্জার বিষয় যে একই দেশে যাদের জন্ম—একই দেশের আলো-বাতাস যাদের প্রাণে আনন্দ গান বহন করে আনে, একই দেশের মাটি যাদের শেষ শয্যা—তাদের মধ্যে কলহ তাদের মধ্যে বিরোধ। এর কারণ আমার এই মনে হয় যে, হিন্দু মুসলমান এখনও পরস্পরের সহিত ভালরূপে পরিচিত হতে পারে নি—বিশেষ আজও তারা বৃহত্তর জাতীয়ভাবে অনুপ্রাণিত হয়নি, বা ভাব্‌তে শিখে নি।

হিন্দু মুসলমান মিলনের জন্য পরস্পরকে পরস্পরের সভ্যতা ভাল করে বুঝ্‌তে চেষ্টা কর্‌তে হ'বে। এ জন্য পরস্পরের দর্শন, সাহিত্য, শিল্প নিবিড়ভাবে জানতে হ'বে। তাদের ক্রমে ক্রমে এই মনোভাব আনয়ন কর্‌তে হ'বে যে, হিন্দু মুসলমান এক জাতি, ভারতীয়। তাদের মনে কর্‌তে হ'বে যে শুধু ধর্ম্ম বিষয়ে তারা হিন্দু তারা মুসলমান—সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও অন্যান্য সমস্ত বিষয়ে তারা ভারতীয়। এ কথা স্মরণ থাকলে যে পরমত—অসহিষ্ণু Militant Islam ও Militant Hinduism দেখা দিয়েছে তা' অচিরেই দূরীভূত হ'বে। এই দুই জাতির ভ্রাতৃত্ব ও মিলনের পথ সহজ করণার্থে পরিবারে পরিবারে এদের সামাজিক ভাবে মেলা-মেশার ব্যবস্থা করার দরকার হয়েছে। বিশেষ করে এমন উদার সাহিত্য প্রচলনের ব্যবস্থা করা দরকার মনে হয়, যাতে জাতিবিদ্বেষ আদৌ স্থান পাবে না। সাহিত্যের ভিতর দিয়ে মিলন হওয়া খুব সোজা—কেননা সাহিত্য চিন্তার বাহন হওয়ায় যেরূপ মনের উপর প্রভাব বিস্তার কর্‌তে পারে এমন আর কিছুতেই নয়। এই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে শান্তি আনয়ন ও মিলন স্থাপন আপনাদের সাহিত্য সমাজের এক মহান প্রয়াস হোক্।

আশা হয় ইস্‌লামের প্রাণশক্তি এখনও নিভে যায় নি। মনীষী H. G. Wells বলছেন—Islam is an open air religion, it knows not how to die, এ কথার সত্যতা কি আজ প্রমাণিত হচ্ছে না? আরবে, তুরস্কে, পারস্যে ইস্‌লামের কি নব অভিযান শুরু হয় নি? আমার মনে হয়—এবং বহু ইউরোপীয় মনস্বীরাও বলছেন যে ইস্‌লামে এমন একটা Vitality

www.pathagar.com

আছে যে তার গভীর নিরাশার সময় এমন এক একটা মহাপুরুষের সে জন্ম দেয়, যিনি এই ঘন নিরাশার কালিমাকে আশার আলোকে রূপান্তরিত করে তুলেন। মুস্তফা কামাল, রেজাশাহ, ইব্নে সউদ, আমানুল্লা, নাদির খাঁ প্রভৃতি এ কথার সত্যতা প্রমাণ করছেন। মুসলমানদের ভিতর এমন একটা Stamina আছে যে যদি তার মুক্তি কিসে এ একবার বুঝতে পারে, তবে তাদের কোনো প্রতিবন্ধকই আট্‌কিয়ে রাখ্‌তে পার্‌বে না।

Stoddard পঞ্চাশ শতাব্দীর খ্রিস্টানদের সঙ্গে বর্ত্তমান মুসলমানদের তুলনা করে বলেছেন—

"ইহা স্মরণ রাখা উচিত যে পঞ্চদশ শতাব্দীতে, Reformation-এর প্রারম্ভে, খৃস্টীয় জগতের যে অবস্থা ছিল, মোস্‌লেম জগতের আজ ঠিক সেই অবস্থা। Reason-এর উপর dogma-র একই রকম প্রাধান্য ও একই রকমের অন্ধ গতানুগতিকতা, এবং স্বাধীন চিন্তা ও বিজ্ঞান চর্চ্চার প্রতি একই রকমের সন্দেহ ও বিরুদ্ধভাব। সন্দেহ নাই মুসলমানদের ধর্ম্মগ্রন্থাদি বিশেষতঃ শরিয়ত পড়লে, এবং তাদের গত সহস্র বৎসরের ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টি করলে মনে হয় যে ইস্‌লাম বর্ত্তমান উন্নতির এবং সভ্যতার পরিপন্থী। কিন্তু পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে খৃস্টিয় জগতের কি হুবহু এই অবস্থা ছিল না? শরিয়তকে খৃস্টান Canon Law-র সঙ্গে তুলনা কর, দুটিরই উদ্দেশ্য এক। উদাহরণ স্বরূপ সুদ নেওয়ার নিষেধ বিধির উল্লেখ করা যেতে পারে যা মানলে আধুনিক জগতের শিল্প বাণিজ্য অসম্ভব হয়ে পড়ে; ইস্‌লাম যে বর্ত্তমান সভ্যতার সম্পূর্ণ অনুপযোগী তার প্রমাণ স্বরূপ এই সুদ নিষেধ বিধিকেই দেখান হয়। খৃস্টান Canon Law ঠিক এই ভাবেই সুদ নিষেধ করে ছিল। এত কড়াকড়ি ভাবে এই নিষেধ বিধি চালিয়েছিল যে কয়েক শতাব্দী ব্যেপে ইউরোপের সমস্ত কারবার ইহুদীদের একচেটিয়া ছিল। যে সব খৃস্টান সর্ব্বপ্রথম সুদে টাকা খাটাতে সাহস করেছিল, (The Lombards) তারা প্রায় ধর্ম্মদ্রোহী বলে বিবেচিত হ'ত এবং সকলেই তাদের ঘৃণা কর্‌ত এবং অনেক সময় তারা অত্যাচারিত হ'ত।

স্বাধীন চিন্তা এবং বিজ্ঞান চর্চ্চার সঙ্গে মুসলমানদের বিরোধের কথা ধরা যাক!—ন্যূনাধিক তিনশত বছর পূর্ব্বে Papal Inquisition মহাত্মা গ্যালিলিওকে 'পৃথিবী সূর্য্যের চার দিকে ঘুরছে' এই সর্ব্বনেশে ধর্ম্মদ্রোহী (?) মত অস্বীকার করতে ভীষণ শারীরিক অত্যাচারের ভয় দেখিয়ে বাধ্য করেছিল। ইস্‌লামের ইতিহাসে এর চেয়ে জঘন্যতর কিছু আছে কি?

Christianity যদি এসব কুসংস্কার অজ্ঞানতা প্রভৃতির আবর্জ্জনা হ'তে মুক্ত হ'তে পেরেছে তবে ইস্‌লাম কেন পারবে না?

তথ্য-সংকেত

১. ১৯২০ সালের দ্বিতীয়াংশে মওলানা আবদুল বারী, মওলানা শওকত আলী ও মওলানা আবুল কালাম আজাদ বৃটিশ-শাসিত ভারতকে 'দারুল হরব' বলে ঘোষণা করেন এবং ভারতীয় মুসলমানদের ধর্মীয় কর্তব্যের ডাকে 'দারুল ইসলাম'-এ অর্থাৎ মুসলিম-শাসিত দেশে হিজরত করার পরামর্শ দেন। মওলানাদের উপদেশে ও আফগানিস্তানের আমির আমানুল্লাহ খান তাদের আশ্রয় দেবেন এ আশ্বাসের ভিত্তিতে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে, বিশেষত সিন্ধু ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ থেকে হাজার হাজার মুসলমান দেশ ত্যাগ করে আফগানিস্তানের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। এত বিপুল সংখ্যক মুহাজিরের আশ্রয়দান সম্ভব নয় বলে আফগান সরকার তাদের প্রবেশে বাধা দেয়। আফগান সীমান্তে জড়ো-হওয়া এই অগণিত সংখ্যক ভারতীয় মুসলমানের অনেকে ক্ষুধা, প্রচণ্ড উত্তাপ, ক্লান্তি ও অসুখ-বিসুখে প্রাণ হারায়। যারা দেশে প্রত্যাবর্তন করে তারা কপর্দকহীন অবস্থায় ফেরে। মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, মওলানা মুহম্মদ আলী জওহর, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৭, পৃ. ৩১-৩২

www.pathagar.com

পঞ্চম বার্ষিক অধিবেশনের অভ্যর্থনা–সভাপতির অভিভাষণ

অধ্যাপক আবদুর রব চৌধুরী

সমবেত ভদ্রমণ্ডলী,

মুসলিম সাহিত্য সমাজের এই পঞ্চম বার্ষিক অধিবেশনে অভ্যর্থনা সমিতির তরফ হইতে আপনাদিগকে অভিবাদন করার ভার আমার উপর অর্পিত হইয়াছে। আমি বিশেষ করিয়া অনুভব করিতেছি যে এই কর্ত্তব্য কোন যোগ্যতর ব্যক্তির উপর ন্যস্ত হইলেই সাহিত্যের মর্য্যাদা বজায় থাকিত। যাহা হউক অভ্যর্থনা সমিতির আহ্বান আদেশরূপেই গ্রহণ করিয়া আপনাদিগকে সাদর সম্ভাষণ জানাইতেছি। প্রার্থনা করি, আপনাদের সকলের সমবায়ে আমাদের অদ্যকার অধিবেশন সফল হউক।

সাহিত্যচর্চ্চা ভিন্ন জাতীয় উন্নতি অসম্ভব। সাহিত্যচর্চ্চা জাতীয় জীবনের পরিচায়ক ও পরিপোষক। যে জাতির মধ্যে সাহিত্যচর্চ্চা নাই, তাহার প্রাণ–চাঞ্চল্যেরও সাড়া পাওয়া যায় না ; যে জাতির জীবন চারিদিক দিয়া পুষ্ট ও বিকশিত হইয়া উঠে নাই, তাহার নিকট হইতে কোন সাহিত্যের আশা রাখা বিড়ম্বনা মাত্র। বঙ্গীয় মুসলিম সমাজে আমরা এই সত্যের নিদর্শন দেখিতে পাই। লোক–সংখ্যায় আমরা অর্দ্ধেকের অধিক, কিন্তু লোক–সংখ্যা ভিন্ন অন্য কোন কিছুতেই বা কোনরূপ যোগ্যতায়ই আমরা বঙ্গীয় সমাজের মধ্যে কোন বিশিষ্ট অনুপাতের দাবী করিতে পারি না। শিক্ষায়, শিল্পে, ব্যবসায় বাণিজ্যে আমরা পশ্চাৎপদ। ইহারই নিদর্শনস্বরূপ আমরা দেখিতে পাই, সাহিত্যচর্চ্চায় আমরা উদাসীন। বাংলা সাহিত্য আজ বিশ্বের দরবারে গৌরবান্বিত আসনে সমাসীন, কিন্তু ঐ গৌরবের প্রতিষ্ঠানে আমাদের দান কিছুই নাই। আমরা সাহিত্যচর্চ্চা করি না বলিয়া আমাদের জাতীয় জীবনে গভীর হইতে গভীরতর অবসাদে নিমজ্জিত হইতেছি।

সাহিত্যের আসরে আমরা মুসলমানেরা করিতেছি কি? যাঁহারা শিক্ষিত তাঁহাদের অনেকেই' ত ইংরেজী বা উর্দ্দুর মোহেই পড়িয়া আছে। আর যাহারা অশিক্ষিত তাহাদের মধ্যে অনেক 'ছহি সোনাভান' বা 'আসল কেয়ামত নামা' নিয়া মশগুল আছি। এই বিভিন্নমুখী ব্যর্থ প্রয়াসের মধ্যভাগে আমাদের সমস্ত সাহিত্যচর্চ্চা ব্যবস্থিত রহিয়াছে।

ভাষা–সমস্যার পূর্ণ সমাধান প্রকৃতভাবে এখনও আমাদের হইয়া উঠে নাই। হয়ত তর্কের খাতিরে যেন বিশেষ দয়াপরবশ হইয়া আমরা স্বীকার করি যে বাংলা আমাদের মাতৃভাষা। কিন্তু এই কথার পূর্ণ অনুভূতি আমাদের মনে এখনও জাগে নাই। বাংলা ভাষাকে এখনও আমরা অন্তরের সহিত নিজের বলিয়া গ্রহণ করিতে শিখি নাই। কাজেই বাংলা সাহিত্যে আমাদের দান আজও এরূপ নগণ্য।

কিন্তু ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, মুসলমান আমলেই বাংলা সাহিত্যের সবিশেষ পুষ্টিসাধন হয়, তখন মুসলমানেরা বাংলার প্রতি এইরূপ উদাসীন ছিলেন না। বরং

www.pathagar.com

বাংলার মুসলমান বাদশাহ ও ওমরাহগণের উৎসাহে ও সাহায্যেই সংস্কৃতের গুরুচাপ এড়াইয়া বাংলা সাহিত্যের বিকাশ সম্ভবপর হয়। সেই আমলে দৌলত, আলাওল, মর্ত্তুজা প্রভৃতি বহু মুসলমান কবি বাংলা সাহিত্যে অমর কাব্য লিখিয়া গিয়াছেন। মুসলমান নরপতিগণের উৎসাহে ও প্রেরণায়ই বাংলা সাহিত্য তৎকালে সংস্কৃত ও ফারসীর সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারিয়াছিল।

ধীরে ধীরে মুসলমানের জাতীয় জীবনে নানারূপ অবসাদ আসিতে থাকে, তাহারই ফলে তাঁহারা ক্রমশঃ রাজ্যহারা ও বিত্তহারা হইয়া পড়েন। এ সত্ত্বেও বহুকাল মুসলমানগণ শিক্ষার প্রতি একেবারে উদাসীন ছিলেন না। লর্ড বেন্টিঙ্কের আমলে প্রাচ্যশিক্ষা ও প্রতীচ্যশিক্ষা নিয়া এক তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয়। এই আন্দোলন বেন্টিঙ্কের আমলের পূর্ব্ব হইতেই চলিয়া আসিতেছিল, কিন্তু বেন্টিঙ্কের আমলেই ইহা বিরাট সমস্যার আকার ধারণ করে। লর্ড মেকলে ও তাঁহার সহযোগীদের প্রেরণায় ১৮৩৫ সালে প্রতীচ্য-শিক্ষার পত্তন হয়। ইহার পর হইতেই হিন্দু ও মুসলমান শিক্ষায় এক আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন দেখা যায়। হিন্দুগণ প্রতীচ্য-শিক্ষা বিপুল আগ্রহের সহিত গ্রহণ করেন আর মুসলমানগণ মনে করেন, 'রাজ্য-হারা হইয়াছি বলিয়া কি নিজ কালচারও খোয়াইব।" তাঁহারা নব উৎসাহে আরবী ও ফারসীর চর্চ্চায় লাগিয়া যান। সমস্ত বাংলা জুড়িয়া মুসলমানেরা একমাত্র মাদ্রাসা-শিক্ষায় ব্যাপৃত থাকেন। ইহারই ফলে মুসলমানেরা স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার দিকে মন দেয় নাই। সেই মাদ্রাসা শিক্ষার জের এখনও মিটে নাই। মাদ্রাসা এখনও মুসলমান শিক্ষার এক বড় সমস্যা রহিয়া গিয়াছে। স্যাডলার কমিশন বলেন, যদি ১৮৫৪ সালের Education dispatch-এর ফলে মাদ্রাসা-শিক্ষাকে সময়োপযোগী করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার অন্তর্গত করা হইত, তবে মুসলমান শিক্ষার ধারা একেবারে বদলাইয়া যাইত। দেখা যাইতেছে, মাদ্রাসা শিক্ষার সাহায্য ভিন্ন মুসলমান শিক্ষার পথে আসিতে চায় না। এই জন্যই ১৯১৪ সালে মাদ্রাসা-শিক্ষাকে বহু পরিমাণে Secular করিয়া Reformed Madrasah Scheme প্রবর্ত্তিত হয়। Reformed Madrasha Scheme-এর ফলে মাদ্রাসা বহু পরিমাণে Secular ও সুনিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। ইদানীং Dacca Board মাদ্রাসা course-কে আরও Secular করিয়াছেন। এই Scheme মুসলমানকে অনেকটা সাধারণ শিক্ষার দিকে টানিয়া আনিতেছে। বর্ত্তমানে ৬৩৬টী Reformed Madrasah আছে। কিন্তু এখনও বাংলা জুড়িয়া বহু old Scheme Madrasah রহিয়াছে। গত ১৯৩০ সালের লিস্টে দেখা যায় যে গভর্ণমেন্টের সাহায্য-নিরপেক্ষ হইয়াও এখন বাংলায় ২০৮টী old Scheme মাদ্রাসা রহিয়াছে। মাদ্রাসা-শিক্ষার প্রতি মুসলমানের এই যে বিপুল আগ্রহ ইহাকে সুনিয়ন্ত্রিত করিয়া আমাদিগকে শিক্ষার পানে অগ্রসর হইতে হইবে। মাদ্রাসা শিক্ষা সুনিয়ন্ত্রিত হইলে ধীরে ধীরে স্কুল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় মুসলমান ছাত্রে ভরিয়া যাইবে।

আমার বিশ্বাস শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সাহিত্যচর্চ্চাও বাড়িতে থাকিবে ও আমাদের দানে বাংলা ভাষাও সাহিত্যপুষ্ট ও সমৃদ্ধ হইয়া উঠিবে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য আমাদের দানের জন্য অপেক্ষা করিতেছে ; কারণ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পুষ্টি ও সমৃদ্ধির জন্য মুসলমানের দান অপরিহার্য্য।

ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাসে আমরা দেখিতে পাই যে Norman Conquest-এর পর হইতে প্রায় কয়েক শতাব্দী পর্য্যন্ত Anglo-Saxon-দের সহিত নবাগত Norman-দের

www.pathagar.com

প্রকৃত মিলন হয় নাই, বহুকাল তাহাদের মধ্যে ভাবের আদান প্রদান সম্ভবপর হয় নাই। ধীরে ধীরে পরস্পর পরস্পরকে চিনিতে পারে। এই উভয় জাতির মিলনে যে নূতন জীবনের সৃষ্টি হয় তাহারই মূলে ইংরেজী সাহিত্যে ও ভাষায় জীবনী শক্তি ও সমৃদ্ধির নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে। এই মিলনের ফলেই Anglo-Saxon common sense–এর সহিত Norman imagination–এর Synthesis হয়। তাহারাই ফলে চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে চসার ও ষোড়শ শতাব্দীতে শেকসপীয়র দুই স্বর্ণযুগের অবতারণা করেন। বাংলা সাহিত্য ও ভাষাতে আমরা হিন্দু ও মুসলমান এই দুইটি ধারা দেখিতে পাই। একটি উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে, অপরটি এখনও আমাদর মাতৃভাষায় অনাগত তন্ত্রী হইয়া রহিয়াছে। কোন্ শুভ মুহূর্ত্তে এই উভয় জাতির প্রকৃত মিলন হইবে, কোন্ ভাগ্যবানের মঙ্গল হস্তে এই উভয় তন্ত্রী একতানে বাজিয়া উঠিয়া সমগ্র বাংলাকে এক গভীর আনন্দ–গানে মুখরিত করিবে। হয়ত রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল ইসলামে আমরা সেই স্বর্ণযুগের পূর্ব্বাশার আভাস পাইতেছি।

বাংলা ভাষায় ও সাহিত্যে মুসলমানদের আশা–আকাঙ্ক্ষা কি? মুসলমানেরা ভাষায় বা সাহিত্যে কোন প্রকার সাম্প্রদায়িকতা আনিতে বলে না। ভাষা ও সাহিত্যে সাম্প্রদায়িকতা চলিতে পারে না। যে ভাষা ও সাহিত্যে সাম্প্রদায়িকতা যত বেশি ভাষা ও সাহিত্য হিসেবে তাহা তত খাট। মুসলমানগণ যে ভাষা ও সাহিত্যকে আদর্শ মনে করে তাহা সাম্প্রদায়িকতা ও আভিজাত্য প্রভৃতি অহমিকা হইতে বহু উর্ধ্বে। সাম্প্রদায়িকতা ও আভিজাত্যের বিরুদ্ধেই তাহাদের অভিযান। তাহাদের আশা ও আকাঙ্ক্ষা এই যে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বাংলার মাটি বাংলার জলের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত হউক।

লেখ্য ভাষা ও কথ্য ভাষার অতি নিকট সম্বন্ধ। লেখ্য ভাষা কথ্য ভাষা হইতে যতই দূরে চলিবে, ততই উহা আড়ষ্ট ও প্রাণহীন হইবে ; লেখ্যভাষা যতই কথ্যভাষার নিকটবর্ত্তী হইবে ততই উহা সতেজ, সহজ ও সুন্দর হইবে এবং ততই কথ্য ভাষাকে আদর্শের দিকে টানিয়া তুলিতে পারিবে ; এবং কথ্য ভাষার বহুরূপী রূপকে একত্বের দিকে টানিয়া আনিবে। বাংলার লেখ্য ভাষা প্রথমতঃ আড়ষ্ট ও প্রাণহীন ছিল, ধীরে ধীরে উহা কথ্য ভাষার দিকে অগ্রসর হইতেছে ; এবং কথ্য ভাষাও ধীরে ধীরে একত্বের দিকে অগ্রসর হইতেছে। কিন্তু এখনও সংস্কৃতের মোহ কাটে নাই, আভিজাত্য দূর হয় নাই ; ফলে হিন্দু সমাজের কথ্য ভাষাই সাহিত্যের বাহন হইয়াছে। এই সংস্কৃতের মোহ ও আভিজাত্য দূর হইলেই বাংলা ভাষার প্রকৃত উপকার হইবে। সংস্কৃতের সহিত আমার কোন বিরোধ নাই। আমার বিরোধ তাহাদের সহিত যারা বলে যে, যে সব শব্দ দেবভাষা হইতে আসে তাহাদের কোন বিশেষ আভিজাত্য আছে। আমরা মুসলমানগণ নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্যের জন্য আমাদের কথ্য ভাষায় যে সব শব্দ ব্যবহার করি, তাহা সংস্কৃত নয় বলিয়াই পরিহার করিলে চলিবে না। ঐ সব ভাব প্রকাশ করিতে যদি মুসলমানদিগকে অনুবাদের সাহায্য লইতে হয়, তবে পূর্ণভাবে ভাব প্রকাশ হয় না। আমাদের কথ্যভাষার এই সব শব্দ সংস্কৃত না হইতে পারে, কিন্তু এগুলি প্রকৃত বাংলা শব্দ এবং এগুলি ব্যবহারে আমাদের লজ্জার কোন কারণ নাই। অনেক সময় হিন্দু লেখক ও সমালোচকগণ সুবিবেচনার অভাবে এই সব শব্দ ব্যবহারের জন্য তীব্র সমালোচনা করেন, কিন্তু তাঁহাদের মনে রাখা উচিত বাংলা ভাষা কেবলমাত্র তাঁহাদের নয়,

www.pathagar.com

আমাদেরও। শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে মূক মুসলমান যতই কথা কহিতে শিখিবে তাহার কথ্য ভাষা ততই বাংলা ভাষাকে নব শব্দসম্পদে ভূষিত করিবে।

সাহিত্যের দিক দিয়াও আমাদের ভাব ও আমাদের আদর্শ এখনও বাংলা সাহিত্যে ফুটিয়া উঠে নাই। এই জন্য আমাদের অনেকেই বলেন, বাংলা সাহিত্যে হিন্দুয়ানী এত বেশী যে আমাদের আদর্শ উহাতে কখনও স্থান পাইতে পারে না। সাহিত্যের উৎস প্রাণের গভীরতম প্রদেশ হইতে। কাজেই হিন্দু লেখকগণের লেখায় যে কতক হিন্দুয়ানী থাকিবে, তাহা অনিবার্য্য। আমরা মুসলমানগণ বাংলা সাহিত্যে নিজ কর্ত্তব্য করি নাই, আমাদের নিজের আদর্শ ও ভাব ফুটাইয়া তুলি নাই ; তাই বলিয়া কি যাঁহারা নিজ কর্ত্তব্য করিয়াছেন, নিজেদের আদর্শ ও ভাব ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, তাঁহাদের দোষ দেওয়া চলে? দোষ দেওয়ার যে মনোবৃত্তি তাহা হইতে আমাদিগকে বহু উর্ধ্বে উঠিতে হইবে এবং আমাদের নিজ আদর্শ ও ভাব সাহিত্যে ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। তবেই আদর্শ জাতীয় জীবন ফুটিয়া উঠিবে ও প্রকৃত সাহিত্য গঠিত হইবে। সুখের বিষয় ইদানিং বহু হিন্দু লেখকগণেরও লেখায় আমাদের আদর্শ ও ভাব ফুটিয়া উঠিতেছে। এঁরাও নবযুগের অগ্রদূত। আমার বিশ্বাস, আমাদের তরুণ কবি ও লেখকদের লেখায় আমাদের আদর্শ ও ভাব মূর্ত্ত হইয়া উঠিবে এবং নবযুগ আরও নিকটবর্ত্তী হইবে। হিন্দু ও মুসলমান এই উভয় আদর্শের মিলন ও সমবায় বাংলা সাহিত্যের এই নবযুগের ভিত্তি হইবে।

মুসলমান-সম্প্রদায়ই প্রকৃতপক্ষে বাংলার কৃষক। মুসলমান কৃষকের আশা ও আকাঙ্ক্ষার সোনার বাংলা সোনার ফসলে ভরিয়া উঠে। মুসলমান সাহিত্যিকদের এই বিপুল আশা ও আকাঙ্ক্ষায় কি সোনার বাংলা সোনার সাহিত্যে ভরিয়া উঠিবে না?

www.pathagar.com

পঞ্চম বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতির অভিভাষণ

হাকিম হাবিবুর রহমান

বন্ধুগণ,

পারস্য ভাষায় একটি প্রবাদ আছে—আদসিয়ান্ গুম্ শুদন্দ ও মুল্‌ক্-ই-খোদা ঘর্ গিরফ্‌ত[১]—আপনাদের সবারই বোধগম্য বাংলা ভাষায় ইহার অনুবাদ দিয়া নিজেকে নিতান্তই লাঞ্ছিত করা সঙ্গত নয়। বর্ত্তমানে আমাদের সমাজে কর্মক্ষম লোকের 'দুর্ভিক্ষ' সুস্পষ্ট ; তবু আমাকে আপনাদের এই সম্মেলনের সভাপতি নির্ব্বাচন বিশেষভাবে অপ্রশংসার যোগ্য এই জন্য যে আমার মাতৃভাষা উর্দ্দু, আর বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়ু সেবন আমার ভাগ্যে কোনো কালেই ঘটে নাই। যাহা হউক আমাদের উভয় পক্ষের ভুল-ত্রুটির জালে ধৃত হইয়া যখন সভাস্থল পর্য্যন্ত আসিয়া জুটিয়াছি তখন মুখ ত আমাকে খুলিতে হইবেই। আমার মত একজন সেকেলে ও সেকালপ্রিয় লোকের বাগ্‌বিস্তার যদি শেষ পর্য্যন্ত আপনারা সহ্য করিতে পারেন তবেই যথেষ্ট।

ইসলামের প্রথম শতাব্দীতেই মুসলমানগণ আমাদের এই ভারতভূমিতে পদার্পণ করেন। ভারতের সঙ্গে আরববাসিগণের পরিচয় সুপ্রাচীন, কিন্তু এদেশের অধিবাসীরূপে পরিগৃহীত তাঁহারা হন নাই। মুসলমানগণ কিন্তু এদেশের স্থায়ী অধিবাসীই হইয়া গেলেন। ভারতের উপকূলভাগ তাঁহাদের প্রথম অবতরণভূমি এবং "আল্ আক্‌রাবু ফাল্ আক্‌রাবু" (যত কাছে তত আগে) নীতির অনুসরণে ঐ সকল ভূভাগে নবাগতগণের সংখ্যাধিক্য স্বাভাবিক। তাই পাঞ্জাব ও দোআবা মোগল তুর্কীগণের এবং সিন্ধু বঙ্গ সিঙ্গাপুর ও যবদ্বীপের উপকূলভাগ আরব বণিকগণের ও মুসলিম প্রচারকগণের বিচিত্র কর্ম্মভূমি। এই সমুদ্র-উপকূলবাসীদের যে স্বরভঙ্গি ও তাহাদের মুখমণ্ডলের যে গঠন তাহাই অনেকখানি স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দেয় ইহাদের পূর্ব্বপুরুষদের আদি বাসস্থান কোথায়।

সবাই জানেন আরব তুর্ক মোগল ও হাবসীদের হাজার—করা একজনও এদেশে স্ত্রীপুত্র সঙ্গে লইয়া আসেন নাই। তৎকালীন ঔপনিবেশিক প্রথানুযায়ী এদেশ হইতেই তাঁহারা স্ত্রী গ্রহণ করিয়াছিলেন। হিন্দুস্থানী সৈয়দ, হিন্দুস্থানী তুর্ক ও হিন্দুস্থানী মোগলের বংশ ভিত্তি-স্থাপন এই ভাবেই। তারপর, ইঁহারা আবুমা'শেরে ফলকী ও আলবেরুনীর ন্যায় বিদ্যাচর্চ্চার ব্রত লইয়া এদেশে আসেন নাই। তাই এদেশের যে ভাষা তাহাতেই তাঁহারা বুৎপত্তি লাভ করিবেন ইহা সম্ভবপর নয়। এ ভিন্ন বিজেতা ও বিজিত উভয়েই উভয়ের ভাব ও ভাষা আয়ত্ত করিতে চির-উৎসুক। তাই ইহাদের ভিতরে এক নবভাষার উৎপত্তি হইতে লাগিল—তাহার নাম হইল হিন্দি ও হিন্দুস্থানী। পারস্য ঐতিহাসিকগণ এদেশের হিন্দুগণের ভাষা 'হিন্দুভি' ছিল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন ; কিন্তু আমার বক্তব্য, হিন্দিভাষা মূলতঃ হিন্দু মুসলমানের সম্মেলন—জাত ভাষা, আর ক্রমশঃ রূপান্তরিত অবস্থায় ইহা দেশের চতুর্দ্দিকে বিস্তার লাভ করিতে থাকে। এইরূপে মোগলসাম্রাজ্য স্থাপনের কিছু পূর্ব্বে পাঞ্জাবে এই ভাষার বর্ণমালা 'গুরুমুখীতে' পরিণত হয়।

www.pathagar.com

মুসলমানগণ তাহাদের আনীত বর্ণমালা স্ব স্ব প্রাদেশিক ভাষায় ব্যবহার করিতেন, যেমন, সিন্ধু প্রদেশের আরবগণ তথায় আরবী (নস্‌খ) বর্ণমালা ব্যবহার করিতেন। অদ্যাবধি হিন্দুবাসিগণ আরবী বর্ণমালায় দেশিয় ভাষায় পত্রাদি লিখিয়া থাকেন। দাক্ষিণাত্য-অধিবাসিগণের ব্যবহৃত বর্ণমালা মোগল-প্রভাবে পারশী (নস্‌তালিফ) বর্ণমালায় পরিণত হয়। দাক্ষিণাত্যের ভাষাসমূহের দশম শতাব্দীর লিখিত, অধুনা ইউরোপের বহু গ্রন্থাগারে রক্ষিত, পত্রাদি আমার এই উক্তির সপক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

এইরূপে দোআবার ভাষায় পারশী বর্ণমালা ব্যবহৃত হইয়াছে এবং সৈন্যবাহিনীর ভিতরে যে ভাষার জন্ম হইয়াছিল তাহাই উর্দ্দু ভাষা—তুর্কভাষায় সৈন্যবাহিনীকে উর্দ্দু বলা হয়। দাক্ষিণাত্যের ভাষা ও উর্দ্দুভাষা প্রকৃতপক্ষে একই ভাষা। ইহাদের ভিতরে পার্থক্য এই যে দিল্লীতে আসিয়া উর্দ্দু ভাষা অধিক পরিমাণে পরিমার্জ্জিত হইয়াছে এবং রাজশক্তির আশ্রয়ে থাকিয়া শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া বিপুলকলেবর হইতে সমর্থ হইয়াছে।

বাংলার যে সকল মুসলমান সর্ব্বপ্রথম দেশের উপকূলভাগে বসতি স্থাপন করেন তাঁহারা বাণিজ্য ও নাবিকতাতেই আত্মনিয়োগ করেন ; কেহ বা দেশে আল্লার নাম ও বাণী পৌঁছাইতে নিযুক্ত হন। এই আরব ও পারস্য-আগত মুসলমানগণ তাঁহাদের বংশধরদের ভাষায় এমন কতকগুলি বিশিষ্টধ্বনিযুক্ত শব্দ রাখিয়া গিয়াছেন যাহার উচ্চারণযোগ্য বর্ণ বাংলাভাষায় আদৌ নাই।

পশ্চিম হইতে দ্বিতীয় জাতি যাঁহারা বাংলায় আসিয়াছিলেন তাঁহারা তুর্ক ও পাঠান। ইঁহারা সকলেই সৈনিক-পুরুষ ছিলেন আর রাজ্যবিস্তারই ছিল ইঁহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য, বিদ্যার্জ্জন বা অধ্যাপনা নয়। বাংলাসাহিত্যে মুসলমানদের 'তুর্ক' বলা হইয়াছে, আর এদেশে নবদীক্ষিতকে 'খান' উপাধী দেওয়া হয়। ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যায় পাঠানপ্রভাব বাংলায় কত গভীর। সম্রাট আকবর বাংলাকে 'বেল্‌গাকখানা' (ভীমরুলের চাক) বলিতেন। বাস্তবিক পাঠানগণ আফগানিস্থানের পরেই বাংলাকে তাঁহাদের দ্বিতীয় আবাসস্থল করিয়া তুলিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের সকল "খেল" ও "জই" যথেষ্ট সংখ্যায় এখানে বসবাস করিতেছিলেন এবং কয়েক শতাব্দী পর্য্যন্ত তাঁহারা দিল্লীর শক্তি অগ্রাহ্য করিয়া স্বাধীনভাবে পূর্ণ গৌরবে রাজত্ব করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এমন কি, শেষভাগে বাংলার সন্তান শের শা ও ইসলাম শা সমগ্র ভারতবর্ষের শাসনকার্য্য পরিচালনা করিয়াছিলেন। হুমায়ূন হইতে জাহাঙ্গীর পর্য্যন্ত সকলকেই বাংলায় আধিপত্য বিস্তারকালে পাঠানদের সহিত যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল।

পাঠানগণ প্রকৃত প্রস্তাবে ছিলেন সৈনিক—যোদ্ধা, তবু মাদ্রাসা-স্থাপন আনুবাদকরণ স্বাধীন রচনাবলীর দ্বারা সাহিত্যের পুষ্টিসাধন, ইত্যাকার বিদ্যানুরাগের পরিচয়ও তাঁহারা দিয়াছেন। বাংলার সুলতান গিয়াস উদ্দিনের নাম মহাকবি হাফেজ চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন।* কিন্তু তবুও বলিতে হইবে এসব তাঁহাদের শেষ সময়ের কীর্ত্তি ; আর সেইজন্যই

---

* কবি হাফেজ ও সুলতান গিয়াস উদ্দিন সম্পর্কিত সুবিখ্যাত গল্পটি এই : সুলতান গিয়াস উদ্দিনের সরব, গুল ও লালা নাম্নী তিনটি বাঁদী ছিল। তাহারা প্রত্যহ সুলতানকে স্নান করাইত। তাহারা সুলতানের খুব প্রিয় পাত্রী ছিল। একদিন সুলতান এই অর্দ্ধ শ্লোক রচনা করিলেন—"সাকী হাদিসে সরবো গুলো লালা মিরওদ" (হে সাকী, সরব, গুল ও লালার কথা সকলে বলিতেছে) কিন্তু দ্বিতীয় চরণটি তিনি আর সম্পূর্ণ করিতে পারিলেন না। তাঁহার দরবারের কবিদের আহ্বান করিলেন, তাঁহারাও কেহ বাদসাহের মনের মত চরণ যোগাইতে পারিলেন না। অবশেষ সুলতান প্রথিতযশাঃ হাফেজ শিরাজির কাছে অর্থ ও উপঢৌকনসহ

www.pathagar.com

দক্ষিণদিক হইতে লিখিবার উপযুক্ত বর্ণমালা সৃষ্টি বাংলায় হইতে পারে নাই। বাংলার এই মুসলমানগণ যখন রাজ্যহারা হইয়া তরবারির পরিবর্ত্তে হল বা হাল ধরিয়াছিলেন, তাঁহাদের সেই "পেরদম্ সুলতান বুদ" (আমার পিতা বাদসা ছিলেন) অবস্থায় নিজ সম্প্রদায় ও ধর্ম্ম-সংশ্লিষ্ট পত্রিকাদিতে মুসলমানী বাংলা দক্ষিণদিক হইতে লিখিবার প্রথার প্রচলন করেন। অদূর অতীতের এই ধরনের বহু বাংলা রচনা এখনও দুর্লভ নয়।

মুসলমানদের শাসনকালে বাংলার দফতরের ভাষা পারশী ছিল এবং হিন্দু-মুসলমান-নির্ব্বিশেষে শিক্ষিত বঙ্গসন্তানগণ ইহাতে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। বহু হিন্দু লিপিকার ও গ্রন্থকারের সুন্দর হস্তলিপির নিদর্শন আমরা এই ঢাকা নগরীতেই পাইয়াছি। মুসলমান রাজত্ব যখন ইউরোপীয় বণিকগণের হাতে আসিল তখনও বাংলার দফতরের ভাষা পারশী ছিল এবং হিন্দু ও মুসলমান ভিন্ন ইংরেজগণও ইহাতে ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে তাঁহাদের পারশী-অভিজ্ঞতার পরিচায়ক বহু পুস্তক এখনও মজুদ আছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে দূরদৃষ্টি ইংরাজ দেখিলেন যে আশ্রয়হীন অথচ জনসাধারণের ভাষা উর্দ্দুর ভিতরে উন্নতির সম্ভাবনা যথেষ্ট পরিমাণে রহিয়াছে ; তাই কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ খোলা হইলে তথা হইতেই বর্ত্তমান উর্দ্দুর বিকাশ আরম্ভ হইল। আমার বিশ্বাস, এই কলেজ খোলা হইলে তথা হইতেই বর্ত্তমান বাংলার সরকারী দফতরের ভাষা অকস্মাৎ পারশী হইতে উর্দ্দুতে পরিবর্ত্তিত হইল। এই উর্দ্দুভাষা কতিপয় বৎসর বাংলার দফতরের ভাষা রহিল। এই সময়ে মুসলমানদের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুগণও উর্দ্দুর ভক্ত হইয়া উঠিলেন। বাংলার এক প্রসিদ্ধ নেতার (শ্রীযুক্ত জে. এম. সেন গুপ্তের) ঠাকুরদাদা একটী উর্দ্দু পুস্তকের রচয়িতা। উর্দ্দুভাষার কবিগণের সর্ব্বপ্রথম বিবরণীর সঙ্কলন জনৈক বাঙ্গালী হিন্দু

লোক প্রেরণ করিয়া এই অনুরোধ জানাইলেন যে কবিবর যেন এই শ্লোকার্দ্ধ লইয়া ইহার ছন্দ ও মিল বজায় রাখিয়া একটি গজল রচনা করেন। হাফেজ সুলতানের অভিলাষানুযায়ী একটি গজল গান রচনা করেন ও সুলতানের নিকট পাঠাইয়া দেন, কিন্তু তিনি নিজে ভারতবর্ষে আসেন নাই। সেই গজল হইতে তিনটি শ্লোক উদ্ধৃত হইল :

১. সাকী হাদিসে সরবো গুলো লালা মিরওদ
বি বহস বা সালাসায়ে গস্সালা মিরওদ।
হে সাকী, সরব্ (সাইপ্রেস) গোলাব ও 'লালা' ফুলের কথা সবাই বলছে, তিন পাত্র শারাবের কথাও সবাই বলছে। (পারস্যের লোকরা ফুল সামনে রেখে অথবা ছোঁড়াছুড়ি করে শারাব পান করতেন।)

২. শক্র শিক্ন শওয়ন্দ হানা তুতিয়ানে হিন্দ
জি কনমে পায়সী কে বাঙ্গালা মিরওদ।
পারশ্যের এই মিছরি বাংলায় পাঠানো হলো ; এতে ভারতবর্ষের সমস্ত টীয়া মধুকণ্ঠ হবে।

৩. হাফিজ জে শওকে মজলিসে সুলতাঁ গেয়াসেদীন,
গাফেল মশো কে কারে তু আজ নালা নিরগুণ।
হাফিজ, সুলতান গিয়াস উদ্দিনের দরবারের প্রীতি সম্বন্ধে সজাগ থেকো, নইলে তোমাকে নিদারুণ অনুশোচনায় পড়তে হবে।

এই গল্পের কতটুকু সত্য কতটুকু মিথ্যা তাহা যাচাই করিবার কোনো উপায় নাই ; তবু অন্ততঃ এটুকু সত্য যে হাফেজ এই গজল সুলতান গিয়াস উদ্দিনের জন্য লিখিয়াছিলেন এবং তাঁহার নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। বাংলা তাই ইহাকে, বিশেষতঃ ইহার এই চরণ "জি কন্দে পারসী কে ববাঙ্গালা মিরওদ" ইহার নিজস্ব বলিয়া দাবী করিতে পারে।

www.pathagar.com

(নুস্‌খাই-দিল্‌কুশা-রাজা জনমেজয় মিত্র)। উর্দ্দুভাষা শুধু মুর্শিদাবাদ ঢাকা ও কলিকাতার সহিতই সম্পর্কিত ছিল না, সমস্ত বাংলাই ইহার চর্চ্চা ও আলোচনা-স্থল হইয়া উঠিয়াছিল এবং এখনকার বাঙ্গালী অপেক্ষা তখনকার বাঙ্গালী অধিকতর সাহসী ছিলেন ; তাই লক্ষ্ণৌর নবাব-দরবারের একজন রাজকবি ছিলেন হুগলীর জনৈক মুসলমান (মালিক্-উশ্-শোয়ারা—কাজী মোহাম্মদ সাদেক খান আক্তার)। হজরত মোহাম্মদ ও আম্বিয়াগণের যে জীবনী সর্ব্বপ্রথম উর্দ্দুভাষায় মুদ্রিত হয় ইহার রচয়িতা ছিলেন কুমিল্লার জনৈক মুসলমান (মৌলবী মোহাম্মদ সইদ)। উর্দ্দুভাষায় সর্ব্বপ্রথম নাটকের রচয়িতা রংপুরের জনৈক মুসলমান (সওলাতে আলমগিরি—সৈয়দ মোহাম্মদ হায়াত)। আর সব চাইতে গৌরবের কথা এই, লক্ষ্ণৌওয়ালাদের কবিত্ব বিষয়ে গবেষণামূলক সর্ব্বপ্রথম পুস্তক সুপ্রসিদ্ধ "তুমার-ই-আগলাত" এর রচয়িতা এই বঙ্গমাতারই ফরিদপুরের এক সন্তান (মৌলবী আবদুল গফুর মস্‌সাখ) ; উর্দ্দুর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকগণের কাছে আজও ইহার মর্য্যাদা অতুলনীয়। মুর্শিদাবাদের জনৈক উর্দ্দু সাহিত্যিকও সবিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। তিনি উর্দ্দুতে স্ত্রীলোকের ব্যবহৃত ভাষায় (রেখ্‌তি) প্রথম বিবরণলেখক অথবা আবিষ্কারক। বাংলার স্ত্রী উর্দ্দুসাহিত্যিকদের রচনার পরিমাণও কম নয়। মোট কথা, উর্দ্দুভাষা ঐ অল্প সময়ের মধ্যেই বাংলায় এক বড় সার্থকতা লাভ করিয়া চিরবিদায় গ্রহণ করিয়াছে।

কিন্তু এক রাজনৈতিক চালে হঠাৎ বাংলার সরকারী দফ্‌তরের ভাষা উর্দ্দু হইতে বাংলায় পরিবর্ত্তিত হইল। এই অচিন্ত্যপূর্ব্ব দুর্ঘটনায় মুসলমানদের এই অগ্রগতি বিষম বাধা পাইল এবং বাংলার মুসলমান ধ্বংসমুখে পতিত হইলেন। এইভাবে বাংলার মুসলমানকে যে সরকারী দফ্‌তর হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হইল সে দুঃখের কান্না আজও আমাদের সভাসমিতিগুলি কাঁদিতেছে।

সেকালে আমাদের সাহিত্যিকদের এক বড় বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে তাঁহারা প্রায় প্রত্যেকেই একাধিক ভাষায় সবিশেষ ব্যুৎপত্তি রাখিতেন। আলাওল সুপ্রসিদ্ধ বাঙ্গালা কবি, তিনি আবার নেজামি গাঞ্জাবীর "হাপ্‌ত পায়কর" নামক পারস্য গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ-কর্ত্তা, পারস্য ভাষায়ও তিনি কবিতা লিখিতেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। পুঁথি-সাহিত্যের প্রতি আমাদের শিক্ষিতদের কিছুমাত্র শ্রদ্ধা নাই, কিন্তু এই পুঁথি-সাহিত্যের মূলে যে সাধনা আছে তাহা বাস্তবিকই শ্রদ্ধার যোগ্য। শাহ্‌নামার মত অতি বৃহৎ ও সুকঠিন পারশী গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ উহার উর্দ্দু অনুবাদের প্রায় ৭০ বৎসর পূর্ব্বে নিষ্পন্ন হইয়াছে। এইরূপ একাধিক ভাষায় ব্যুৎপন্ন রচয়িতার সংখ্যা অদ্য হইতে ২৫/৩০ বৎসর পূর্ব্বেও কম ছিল না।

ভ্রাতৃগণ, পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমি একজন সেকালপ্রিয় লোক, তাই সেকালের কথা ভিন্ন আর কিইবা আমি আপনাদের কাছে বলিতে পারি। বাংলায় উর্দ্দুচর্চ্চার কথা যে একটু বিস্তৃতভাবে বলিলাম তাহার আর এক বড় কারণ, বাংলায় উর্দ্দু ও বাংলা চর্চ্চার ভিতর যে একটি দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইয়াছে তাহা বাস্তবিকই অবাঞ্ছনীয়। উর্দ্দু বাস্তবিকই কোন প্রদেশের খাস ভাষা ছিল না। উহা বরং সমগ্র ভারতবর্ষেরই ভাষা। লক্ষ্ণৌ ও দিল্লীবাসিগণ ইহাকে নিতান্তই এক খেলার সামগ্রী করিয়া তুলিলেন, নানা ভাবে ইহার এক বিশেষ মূর্ত্তি দিলেন, তাই ইহা একটি সীমাবদ্ধ স্থানের ভাষা হইয়া দাঁড়াইল। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে আজও উর্দ্দুর প্রসার ও প্রভাব বাস্তবিকই খুব বেশী। আজও ইহা ভারতের এক প্রদেশের সহিত অন্য প্রদেশের ভাব আদান প্রদানের ভাষা। বিদেশীয়গণও ভারতবর্ষীয়গণের সঙ্গে সাধারণতঃ এই

www.pathagar.com

ভাষায় আলাপ করিয়া থাকেন। আর বঙ্গভাষাভাষীদেরও ক্রোধ-বিরক্তি প্রকাশের ভাষা এই উর্দ্দু ভাষা। আপনাদের মাতৃভাষা বাংলার পুষ্টিসাধন তো আপনারা করিবেন নিশ্চয়ই, কিন্তু উর্দ্দুকে ঘৃণার চক্ষে দেখিলে সমস্ত ভারতের সঙ্গে আপনাদের যোগ ছিন্ন হইয়া যাইবে। তদ্ভিন্ন, আপনাদের ধর্ম্মকে তো আপনারা ছাড়িতে পারিবেন না, সেই ধর্ম্মের সাহিত্য-অংশ উর্দ্দুতে যে ভাবে বিকাশ লাভ করিয়া চলিয়াছে তাহা একান্তই প্রশংসার যোগ্য। সেখান হইতে আপনারা প্রভূত প্রেরণা লাভ করিতে পারিবেন বলিয়া আমার বিশ্বাস।

আমরা বাঙ্গালী মুসলমান ভারতের সমগ্র মুসলমান-জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশেরও অধিক, অথচ আমরাই সর্ব্বপ্রকারে অবনতির গভীর তলে পতিত আছি। কিন্তু আফসোস করিয়া আর কি লাভ হইবে। আপনারা একদল তরুণ কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতেছেন, এর চাইতে আশা ও আনন্দের কথা আর কি হইতে পারে। আপনারা আপনাদের মাতৃভূমির প্রাচীন ইতিহাস উদ্ধারের পূণ্যব্রত সর্ব্বান্তঃকরণে গ্রহণ করুন এই আমার একান্ত অনুরোধ।

কিন্তু কর্ম্মারম্ভের পূর্ব্বে কর্ম্মবিভাগ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। আপনারা কে কে পারশ্য ভাষায় লিখিত অংশ গ্রহণ করিবেন, কে কে আরবী ভাষায় লিখিত অংশ গ্রহণ করিবেন তাহা ঠিক করিয়া ফেলুন। এই সব প্রাচীন ইতিবৃত্ত পাঠ করিয়া আপনারা যে শুধু প্রাচীন ইতিকথাই জ্ঞাত হইবেন তাহা নহে, আমার বিশ্বাস, বাংলাভাষা ও সাহিত্য, বাংলার লোকদের উৎপত্তি-কাহিনী, ইত্যাদি বিষয়েও বহু মূল্যবান তথ্য উদ্ধার করিতে পারিবেন, যেমন, বাংলার কবিত্বের উপরে পারস্য সাহিত্যের কি প্রভাব পড়িয়াছে ও বাঙ্গালী মুসলমানের দেহে আরব রক্ত কি পরিমাণ আছে, এবং আরবের কোন প্রদেশেরই বা প্রভাব বাংলাদেশে বেশী, ইত্যাদি বহু মূল্যবান তথ্য আপনারা উদ্ধার করিয়া স্বদেশের জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ করিতে পারিবেন। ভারতবর্ষের কোন প্রদেশেরই মুসলিম ইতিহাস বাংলার মুসলিম-ইতিহাসের মত এত অন্ধকারে পতিত নয়। অথচ এই বাংলার মুসলমান সমাজে প্রতিভাবানের জন্ম কম হয় নাই। এই বাংলার সোনারগাঁয়ে মাতামহের আলয়ে হজরত মখ্‌দুম-উল-মুল্‌কের মত মনীষী জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁর প্রথমজীবনের শিক্ষাদীক্ষা সোনারগাঁয়ের ওলামা ও 'মোশায়েখ'দের সাহায্যে নিষ্পন্ন হয়। ইমাম খাজেগীর মতো ইলমে-হাদিস-অভিজ্ঞ ব্যক্তি এই বাঙ্গালায়ই ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছেন। এই বাংলারই জনৈক সুসন্তান সম্রাট ফিরোজ শাহের মন্ত্রীর পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ মেহেদিভি সম্প্রদায়ের স্থাপয়িতা এই বাংলারই সন্তান ; যে সম্প্রদায় অদ্যাবধি দাক্ষিণাত্যে ও গুজরাটে অবস্থিতি করিতেছে ; 'মানাদুর' নামক মুসলমান করদরাজ্যটী এই মেহদিভি সম্প্রদায়েরই স্মৃতি বহন করিতেছে। আর শুধু ধর্ম্মচর্চ্চা নয়, কলাবিদ্যার চর্চ্চাও সেকালের বাংলায় কম ছিলনা। ইব্‌নে বতুতা এমন গায়িকা এই বাংলা দেশে দেখিয়াছিলেন যাঁহারা পারশী গজলে ও মজলিসি সঙ্গীতে কৃতিত্বের পরিচয় দিতেন। কিন্তু আফসোস, সেই বাংলার ঐতিহাসিক বিবরণ আজ আমরা শিক্ষা করিতেছি কতিপয় পক্ষপাতদুষ্ট ইংরেজী ইতিহাস হইতে। আমার ধারণা এই যে, যে সমস্ত অমুদ্রিত পারশীভাষার ইতিহাসে বাংলার ইতিহাসের উপকরণ আছে সেইগুলির এক লিস্ট তৈয়ার করিয়া আমাদের তরুণদের হাতে দিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে একটি ছোটখাট লিস্ট অভিভাষণের শেষে দেওয়া হইল। কিন্তু এই সমস্তের অনেকগুলি এখন আর এদেশে পাওয়া যায় না—ইউরোপের বিভিন্ন পুস্তকাগারে সেসব রক্ষিত আছে। তাই আমাদের দেশের যাঁহারা ইউরোপে অবস্থান করিতেছেন তাঁহারা যদি ঐ সকল পুস্তকের নকলাদি প্রস্তুত করাইয়া আমাদের জ্ঞানেচ্ছু

www.pathagar.com

যুবকদিগের হাতে দিতে পারেন তবে বড়ই ভাল নয়। বিভিন্ন জিলার ইতিহাস উদ্ধারেও আপনাদের ব্রতী হইতে হইবে। প্রচলিত ডিস্ট্রীক্ট গেজেটিয়ারসমূহে ভুলত্রুটি যথেষ্ট। এইরূপে সর্ব্বক্ষেত্রেই দেশের বিশুদ্ধ ইতিহাস উদ্ধার আপনাদের লক্ষ্য হওয়া চাই।

মুদ্রালিপি ও শিলালিপি পাঠের চেষ্টা আপনাদের সাম্‌নে আর একটি অতি বড় কাজ। আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু মিঃ ভট্টশালী মুদ্রালিপি হইতে মুসলমান বাদশাহদের সম্বন্ধে বহু কিছু জ্ঞাতব্য সংগ্রহ করিয়াছেন। কিন্তু আরও অনেক কিছু বাকী।

পারশী ও আরবী শিলালিপি পাঠ আর একটী বড় ও সুকঠিন বিষয়। বাংলার বহুস্থানে এখনও বহু শিলালিপি অপঠিত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। এসিয়াটিক সোসাইটির ত্রৈমাসিক পত্রিকা এসবের কিছু কিছু সন্ধান মাঝে মাঝে দেয়। আমাদের এই ঢাকার প্রভিন্‌শিয়াল মিউজিয়ামে এরূপ অপঠিত শিলালিপি বর্ত্তমান। এই শিলালিপি পঠন-বিদ্যা আমাদের দেশে একরূপ লুপ্ত হইতে চলিয়াছে।

বিভিন্ন প্রাচীন হিন্দু মুসলমান বংশ হইতে ফরমান, নিশান, সোক্কা ইত্যাদি সংগ্রহের কাজও আপনাদের একদলকে গ্রহণ করিতে হইবে। বাংলার বহু ধর্ম্মপ্রচারকের ও আউলিয়া দরবেশের হস্তলিখিত জীবনচরিত চেষ্টা করিলে ধ্বংসের কবল হইলে এখনও উদ্ধার করিতে পারিবেন। সার আর্ণল্ডের সুবিখ্যাত Preachings of Islam-এ এই দুঃখ করা হইয়াছে যে বাংলার ইসলাম-প্রচারকগণের জীবন-কাহিনী খুব কমই সংগ্রহ করিতে পারা গিয়াছে। একটী বড় দুঃখের বিষয় এই যে আমাদের প্রাচ্যবিদ্যার এম-এ গণ শুধু মুদ্রিত পুস্তকই পড়িতে পারেন, হস্তলিখিত পুস্তক পড়িতে পারেন না। কিন্তু এই প্রাচীন ইতিহাসের উদ্ধারব্রত যাঁহারা গ্রহণ করিবেন তাঁহাদের হস্তলিপি পাঠের দক্ষতা অর্জ্জন করা চাই।

বন্ধুগণ, বাংলার ইতিহাস সম্পর্কে এক বর্ণহীন চিত্র আমি আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত করিলাম। ইহাকে বিভিন্ন রাগ রঞ্জন দ্বারা চিত্রিত করিয়া এক মোহন মূর্ত্তিতে পরিণত করা আপনাদের কাজ। এইরূপে পূর্ব্ব ও পশ্চিম উভয় বাংলার গীতাদি সংগ্রহে ও উহা হইতে ঐতিহাসিক তথ্য নিরুপণে আপনাদিগকে চেষ্টিত হইতে হইবে। আপনারা জানেন বর্ত্তমানে রাজপুতনার যে ইংরেজী ইতিহাস লিখিত হইয়াছে উহা স্থানীয় গীতাদি হইতেই সংগৃহীত। বাংলার গানে দোস্তগাজি, কালুগাজি, মনোয়ার খাঁ ইত্যাদি নাম সুপরিচিত। এই সব গীত হইতে তাঁহাদের কর্ম্মজীবনের সন্ধান করিতে হইবে।

"রাত্রি ছোট আর কাহিনী দীর্ঘ"। এইবার অবসান করা হোক। আপনারা সর্ব্বান্তঃকরণে কাজে লাগুন এই আমার কামনা। আমরা বৃদ্ধেরা কিছু করিতে পারি নাই। আপনাদের যুবকদের দায়িত্ব তাই অনেক বেশি। "আগার পেদর না তাওয়ানদ পেসর তামাম কুনদ।"[২] আপনারা গৌরবান্বিত মুসলমান হউন এই প্রার্থনা করি।

আবতো জাতেহৈ বুতকদেসে মীর,
ফের মিলেঙ্গে আগার খোদা লায়ে।[৩]

অনুবাদ

১. সত্যিকার মানুষ হারিয়ে গেছে (দুর্লভ), খোদার রাজ্য পরিণত হয়েছে গাধার রাজ্যে।
২. পিতা কোনো কাজ সমাধা করতে না পারলে পুত্র তা সম্পন্ন করবে।
৩. মূর্তিখানা থেকে আমি চলে যাচ্ছি, খোদা চাইলে আবার দেখা হবে।

www.pathagar.com

ষষ্ঠ বার্ষিক অধিবেশনের অভ্যর্থনা-সভাপতির অভিভাষণ

আবুল হুসেন

সমবেত সুধিবৃন্দ,

"সাহিত্য-সমাজে"র সারথিরা আজ আপনাদের অভ্যর্থনা করবার ভার আমার উপর দিয়ে আমাকে গৌরবান্বিত করেছেন। সেজন্য আমি তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। কিন্তু সে-সম্মানের যথার্থ মর্যাদা রক্ষা করবার মত যোগ্যতা আমার নেই—তবু তাঁদের নির্দেশমত আপনাদের সশ্রদ্ধ সম্ভাষণ জ্ঞাপন করছি। আপনাদের মত সুধিবৃন্দের যোগ্য সম্ভাষণ ও অভ্যর্থনা করবার মত শক্তি ও আয়োজন আমাদের নাই। তবু জানি, এই অল্পসম্বল অপ্রাপ্তবয়স্ক প্রতিষ্ঠানটির প্রতি আপনাদের অকৃত্রিম স্নেহ ও দরদ আছে। সেই ভরসায় উৎসাহিত হয়ে আমরা আপনাদের আহ্বান করেছি। আপনারা দয়া ক'রে আপনাদের মূল্যবান সময় নষ্ট করে এসেছেন, এজন্য আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আশা করি আপনারা আমাদের সমস্ত দোষ-ত্রুটি স্নেহ-দৃষ্টিতে দেখবেন। তা'হলেই আমরা ধন্য হব—এই পর্যন্ত বললেই বোধ হয় অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির কাজ শেষ হয়ে যায়। কিন্তু "সাহিত্য-সমাজে"র সারথিরা চান যে, এই সুযোগে আমিও কিছু বলি। অপ্রাসঙ্গিক হলেও তাঁদের এই দাবীর পিছনে একটি অকৃত্রিম স্নেহ রয়েছে। সে স্নেহ উপেক্ষা করবার মত শক্তি আমার নেই।

ছয় বৎসর পূর্ব্বে এই সমাজের প্রথম বার্ষিক অধিবেশনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রদ্ধাস্পদ মিঃ এ. এফ. রহমান (মুসলিম হলের প্রথম প্রভোস্ট) বলেছিলেন, "মুসলিম-সাহিত্য-সমাজ একটা নূতন উদ্যম—আমাদের সমাজের নূতন জাগরণের একটা সামান্য চিহ্ন। ... সাহিত্য চর্চ্চার এই ক্ষীণ ধারাটুকু যাতে স্রোতে পরিণত হয় সেজন্য এই বার্ষিক সম্মেলনের সৃষ্টি। আপনাদের ন্যায় সাহিত্যানুরাগীদের শুভদৃষ্টি থাকলেই আমাদের সব আশা সফল হবে।"

ছয় বৎসর পর তাঁরই স্থানে দাঁড়িয়ে আজ আমিও তাঁর কথার সমর্থন করি। এই "সাহিত্য-সমাজ" বঙ্গীয় মুসলমান সমাজে এক নবযুগের সূচনা করেছে তাতে সন্দেহ নাই।

সাহিত্য সমাজ ও জাতিকে উন্নত করে—স্বদেশে বিদেশে তার গৌরব বাড়ায়, দীনতাকে ধ্বংস ক'রে অজস্র প্রতিপত্তি ও সম্মানের পথ উন্মুক্ত করে। এক কথায়, সাহিত্য সমাজ জাতি বা দেশের জীবনের প্রাচুর্যের প্রমাণ। যে জাতির সাহিত্য নাই, সে জাতি মৃত। সাহিত্যের উৎস প্রাণময় জীবন। যে জাতির প্রাণ নাই, জীবনের স্পন্দন নাই, সে জাতির সাহিত্য নাই। বাঙ্গালার মুসলিম সমাজের অবস্থা মৃত জাতির অবস্থা। কোন দিকে যেন কোন সাড়া নাই, কোন স্পন্দন নাই।

ছয় বৎসর পূর্ব্বে এই জাতির ভবিষ্যৎ চিন্তা ক'রে স্নেহাস্পদ শ্রীমান আবদুল কাদির (বর্তমানে 'জয়তী'-সম্পাদক) প্রমুখ মুসলিম হলের ও তৎসংশ্লিষ্ট কতিপয় সাহিত্যপ্রাণ তরুণ

www.pathagar.com

১৯২৮ সনের ১৯শে জানুয়ারি শ্রদ্ধাভাজন ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সাহেবের পৌরোহিত্যে 'মুসলিম হল ইউনিয়ন রুমে' এই 'সাহিত্য-সমাজে'র ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তার ১১ দিন পর এই শিশু সমাজের জাতক্রিয়ার পৌরহিত্য করেছিলেন একজন কুলীন ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাস্পদ চারু বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়। মি. এ. এফ. রহমানের প্রভোষ্ট থাকাকাল পর্যন্ত এই শিশু সমাজে মুসলিম হল সূতিকাগারেই লালিত হতে থাকে। মি. রহমান সর্ব্বান্তঃকরণে এর শুভ কামনা করেছিলেন এবং যথেষ্ট সাহায্যও করেছিলেন। মুসলিম হলের বার্ষিক রির্পোটেও তিনি উল্লেখ করেছিলেন—"The literary movement has set in a new pulsation in life in the Hall." তিনি এই সমাজের প্রয়োজন ও ভবিষ্যৎ সম্যক উপলব্ধি করেই এর শ্রীবৃদ্ধির জন্য যথেষ্ট চেষ্টা ও যত্ন করেছিলেন।

কিন্তু সকল শুভ কাজেই পর্ব্বতপ্রমাণ বাধা উপস্থিত হয়। মি. রহমানের ঢাকা ত্যাগ করার পর মুসলিম হলে নূতন যুগ শুরু হয়। সাহিত্য-সমাজের সারথিরা মুসলমান জাতির ও ধর্ম্মের শত্রু ও এর ভাষা ও চিন্তাধারা অহিতকর বিষ ব'লে বিবেচিত হল। পূর্ব্বে মুসলিম হলে এর সাময়িক অধিবেশন হ'ত। সেটা ordinance দ্বারা বন্ধ ক'রে দেওয়া হল। তরুণ "সাহিত্য-সমাজে"র সারথিরা ঢাকা হলের কর্তৃপক্ষের শরণাপন্ন হয়ে Lytton Hall-এ সাময়িক অধিবেশন করবার অনুমতি পান। তারপর জগন্নাথ হলের ও ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজের কর্তৃপক্ষগণও "সাহিত্য-সমাজ"কে প্রভূত সাহায্য করেছেন। সেজন্য তাঁদের নিকট আমরা চিরকৃতজ্ঞ। এইরূপে সাহিত্য-সমাজ স্বীয় জন্মস্থান হতে বহিষ্কৃত হয়ে আজও পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই সভাগৃহই তার প্রমাণ।

আজ আমি এই একটি প্রশ্ন আপনাদের বিচার করতে অনুরোধ করব—"মুসলিম সাহিত্য-সমাজ কি বাস্তবিক মুসলিম সমাজের শত্রু? তার চিন্তা ও ভাষা কি সে-সমাজের পক্ষে বাস্তবিকই অহিতকর বিষ?" এই প্রশ্নের সমাধান আপনারা করুন। আমি এই সমাজের সার্থকতা সম্পর্কে কয়েকটি বিষয়ে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করব এবং এই সমাজের ভবিষ্যৎ স্বপ্ন কি তারই ইঙ্গিত ক'রেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করব। জনাব সভাপতি খান বাহাদুর কমরুদ্দিন সাহেব তাঁর জীবন-সমস্যার সমাধান আপনাদের শোনাবেন। সে অমৃত হতে আপনাদের আমি বেশীক্ষণ বঞ্চিত রাখতে চাই না।

এই সমাজের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে 'চিন্তা-চর্চ্চা'। মানুষের জীবন নিয়ত গতিশীল ও পরিবর্তনপ্রিয়। চিন্তা সেই গতির অগ্রদূত। বাঙ্গলার মুসলমান সমাজে জীবন-স্রোত রুদ্ধ। সেই জীবন সক্রিয় ও গতিশীল করতে হলে চিন্তা-চর্চার প্রয়োজন। এই চিন্তাই সাহিত্যের পরিপুষ্টি সাধন করবে। সাহিত্য সৃষ্টি হলেই সমাজের কর্ম্মধারা চারদিকে উৎসারিত হবে।

গত ছয় বৎসর এই সমাজে চিন্তা-চর্চা হয়েছে। 'শতকরা পঁয়তাল্লিশ' হতে মিশ্র নির্ব্বাচন পর্যন্ত কোন বিষয়েই এই সমাজ আলোচনা করতে ভীত বা কুণ্ঠিত হয় নাই। আপনারা মেহেরবাণী করে যদি সমাজের পাঁচ বৎসরের বার্ষিক 'শিখা' পড়েন তা হলেই বুঝতে পারবেন যে, এই সমাজ জীবনকে seriously নিয়েছে—জমিজেরাৎ ঘরবাড়ি বন্ধক রেখে, ঘোড়দৌড় খেলে ও পোলাও কোর্ম্মা খেয়েই জীবন ফুৎকারে উড়িয়ে দিতে চায় না। সমাজের গতি ফিরাবার জন্য যে সমস্ত সমস্যার আলোচনা করা আবশ্যক, প্রথম বার্ষিক অধিবেশনেই তা করা হয়েছে। চাকুরীতে শতকরা পঁয়তাল্লিশের ব্যবস্থা ক'রে মুসলিম সমাজের যে সর্ব্বনাশ করা হয়েছে তা এই সমাজ চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে, মাদ্রাসা শিক্ষায় যে

www.pathagar.com

মুসলমানের উন্নতির পথ রুদ্ধ হয়েছে তা জোর গলায় এই সমাজ বলেছে। হিন্দু-মুসলমান মিলন যে অনিবার্য ও অত্যাবশ্যক তা উপলব্ধি করে এই সমাজ তা প্রচার করেছে এবং চর্চ্চাও করেছে—মোশায়েরা, সাময়িক অধিবেশন ও বার্ষিক সম্মেলনের মিলন-উৎসব তারই প্রমাণ। মিশ্র-নির্ব্বাচনে যে মুসলমান-সমাজের কল্যাণ হবে সে কথা এই সমাজ প্রচার করেছে। যুবকদের প্রাণে উৎসাহ ও উচ্চ আদর্শের নেশা সৃষ্টি করবার জন্য এই সমাজের সারথিরা ধীরে ধীরে যথেষ্ট চেষ্টা করছেন। তার ফল বাঙ্গালার সর্ব্বত্র মুসলমান যুবকদের জীবনে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। সঙ্গীত, চিত্র প্রভৃতি ললিত কলার প্রতি ঔদাসীন্য জাতির সহজ বিকাশ ও স্ফূর্তির পক্ষে মারাত্মক, সে-কথাও এই সমাজ ঘোষণা করেছে। সুদ-সমস্যার আলোচনা করে সমাজের ধর্ম্মযাজকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। ধর্ম্মবিশ্বাসকে সক্রিয় করবার জন্য সৎকাজের (আমাল্‌স সালেহা-র) উপর এবং বেহেশতের চেয়ে 'তাখল্লাকু বিআখ্‌লাকিল্লাহ্' (আল্লার গুণে গুণান্বিত হও) এই creative ideal-এর উপর জোর দেওয়া হয়েছে। 'ধর্ম্ম শিক্ষার আগে শিক্ষা চাই'—এই-ই এই সমাজের দাবী। ইসলামিয়া কলেজ প্রতিষ্ঠা মুসলিম সমাজের অগ্রগতির পরিপন্থী ব'লে এই সমাজ মুসলিম নেতৃবৃন্দকে সতর্ক করেছে।

এই ছয় বৎসর যাবত এই সমস্ত আলোচনা করে সমাজের জীবনধারা পরিবর্তন করতে এই সমাজ চেষ্টা করেছে। তার ফলে আজ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন—মৌঃ ফজলল হক সাহেবও সেদিন মুসলিম ইনস্টিটিউটের বক্তৃতায় ইসলামিয়া কলেজের প্রতি অসন্তুষ্টি ও আপত্তি জানিয়েছেন। মাদ্রাসা শিক্ষার আমূল সংস্কার করবার জন্য কমিটি বসেছে এবং বহু মাদ্রাসার শিক্ষক এই শিক্ষার বিরোধী হয়েছেন। শতকরা পঁয়তাল্লিশের অপকারিতাও এখন যুবকগণ উপলব্ধি করেছেন। সঙ্গিত ও চিত্র যে ইসলাম ধর্ম্মে হারাম নয়, তা প্রতিপন্ন করবার জন্য মৌলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ ধর্ম্মশাস্ত্র ransack ক'রে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সন্দর্ভ লিখেছেন।

সুতরাং "মুসলিম সাহিত্য-সমাজ" এই ছয় বৎসরের মধ্যে যা করেছে তাতে তার সারথিদের লজ্জার বিশেষ কারণ নাই, কিংবা মুসলমান সমাজের পক্ষেও তা অহিতকর নয়।

একটি প্রতিষ্ঠানের পূর্ণ বিকাশের পক্ষে ছয় বৎসর অতি সামান্য সময়। বিশেষতঃ এই ছয় বৎসরের মধ্যে এই সমাজ উৎসাহ স্থলে পেয়েছে তিরস্কার, সাহায্য স্থলে পেয়েছে গালি। যাঁরা সাহায্য করেছেন তাঁদেরও অনেকে প্রকাশ্যে সাহায্য করতে সাহসী হন নাই। তবু আমি আনন্দের সাথে ঘোষণা করছি যে, যাঁরা এই সমাজের পৃষ্ঠপোষক তাঁদের সংখ্যা নেহাৎ কম নয়। তাঁরা সংঘবদ্ধ হয়ে দাঁড়ালে সমাজের ভবিষ্যৎ যে উজ্জ্বল হবে সে বিষয়ে ভবিষ্যদ্‌বাণী করা কিছুমাত্র কঠিন নয়।

সমাজের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণকে সাহিত্যক্ষেত্রে টেনে আনা এই "সাহিত্য-সমাজে"র আর একটি উদ্দেশ্য। তাতেও এই 'সমাজ' অনেকখানি কৃতকার্য হয়েছে। খান বাহাদুর তসদ্দক আহমদ হতে খান বাহাদুর কমরুদ্দিন আহমদ সাহেব পর্যন্ত বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতিগণ ভিতরে ভিতরে চিন্তাশীল ও কর্মী ছিলেন, কিন্তু তাঁরা তাঁদের চিন্তা ভাষা দিয়ে ব্যক্ত করতে কুণ্ঠিত ও লাজুক ছিলেন। এই সমাজের জবরদস্তীতে তাঁরা তাঁদের বুক খুলেছেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের মুখও খুলেছে—লেখনীও চলেছে। 'সাহিত্য-সমাজে"র চেষ্টা না

www.pathagar.com

হলে এঁরা কখনই লেখনী ধরতেন না। এ বাহাদুরীটার গর্ব্ব "সাহিত্য-সমাজ" আর কাউকে দিতে রাজী হবে না। সমাজের প্রবীণেরা তাঁদের অভিজ্ঞতা যদি লিপিবদ্ধ করেন তা হলেই ত সাহিত্যের ভিত্তি পত্তন হতে পারে। এইজন্য "সাহিত্য-সমাজে"র প্রধান চেষ্টা হয়েছে এই সমস্ত প্রবীণকে discover করা এবং তাঁদের লজ্জা ভেঙ্গে দেওয়া। হাকিম হবিবুর রহমান সাহেব গত বৎসর যে research-এর জন্য আহ্বান করেছিলেন তাও এই সমাজের উদ্দেশ্যসম্মত। কিন্তু সেজন্য যে মালমশলার দরকার তার অভাব ব'লেই সে-কাজে হাত দিতে দেরী হচ্ছে। ভবিষ্যতে 'সমাজ' সেই সেই কাজে হাত দেবে। মুসলমান সমাজের ইতিহাস, আইন, সাহিত্য অতীতে কি ছিল সেটা রীতিমত আলোচনা করা দরকার। সেজন্য চাই একটি Academy ও কতকগুলি leisured scholars, যাঁদের 'অদ্যভক্ষ্য ধনুর্গুণ' অবস্থা Academy দূর করবার ভার নেবেন। সেটা সহজসাধ্য হবে যদি আবশ্যক অর্থ পাওয়া যায়। কিন্তু এই সমাজেই যখন 'অদ্যভক্ষ্য ধনুর্গুণ' অবস্থা, তখন সে-কাজে কি ক'রে সত্বর হাত দেওয়া যায়। পরিতাপ করে আর কি হবে, আমাদের সমাজে এ বিষয়ে দান করবার মত ইচ্ছা ও প্রবৃত্তি আদৌ নাই বললেই চলে।

আপনাদের আর বেশীক্ষণ ধৈর্য্য পরীক্ষা করব না। আপনারা মেহেরবাণী ক'রে এসেছেন সেজন্য আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আপনাদের স্নেহ ও আশীর্বাদ এই সমাজের পাথেয়। পথ দীর্ঘ, সম্বল নাস্তি—তবু চলতে হবে।

স্বাগত সুধীজন। স্বাগত মাতৃভাষার সেবকবৃন্দ।

www.pathagar.com

ষষ্ঠ বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতির অভিভাষণ

খান বাহাদুর কমরুদ্দিন আহমদ

জগৎ স্রষ্টার সৃষ্টি-বৈচিত্র্য যদি উদ্দেশ্যময় হয় তবে জগৎবাসী জীবমাত্রেরই জীবন ধারণের প্রয়োজন আছে। দার্শনিকগণ বলেন যে, মনুষ্যেতর জীব প্রকৃতিদত্ত স্বাভাবিক বুদ্ধি বলে পরিচালিত হইয়াই কার্য্য করিয়া থাকে, আর মানুষ তাহার ইচ্ছাশক্তি দ্বারা কর্ম্মশক্তি নিয়ন্ত্রিত করিয়া জীবন ধারণ করে। এই জন্যই দেহধারী মানব কিভাবে কি উপায়ে জীবন ধারণ করিয়া স্রষ্টার মহিমা প্রচার করিতে সমর্থ হইবে, এই সমস্যা চিরদিন তাহারা অন্তর্বিকশিত জ্ঞান দ্বারা বিচার করিয়া সমাধান করিয়াছে। কিভাবে দেহ রক্ষা করিতে হইবে, কেমনে মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া মানুষের ন্যায় জীবন ধারণ করা সম্ভব হইবে,—এই সমস্যা সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে মানবমাত্রকেই বিব্রত করিয়াছে।

আমাদের দেশ লইয়াই আমি কথা বলিব। এই সোনার দেশে আসিয়া অপর দেশের লোক তাহাদের জীবন-সমস্যার সমাধান করিতেছে। আর আমরা এদেশেরই সন্তান হইয়া এমনভাবে পদদলিত নির্জীত ও মৃতপ্রায় হইয়া আছি! অবস্থা-বিপর্যয়ের নিমিত্ত আমরাই দায়ী। এই সমস্যার সমাধান আমাদেরই হাতে।

জীবন-সমস্যা হজরতের জীবনেও উপস্থিত হইয়াছিল অতি ভীষণ ভাবে। জগতের কল্যাণের জন্য চল্লিশ বৎসর ব্যাপী তাঁহাকে কঠোর তপস্যায় লিপ্ত থাকিতে হইয়াছিল। এই দীর্ঘকালব্যাপী সাধনায় তাহার নিজ জীবনের সমস্যা পূরণ হইয়াছিল, এবং বিশ্বমানবের কল্যাণের জন্য তিনি তাঁহার সাধনা-লব্ধ জ্ঞানসমষ্টি কোরানরূপে জগতে প্রচার করিয়াছিলেন। আমাদের মতো তিনিও অভাবগ্রস্ত ছিলেন, আমাদের মতো তিনিও বিপন্ন ও 'ভ্রান্ত' হইয়াছিলেন।

প্রত্যেক আইনের ও শাসন-বিধির এক একটি মূল নীতি আছে। Equity-র মূল নীতি : He who seeks equity must do equity. এই নীতির সার আর কিছুই নহে,—ইহা কেবল মাত্র আল্লার উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস এবং তাঁহার কার্য্যের জন্য অর্থাৎ প্রতিপালনের জন্য তাঁহার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়া আত্মশক্তির সাধনা,—এই সাধনা বলেই আমরা নিজেকে ও জগৎকে সাধ্যানুসারে প্রতিপালন করিতে পারি। ইহার নামই—Live and let live. এইটী প্রকৃতই ঐশ্বরিক ভাব, কারণ God exists and let others enist. রসুল এই জন্যই বলিয়াছেন : আল্লার মতো চরিত্র গঠন করো।

আত্মরক্ষার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি প্রত্যেক প্রাণীরই প্রকৃতিগত ধর্ম্ম। ইহাকেই বলে instinct of self—preservation. মানুষও একটি জীব, সুতরাং মানুষেরও এই জীব ধর্ম্ম আছে। ধর্ম্মের অনুশাসন মানিয়া উন্নতি লাভ করিতে চাই বটে ; কিন্তু তাহা দ্বারা প্রকৃত জীব ধর্ম্ম রক্ষা হয় কিনা সন্দেহজনক। কিন্তু মানবের সর্ব্বপ্রকার উন্নতির মূলে যে একমাত্র তাহার

www.pathagar.com

প্রকৃতিগত ধর্ম্ম instinct of self preservation বর্ত্তমান, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

এখন কথা হইতেছে, আমাকে রক্ষা করা যেমন আমার কাজ, অপরেরও তেমন তাহার নিজেকে রক্ষা করিবার অধিকার আছে। কাজেই সমস্যা হইতেছে, যদি প্রত্যেকেই নিজকে রক্ষা করিতে যাইয়া অপরের আত্মরক্ষার অধিকার অক্ষুণ্ন না রাখিতে পারে, একের সহিত যদি অন্যের স্বার্থের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়, তবে ত পৃথিবীর দ্বন্দ্ব-কোলাহলের আর অবসান হইবে না। কাজেই নিজের সহিত যতদূর সাধ্য অপরকেও রক্ষা করাই বিধিসঙ্গত—যতক্ষণ সাধ্যের অতীত না হয় ততক্ষণ আমাদিগকে এই নীতিই মানিয়া চলিতে হইবে। সমাজ এত ওতপ্রোতভাবে জড়িত যে অন্যকে নষ্ট করিয়া স্বকীয় স্বার্থ সাময়িকভাবে উদ্ধার হইলেও শেষ পর্য্যন্ত ধ্বংস অনিবার্য্য। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বর্ত্তমান বিশ্বব্যাপী অর্থসঙ্কট এবং জীবন-সমস্যা উল্লেখ করা যাইতে পারে। —একটী জাতিকে গত মহাযুদ্ধের সময় বিনাশ করিতে যাইয়া যুদ্ধব্যাপৃত সকল জাতিই বলক্ষয়ে অবসন্ন হইয়া আজ এই বিশ্বব্যাপী অর্থসঙ্কটের সৃষ্টি করিয়াছে। যে দেশের অর্থসম্পদ অতুলনীয় তাহারও যেরূপ বেকার-সমস্যা ও দেউলিয়া ব্যাঙ্কের প্রাদুর্ভাব যাহার ঘরে অর্থ নাই তাহারও সেই একই অবস্থা। দেখা যাইতেছে যে, live and let live-নীতি প্রকৃতিগত ধর্ম্ম।

নিরাময়-ভাবে জীবন রক্ষা করা প্রকৃতিগত ধর্ম্ম। এখন কথা হইতেছে, জীবন রক্ষা করিতে হইলে লোকের খাওয়া পরার আবশ্যক, এবং খাইতে পরিতে হইলে লোকের উপার্জ্জনের প্রয়োজন। মানুষ তিন প্রকারে অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারে। প্রথম উপায় সেবা, দ্বিতীয় চৌর্য্যবৃত্তি এবং তৃতীয় উপায় ভিক্ষা। প্রথম উপায়ই সর্ব্বতোভাবে উৎকৃষ্ট। দ্বিতীয় উপায় অবলম্বনে জীবন রক্ষা না হইয়া জীবন ধ্বংসই হইয়া থাকে—নৈতিক অবনতি ঘটে এবং পরিণামে চৌর্য্য অপরাধে রাজদ্বারে দণ্ডিত হইতে হয়। আর ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন দ্বারা অর্থোপার্জ্জন কোনও আত্মসম্মানবিশিষ্ট ব্যক্তি করিতে চাহে না। দুঃখের বিষয়, এই ভিক্ষাবৃত্তিই বিভিন্ন আকারে আমাদের এই হতভাগ্য দেশে উপার্জ্জনের একটী সম্মানজনক পন্থা বলিয়া পরিগণিত হইতেছে। এই প্রকারের আপাতঃ সুন্দর ভিক্ষাবৃত্তিধারী নেতা ও উপদেষ্টা-সকল আমাদের সমাজের নমস্য ও পূজনীয় হইয়া আমাদের সেবায় ও অর্থে স্বকীয় স্বার্থসিদ্ধি ও উদরপূর্ত্তি করিতেছে মাত্র। ইহারা উপদেষ্টার আসন গ্রহন করায় আমরা আদর্শ ভ্রষ্ট হইয়া দিন দিন অধঃপতিত হইতেছি। কাজেই নিকৃষ্টবৃত্তি চৌর্য্য ও ভিক্ষা মনুষ্য-সমাজের গ্লানিজনক। সর্ব্বোৎকৃষ্ট সেবাবৃত্তিই মানবের আদরণীয়।

সেবার প্রেরণায়ই মানব আধুনিক বৈজ্ঞানিক উন্নতি করিতে সমর্থ হইয়াছে। সে ব্যক্তি তত উন্নত যে যত বেশী লোকের সেবায় নিজেকে নিয়োগ করিতে পারিয়াছে; সেই জাতিই উন্নতিশীল যে আপনার সেবার মহিমায় অন্যের অভাব-অভিযোগের সমাধানে সমর্থ হইয়াছে। বেতার-যন্ত্র উড়োজাহাজ ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার—আজ যাহা জগৎবাসীর বিস্ময় উৎপাদন করিতেছে তাহা সকলই কি এই সেবার প্রেরণার ফল নয়?

আত্মশক্তির সাধনা করিতে হইবে, চিন্তা করিতে হইবে, এবং অনুভূতি ও প্রেরণার দ্বারা প্রকৃতির অনন্ত জ্ঞান ভাণ্ডারের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিতে হইবে। তখনই আমরা অনুভব করিতে পারিব যে, আমাদের জীবন-মরণ সমস্যার সমাধান হইয়াছে এবং আমরা সিদ্ধিলাভ

www.pathagar.com

have no thoughts and feellings at all." নদী বিভিন্ন পথগামিনী হইলেও পরিশেষে সাগরেই নিপতিত হয়। মাইকেল মধুসূদন যে হিন্দু ধর্ম্ম একেবারেই পরিত্যাগ করিয়াছিলেন তা'তে বঙ্গ সাহিত্যের আসর হইতে তাঁর নাম খারিজ হয় নাই। দেশের গগনে পবনে যে নব জাগরণের সাড়া বাজিতেছে, আমরা যদি তার স্পন্দন প্রাণে অনুভব করি এবং নিজ নিজ শক্তি সংযত সংহত করিয়া সমাজের মঙ্গলব্রতে নিয়োজিত করি তবেই যথার্থ কাজ করা হইল। হউক আমার পরিধানে আচকান বা কোট তাতে কিছু আসিয়া যায় না। আন্দোলনকে প্রাণবন্ত করিতে পারিলেই তবে তার সার্থকতা আসে। এক সময় ভারতীয় প্রভাব যখন প্রাণবন্ত ছিল তখন মধ্য এবং নিকট এসিয়ার অনেক জাতি তার সংস্পর্শে আসিয়া দেখিতে দেখিতে অনেক শিল্প ও কলা সম্পদে আশ্চর্যরূপে চরিতার্থ হইয়াছিল। তাতে এসিয়ায় আরম্ভ হইয়াছিল এক নব জাগরণ। নব জাগরণের প্রভাবে দেশের সুপ্ত প্রাণশক্তি যখন উদ্বুদ্ধ হয়, তখন জাতি শত বর্ষের উন্নতি শত মাসেই আয়ত্ত করিয়া ফেলে। আমরা দেখিয়াছি বাংলা সাহিত্যে এমনই এক প্রাণশক্তির জাগরণ চৈতন্যদেবের আবির্ভাবে। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন বাংলার সুপ্ত প্রাণ তখন এমন ভাবেই জাগিয়াছিল যে আনন্দ ও ভাবের এক অপূর্ব্ব স্ফূরণ প্রবলবেগে বাংলা সাহিত্যকে এমনতর যায়গায় উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছিল যে যাহা পূর্ব্বাপরের সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে খাপছাড়া মনে হয়। তার ভাষা, ছন্দ, ভাব, উপমা ও আবেগের প্রবলতা সমস্তই বিচিত্র ও নূতন। তার পূর্ব্ববর্তী বঙ্গভাষা ও বঙ্গসাহিত্যের সমস্ত দীনতা কেমন করিয়া এক মুহূর্তে দূর হইল, দেশ আপনার বীণায় আপনি সুর বাঁধিয়া গান ধরিল।

কিছুদিন হইতে বাঙ্গালী মুসলমানদের যে সকল লেখা প্রকাশ হইতেছে তাতে মনে হয় এদের ভিতর জাগরণ আরম্ভ হইয়াছে। শতবর্ষ পূর্ব্বে পশ্চিমের সাহিত্যের সংস্পর্শে বাংলার হিন্দু সমাজে যে প্রকার ভাব-তরঙ্গের আবির্ভাব হইয়াছিল ইংরাজী সাহিত্য এবং আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সংস্পর্শে আজ বাঙ্গালী মুসলমানের ভিতরেও তদ্রূপ নব নব চিন্তাধারার সূচনা হইয়াছে। বাংলার সেই প্রথম ভাব-তরঙ্গের সংঘাতে দেশের পুরাতন শাস্ত্রানুগতিক সাহিত্যের রীতি পরিধি যখন ভাঙ্গিয়া গেল এবং নানা ভঙ্গীতে সে ভাবোচ্ছ্বাস আত্মপ্রকাশ করিতে লাগিল, সেই সময় বঙ্কিমচন্দ্রের মত প্রতিভার বিকাশ তদানীন্তন বাংলা সাহিত্যের পক্ষে পরম কল্যাণকর হইয়াছিল। তিনি সমস্ত বাংলা সাহিত্যকে সংহত সংযত করিয়া দেশকল্যাণব্রতী করিয়া তোলেন। দেশের সাহিত্যকে তাহার স্বজাতির সুখ দুঃখ ও আশা আকাঙ্ক্ষার মুখপাত্র করিয়া উহাকে প্রাণবন্ত করেন। তাঁহার প্রতিভাস্পর্শে বাঙ্গালী হিন্দু সমাজের চিন্তাধারা নূতন জীবন লাভ করিল। সীতারামের মুখে তিনি হিন্দুকে আত্মশক্তিতে সংস্থিত হইতে বলিলেন—আনন্দ মঠ ও দেবী চৌধুরানীর ভিতর দিয়া দেশমাতৃকার উপাসনা শুনাইলেন। গীতার শিক্ষাকে দৈনন্দিন কর্ম্মের ভিতর দিয়া কি করিয়া জীবন্ত করিয়া তোলা যায় তাহা দেখাইলেন। প্রফুল্ল, দিবা, নিশি, শ্রী ইত্যাদি সাধারণ নারী চরিত্রের ভিতর শক্তি ও মহিমার সন্নিবেশ দ্বারা জাতির প্রতি বাঙ্গালীদের শ্রদ্ধাসম্পন্ন করিলেন। এইরূপে তিনি সাহিত্যকে নিজেদের জাতীয়তার আদর্শে শক্তিশালী করিয়া তুলিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গভাষার যে উৎকর্ষ সাধন করেন তাঁহার পরবর্তী মনীষীরা সে উন্নতির স্রোতকে অক্ষুণ্ন রাখিয়াছেন এবং উহাতে নানা বৈচিত্র্য সাধিত করিয়াছেন। আমাদের মুসলিম সমাজে আজিও তেমন প্রতিভার উদ্ভব হইল না। কাব্যক্ষেত্রে নজরুল ইসলাম অবশ্য বিধাতার এক অপূর্ব্ব

www.pathagar.com

জঞ্জাল সরাইয়া কিরূপে ইসলামকে পুনরায় সেই আদিম গৌরবের অবস্থায় পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা যায় ইহাই তাঁহার প্রধান চিন্তার বিষয়। কিন্তু সুদীর্ঘ তেরশত বৎসরে ইসলামের Super growth ও মূলসূত্রগুলি এমনই জড়াইয়া গিয়াছে যে একটিকে সরাইয়া অন্যটি রক্ষা করা theoryতে সম্ভবপর হইলেও practice-এ হয়ত সম্ভবপর নয়। তাই স্বয়ং ইকবালও তুর্কীর অভিনব সংস্কার পন্থাকে উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন—

Muslims were mechanically repeating old values whereas the Turk is on the way to creating new values. To her the growing complexities of a mobile and broadening life are sure to bring new situations suggesting new points of view and necessitating fresh interpretations of principles which are only of an academic interest to a people who have never experienced the joy of a spiritual expansion.—Iqbal

অধুনা তরুণদের ভিতরে কামালের মতের পরিপোষক সংখ্যায় নিতান্ত অল্প নহে। কামাল শক্তির উপাসক। ইসলামের প্রবর্ত্তিত master-morality পারস্য বিজয়ের পর তত্রত্য ভাব-তান্ত্রিকতার সংস্পর্শে গিয়া যে দুর্ব্বলতা আহরণ করে এবং তার ফলে ক্রমশঃ ইসলামে যে slave-morality অনুপ্রবিষ্ট হয় কামাল তাঁর লৌহহস্তে তাহার মূলচ্ছেদ করিতে ব্রতী। দারিদ্র্যই জীবনের শ্রেষ্ঠ কাম্য, ধনীরা এবং শক্তিমানেরা কখন স্বর্গে যাইতে পারিবে না, দরিদ্র এবং নির্য্যাতিত যারা তাহারাই বিধাতার প্রিয়পাত্র, "To be rich and mighty is the same thing as to be evil and godless" এই যে, নিদারুণ শিক্ষা, ফ্রেডারিক নিট্‌শের মতে ইহাই হইল "moral slave-revolt, from the consequence of which our culture even yet suffers." এই শিক্ষা মানুষকে ভাবিতে শিখায় যে তাহারা যেন জগতে শুধু হুকুম তামিল করিতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছে ("born to slavery")। এদের এই নৈতিক অধঃপতন দেখিয়া মর্ম্মাহত হইয়াই নিট্‌শে চাহিয়াছিলেন নীতিশাস্ত্র হইতে নীতিসূক্তগুলি নির্ব্বাসিত করিতে ("To remove morals out of morality")। নিট্‌শের শিষ্য সকল দিক দিয়া না হইলেও সম্ভবতঃ শক্তিমান কামাল ইসলাম হইতে slave-morality দূরীভূত করিয়া উহাতে পুনরায় master-morality নীতি প্রবর্ত্তিত করিতে চাহিতেছেন। জাতি কিরূপে শক্তিশালী হইয়া আপনার জীবনযাত্রা আপনি নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে এবং একটা সুন্দর সুষ্ঠু ও উন্নত জীবন যাপন করিতে পারে ইহাই তাঁহার লক্ষ্য।

কেহ যদি স্যার ইকবালের মত গ্রহণ করিয়া radical ইস্‌লাম প্রবর্ত্তন করিতে চান তিনি তা করুন। কেহ যদি কামালের মতানুবর্ত্তী হইয়া reformed মুসলিম ইহাতে চান তিনি তা হউন। কেহ যদি নিট্‌শের শিষ্য হইয়া যাবতীয় Superman এর বিরুদ্ধে লড়িতে চান, লড়ুন। মহান্ ইস্‌লাম তাহাতে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে না। যতদিন মহাকালেমা তৌহিদ আমাদের অন্তরে স্বীকৃত হইবে, ততদিন ইসলামের ভিত্তি অটুটই থাকিবে। যে যে পথে চলিয়া সম্মুখের আসনে যাইতে পারিবেন বলিয়া নিশ্চয় বিশ্বাস করেন, তিনি সেই পথেই অগ্রসর হউন। যদি আপনার ইচ্ছা থাকে হজক্ষেত্রে উপনীত হইবেন, মিশর হইয়া আসুন অথবা কাবুলের পথে যান, মক্‌কার মহাময়দানে পৌঁছিবেনই। আসল কথা হইতেছে প্রত্যেকের ব্যক্তিত্বকে ষোল আনা ফুটাইয়া তুলিতে হইবে ব্যক্তিগত মত যার যাহাই থাকুক না কেন। যদি সকলের উদ্দেশ্য হয় একই মঙ্গলের দিকে তবে ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য আমাদের ভিতরে কলহ না আনিয়া বৈচিত্র্য ও নব নব সম্ভাবনারই সূচনা করিবে। দার্শনিক Hobbes বলিয়াছেন—"To have a succession of identical thoughts and feelings is to

www.pathagar.com

হয় প্রকৃতি তার চিরনবীন বিচিত্র কাব্যখানি পল্লীবাসীদের সম্মুখে সানন্দে মেলিয়া ধরিয়াছে। মুক্ত মাঠে বা নরীব বুকে অবস্থিত মানুষের অন্তরের গোপন কোঠা হইতে তখন অজ্ঞাতসারেই যেন গানের চরণ ধ্বনিয়া উঠে। আমাদের তরুণ সমাজের কাজ হইবে এই অবাঁধা বীণায় সুর দেওয়া। এই মূকদের বুকের ভাষা জাগাইয়া তোলা।

হিন্দু সমাজের পুরুষ ও নারী উভয়েরই সাহিত্যের সঙ্গে সংস্রব আছে। বাংলা সাহিত্যে হিন্দু রমণীর দান সামান্য নহে। কিন্তু আমাদের মুসলমানদের ভিতর দুইচারজন মহিলা ব্যতীত একরূপ সমগ্র নারী-সমাজই সাহিত্য ক্ষেত্র হইতে দূরে রহিয়াছেন। মোগলযুগে পুরুষেরা বাহুবলের চর্চ্চাই বেশী পছন্দ করিলেও ঘরে ঘরে রমণীরা পার্শী সাহিত্যের চর্চ্চা করিতেন। অধুনা বহু বিদূষী মুসলিম লেখিকার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে যাঁহারা মোগলযুগে শুধু কাব্যচর্চ্চা করিয়াছেন এমন নয়, যাঁহাদের লিখিত কাব্য পর্য্যন্তও দৃষ্ট হয়। বর্ত্তমান যুগে মাসিকপত্রের সম্পাদকেরাই প্রধানতঃ সাহিত্যিকার সৃষ্টি করেন। মোসলেম ভারত, সওগাত, মোহাম্মদী ইত্যাদি পত্রিকাসম্পাদকেরা বহু চেষ্টায় কতিপয় মুসলিম লেখিকার আবিষ্কার করিয়াছিলেন। ইঁহাদের তাড়না ব্যতীত ঐ সকল রমণীর অনেকেই হয়ত লেখনী ধারণ করিতেন না। সম্ভবতঃ পুণ্যস্মৃতি মিসেস আর, এস, হোসেনই এই সকল লেখিকার অগ্রণী। অধুনা এক মুসলিম মহিলা একখানি উচ্চাঙ্গের ত্রৈমাসিক পত্রিকার সম্পাদনে হস্তক্ষেপ করিয়া আমাদের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছেন। কিন্তু কত মুষ্টিমেয় এই নারী লেখিকার দল! মুসলিম শিশুরা যতদিন না মাতৃস্তন্যের ক্ষীরধারার সহিত সাহিত্যেরস পান করিতে থাকিবে ততদিন হয়ত পূর্ণাঙ্গ সাহিত্যিক আমাদের ঘরে দেখিতে পাইব না। এ প্রসঙ্গে কেহ কেহ হয়ত বলিবেন, পর্দ্দাপ্রথাই আমাদের রমণীগণকে গৃহকোণে বন্দিনী রাখিয়া তাঁহাদের সকল শক্তিকে পঙ্গু করিয়া রাখিয়াছে। কথাটা তর্কের বিষয়ীভূত। আমার মনে হয় এ লইয়া বেশী মাথা ঘামান আবশ্যক করে না। কারণ শিক্ষা-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গেই পর্দ্দা অপসারিত হয়; যেমন জগতের মুখ হইতে অন্ধকারের আবরণ উঠিয়া যায় সূর্য্য কিরণের প্রকাশে। শিক্ষাই হইল প্রধান কথা।

শিক্ষিত বাঙ্গালী মুসলমান যে সাহিত্যের দিক দিয়া আপনার দৈন্য ও দুরবস্থা বুঝিতে না পারিয়াছে এমন নহে। ব্যাধি যখন সঙ্কট অবস্থায় পৌঁছে তখন যেমন কেহ বলেন কবিরাজ ডাক; কেহ বলেন ডাক্তার ডাক, কেহ বলেন হাকিম ডাক, কেহ বা হোমিওপ্যাথেরও অনুসন্ধান করেন, আমাদের চিন্তানায়কগণও তেমনি কেহ বলিতেছেন, মাদ্রাসাগুলি উঠাইয়া দাও, কেহ বলিতেছেন টুপি আচকান ছাড়িয়া দাড়ি গোঁফ নির্ম্মূল করিয়া পণ্ডিতের দলে ভিড়িয়া যাও, কেহ বলিতেছেন, কামালের মত ইস্‌লামের কড়ি, বর্গা ছাদ হইতে আরম্ভ করিয়া দেয়াল ও ভিত্তি পর্য্যন্ত সব বদলাইয়া পশ্চিমের ছাঁচে ঢালাই কর, কেহ বলিতেছেন; হাদিস তফসীর ফেকা ওসুল সব বাদ দিয়া চল। কেহ বা কোরানের সার্ব্বভৌমত্ব ও প্রভুত্ব হইতে মানুষের চিত্তকে মুক্ত ও নির্ভয় করিবার জন্য উহাকে একখানি মূল্যবান গ্রন্থমাত্র বলিয়া প্রচার করিতে ইচ্ছুক। খোদা ও রসুলে অতিমাত্রায় নির্ভরশীলতাও অনেকে আমাদের মানসিক দৌর্ব্বল্যের কারণ বলিয়া মনে করেন। সকলেরই উদ্দেশ্য এক। মুসলমানকে এক ধাক্কায় আধুনিকতার সম্মুখে আসনে আগাইয়া দেওয়া। ইহাদের এক দলের চিন্তানায়ক মনস্বী ইকবাল। পশ্চিম ভারতের সীমান্ত হইতে উদাত্তকণ্ঠে দীর্ঘকাল তিনি ইস্‌লামের পুনর্গঠন সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছেন। মূলসূত্রগুলি ঠিক রাখিয়া শুধু Super growth-এর

www.pathagar.com

পারে নাই। চীন আরও পারে নাই। ভারতের ভিতরে অন্যান্য সম্প্রদায়ের তুলনায় বাঙ্গালী হিন্দুরা সমধিক আধুনিক ; আমরা বাঙ্গালী মুসলমান আজও অর্দ্ধ নিদ্রিত অবস্থায় বিরাজ করিতেছি। বাঙ্গালী হিন্দুর সাহিত্য আজ পাশ্চাত্য সাহিত্যের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে চাহিতেছে, আর বাঙ্গালী মুসলমান নিজের ঘরের জিনিষ ওমর খাইয়াম, হাফেজ ইত্যাদির রসাস্বাদনের জন্য কান্তিবাবু, নরেন্দ্রবাবু ইত্যাদির মুখাপেক্ষী হইয়া রহিয়াছে।

পশ্চিম ভারতের মুসলমানদের মাতৃভাষা উর্দ্দু এবং উর্দ্দুর চর্চ্চা তাঁরা আজীবন করেন ; তাই সেখানে মৌলানা শিবলী, গালেব, হালী, ইকবাল, প্রভৃতি খ্যাতনামা ব্যক্তির উদ্ভব হইয়াছে। বাংলার মুসলমানদের ভিতরে যাঁহারা পাঠান ও মোগল আমীর ওমরাহ বা মুসলমানগণের বংশসম্ভূত তাঁহাদের অনকেরই ঘরে এখনও উর্দ্দুভাষা প্রচলিত। অথচ সে উর্দ্দুর মর্য্যাদা তাঁহাদের প্রতিবেশী বঙ্গভাষা–ভাষিগণ কিছুই অনুভব করেন না। কাজেই যে সকল পরিবার এককালে মর্য্যাদা সম্পন্ন ছিল এবং কালচারের কেন্দ্র ছিল সেগুলি বঙ্গদেশে একরূপ নির্ব্বাক হইয়া গিয়াছে। আবার দেশে যাঁহারা আরবী পার্শীতে উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়া নিজদিগকে ইসলামের স্তম্ভ–স্বরূপ বিবেচনা করেন তাঁহারাও ইসলামী অতীত রীতির প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ উর্দ্দুতেই জবান খুলিতে অধিক ব্যগ্র। অথচ সাধারণ দেশবাসীর নিকট তাঁহাদের সে জবানের কোনই কদর হয় না। এইভাবে আমরা বাংলার শিক্ষিত এবং উন্নত শ্রেণীর মুসলমানের প্রায় অর্দ্ধেক লোককে বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্র হইতে হারাইয়া বসিয়াছি। অত্যুচ্চ বংশীয় মুসলমানদের ভিতরে অল্পসংখ্যক লোকই বাংলা চর্চ্চা করেন। আর মধ্যবিত্ত মুসলমানদের ভিতরে যাহাদিগকে দারিদ্র্য এখনও হজম করিয়া নিঃশেষ করিতে পারে নাই তাঁহারাই বাংলা চর্চ্চা করেন। এই মুষ্টিমেয় লোকই আমাদের বাংলা সাহিত্যের সৈনিক। কবে আমাদের সাহিত্যিক বখ্‌তিয়ারের উদ্ভব হইবে যাঁর প্রতিভায় তেজোদৃপ্ত হইয়া এই অল্পসংখ্যক লোকই বঙ্গভাষার জন্য বিজয় মাল্য আহরণে সমর্থ হইবে !

সাহিত্যিক অনুভূতি বা কবিপ্রতিভা কেবল যে বড় ঘরেই আত্মপ্রকাশ করে এমন নহে। সবুজ বঙ্গের মাঠে, ঘাটে, তরুবীথিকায় সর্ব্বত্রই এক সুরের ধ্বনি ও ভাবের তরঙ্গ খেলিয়া যাইতেছে। আর কৃষক, মজুর, ধীবর, পশারী সকলের প্রাণেই উহা দোলা দেয়। বাংলার পল্লীগাথা এক অপূর্ব্ব কাব্য–সম্পদ। বাংলার বাউল গান, বাংলার বারাষী (বর্ষাকালীন) চিরকাল ধরিয়া ঘাট মাঠের কর্ম্মরত তাজা প্রাণগুলির সুখদুঃখের বারতা দিকে দিকে বহিয়া বেড়াইতেছে। এত কোটী লোককে আমরা নিরক্ষর মূক করিয়া রাখিয়াছি। শিক্ষা পাইলে কত না কবি ভাবুক ও শিল্পরসিক এদের ভিতর হইতে উদ্ভূত হইত। কত রবীন্দ্রনাথ, কত শরৎচন্দ্র, কত জসিমউদ্দিন ইহাদের ভিতরে নীরবে আবির্ভূত হইয়া বনের কুসুমের মত নীরবে ঝরিয়া যাইতেছে। অধুনা কেহ কেহ এই সকল পল্লীর নীরব কবিদের গ্রথিত গীতিমাল্য সংগ্রহ করিতে মনোনিবেশ করিয়াছেন। কিন্তু এ মণিভাণ্ডার যে অফুরন্ত। সমগ্র বঙ্গে, বিশেষ করিয়া নদীবহুল এবং নাবিকের দেশ এই পূর্ব্ববঙ্গে বহুকাল ধরিয়া এর সংগ্রহ চলিলেও বোধ হয় প্রকৃতিদত্ত এ ভাণ্ডার নিঃশেষিত হইবে না। শান্ত সন্ধ্যায় যখন মেঘের তরীগুলি আকাশ গাঙ্গে পাড়ি জমাইতে থাকে, চাঁদিনী রাত্রিতে যখন পবন–আন্দোলিত তরঙ্গ শিরে শিরে রজত–রেখা ঝলক দিতে থাকে, আর নৌকাগুলি শুভ্র পালভরে দিগন্তে ছুটিতে থাকে, ঝটিকার দুর্য্যোগে যখন পদ্মা, যমুনা বা মেঘনার জলরাশি প্রলয়ের সূচনা করে, বর্ষার দিনে জীবনভারাকুল অকূল জলরাশি যখন চারিদিকে থৈ থৈ করিতে থাকে তখন সত্যই মনে

www.pathagar.com

পণ্ডিতেরা পুরাতন সংস্কৃত পুঁথির বাংলা অনুবাদ করিতেন, সেও লোক শিক্ষার উদ্দেশ্যে। কিছুকাল পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আমাদের অবস্থাও তদ্রূপ ছিল। মুসলমানেরা দেবদেবী মানেন না বটে, কিন্তু পাঠান ও মোগল রাজত্বের সুদীর্ঘ ছয় শত বৎসর বঙ্গদেশে ইহারা হাদিস তফ্‌সীরের টিকাটিপ্পনী লইয়াই মশ্‌গুল ছিলেন। কোম্পানীর যুগে যখন শিক্ষিত আলেমগণের রুজীর অভাব হইল তখন হইতে তাঁহারা বিশেষ করিয়া বাংলা পুঁথি রচনায় মনোনিবেশ করিলেন। তৎপূর্বে কেহ কেহ আরব্য গল্প ফারসী ও উর্দ্দু হইতে বাংলায় অনুবাদ করেন। শহিদ কারবালা, আমির হাম্‌জা ইত্যাদি দীর্ঘকাল আমাদিগকে পরিতৃপ্ত রখিয়াছে। আলওয়াল ইত্যাদি ২/১ জন দুঃসাহসী পণ্ডিত যদিও নূতন পথে লেখনী চালনা করিয়াছেন তাঁহাদেরও লেখ্য বিষয় ছিল পারিপার্শ্বিক হিন্দু ও মুসলমান সমাজের শাস্ত্রীয় কাহিনী অথবা উপকথা।

দীর্ঘকালের মৌরসী-প্রাপ্ত একটা বিরাট কাল্‌চারের দাবিদার হইয়া নূতন কাল্‌চার ও নূতন চিন্তাধারার ভিত্তিস্থাপন যে সুকঠিন, তাহাতে সন্দেহ নাই। যতদিন পর্য্যন্ত রাজকীয় আফিসসমূহে ইংরাজী ভাষা প্রবর্তিত না হইয়াছিল অর্থাৎ যতদিন পার্শী ভাষায় সকল কাজকর্ম্ম নির্ব্বাহ হইত ততদিন পর্য্যন্ত মুসলমানগণ ইংরাজী সাহিত্যের সংস্পর্শে আসার প্রয়োজনীয়তা কিছুমাত্র অনুভব করেন নাই। হঠাৎ যখন দেখা গেল অফিস আদালতসমূহ হইতে পার্শী হরফ বিদায় গ্রহণ করিয়াছে এবং ইংরাজী হরফ তাদের স্থান দখল করিয়াছে তখনই বোধ হয় রিক্ত জলাশয়ের মৎস্যের মত মুসলমান মুন্সীর দল মুষড়িয়া পড়িয়াছিলেন। ইংরাজী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা তখন হইতে অনুভূত হইতে থাকিলেও উক্ত শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা হয়ত আজিও সমগ্র মুসলিম-সমাজ উপলব্ধি করিয়া উঠিতে পারে নাই। তাই নজরুল বলিয়াছেন—

> "বিশ্ব যখন এগিয়ে চলেছে আমরা তখনও বসে,
> বিবিতালাকের ফতোয়া খুঁজি ফেকা ও হাদিস চষে।"

সুখের বিষয়, বিশ্ববিদ্যালয় ক্রমশঃ মাতৃভাষার ভিতর দিয়াই সর্ব্বপ্রকার উচ্চশিক্ষা প্রচারের প্রয়াস পাইতেছে। আর বাংলা দেশের লোকদের মাতৃভাষা যে সাধারণতঃ বাংলা এ সম্বন্ধে তো দ্বিতীয় কথাই এখন উঠিতে পারে না। সুতরাং বাংলার উৎকর্ষ সাধন না করিলে আর একবার বাঙ্গালী মুসলমানের সন্তানগণকে বাংলা ভাষার প্রতি এই উপেক্ষার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।

বাংলা সাহিত্য বর্ত্তমানে যথেষ্ট উন্নত এবং আধুনিক। পৃথিবীর অন্যান্য উন্নত জাতিসমূহের ভিতর যে সকল চিন্তাধারা ও দার্শনিক তত্ত্ব প্রবহমান আছে, বাংলা সাহিত্যেও সেগুলি প্রবেশ লাভ করিয়াছে। বাংলার মুসলমান যতই এ সাহিত্য হইতে দূরে দূরে থাকিবে ততই তাহারা পুরাতন হইয়া যাইবে এবং পুরাতন চিরকালই পশ্চাতে থাকে। আধুনিক যাহা তাহাই সমুখের এবং সম্মুখীন থাকে। আধুনিক শুধু কাল হিসাবেই আধুনিক নয়, দেশগত অভিনবত্বও উহার এক ধর্ম্ম। জাতিতে জাতিতে, দেশে দেশে নিবিড়তর আদান-প্রদানের ফলে প্রত্যেক দেশই লাভ করিয়াছে একটা অভিনব রূপ, অভিনব স্বভাব। এই অভিনবত্বই আধুনিকতার বিশেষ ধর্ম্ম বা অর্থ। অনেকের মতে আধুনিক হওয়ার অর্থই হইল পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে সম্মুখের আসন গ্রহণ করা। এশিয়ার সীমান্তবর্তী তুর্কীস্থান ও জাপান এইভাবে আধুনিক হইয়াছে, আর মধ্যবর্ত্তী পারস্য, আফগানিস্তান এখনও সম্পূর্ণ আধুনিক হইতে

www.pathagar.com

অষ্টম বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতির অভিভাষণ

মোহম্মদ বরকতুল্লাহ

মুসলিম সাহিত্য সমাজ একে একে আট বৎসর অতিক্রম করিয়া চলিল। এই আট বৎসরে এই সমাজ কাব্যকলা, ইতিহাস, কথা-সাহিত্য, সমালোচনা, দর্শন, বিজ্ঞান ও অর্থনীতি ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ে বহু তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধের প্রকাশ দ্বারা এবং বিশেষ করিয়া শিখা নামক একখানি উচ্চাঙ্গের পত্রিকা প্রকাশ দ্বারা সমগ্র সুধী-বঙ্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। অনেক কৃতী লেখক এই সমাজের ভিতর দেখিতে পাইতেছি। সমাজের বাহিরেও বহু খ্যাতনামা ও চিন্তাশীল মুসলমান এই সমাজের সহিত নিজেদের সংশ্লিষ্ট করিয়া সমাজের গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছেন। তাঁহারা এখন যে যেখানে আছেন সেইখান হইতেই এই সমাজের জন্য শুভেচ্ছা পোষণ করিতেছেন। আমরা আরও অনেক সাহিত্যিক অনুষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছি কিন্তু তার কোনটী দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই। তাই মনে হয় সাহিত্য সমাজের মূলে একটা সত্যকার সাধনা আছে যার জন্য এর দান বাংলা ভাষায় ভাবী ইতিহাস-লেখক অস্বীকার করিতে পারিবেন না। এ সমাজ যখন স্থাপিত হয় তখন হইতেই আমরা উৎসুক নেত্রে ইহার প্রগতি লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি। নিরবচ্ছিন্ন সুখাবেশের ভিতর দিয়া ইহার গতিপথ প্রসারিত হয় নাই। নানা দুর্যোগ ও অনুৎসাহের রজনী ইহার মাথার উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে এবং হয়ত আরও যাইবে। তথাপি এ সমাজ বাঁচিয়া আছে এবং বাঁচিবার জন্য আছে। সমাজের সভাপতি ও সভ্যগণের এই অপরাজেয় ধৈর্য্যকে যদি আমরা শ্রদ্ধার চক্ষে না দেখিতে পারি তবে আমাদের নিজেদেরই উপলব্ধির দৈন্য ও অনুদারতার প্রকাশ পাইবে।

আজ মনে পড়ে অতীতের এমনি এক দিনের কথা যখন বাংলা সাহিত্যের কৈশোর উত্তীর্ণ হয় নাই। আজ যেমন মুসলিম সাহিত্যিকগণ নিজেদের মনঃপুত এক সাহিত্যিক পরিস্থিতি সৃষ্টি করিতে উৎসুক হইয়াছেন, প্রভাকরের যুগে হিন্দু সাহিত্যিকগণের অবস্থাও তদ্রূপ ছিল। বঙ্কিম-প্রতিভার জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন যে সকল সাধক তাঁদের অগ্রণী ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এমনি একটি অনুষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা করিয়া সমসাময়িক সাহিত্যকে একটা শৃঙ্খলার মধ্যে আনিয়াছিলেন। প্রতি বৎসর পহেলা বৈশাখে তাঁহারা বিগত বর্ষের স্যাহিত্য-প্রচেষ্টার হিসাব নিকাশ করিতেন। ইঁহারাই বাংলা সাহিত্যকে নূতন রূপ প্রদান করেন। ইংরাজী সাহিত্য হইতে নানা কবিতা ও প্রবন্ধের অনুবাদ দ্বারা বাহিরের চিন্তাধারার সহিত বাঙ্গালী পাঠকের পরিচয় করাইয়া তাহাদের চিন্তাধারার পরিসর বৃদ্ধি করিতেন। তাঁহাদের পূর্ব্বকার সাহিত্যিকদের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল কেবল পুরাণ কথিত দেবদেবীর মহিমার উপর। কোন্ দেবতার কোপদৃষ্টি-সম্পাতে কোন্ রাজা রাজ্যভ্রষ্ট হইলেন, কোন্ অপ্সরা দেবলোকে কোন্ অপরাধ করিয়া প্রায়শ্চিত্ত হেতু ভূতলে জন্মগ্রহণ করিলেন এবং জগতে কোন্ দেবতার পূজা প্রচার করিলেন এই সব ছিল তখনকার দিনের লোক-সাহিত্যের সরঞ্জাম। কৃষ্ণরাধার প্রেমাভিনয়ও দেবতার লীলা বলিয়াই প্রসার লাভ করিয়াছিল। সময় সময় চিন্তাশীল

www.pathagar.com

অবিকশিত অবস্থায় ছিল, ওয়াসিলের চিন্তাভাবনাও এই মতবাদের ক্রমবিকাশের ধারার সূচনামাত্র। দুইজন অনাদি অনন্ত স্রষ্টার পরিচিন্তন অসম্ভব—এই ধারণা হইতেই ওয়াসিলের নূতন চিন্তাধারার সূচনা ; কিন্তু যিনি স্রষ্টার গুণাবলীও চিরন্তন মনে করেন, তিনি প্রকারান্তরে দুইজন স্রষ্টাই স্বীকার করেন। প্রাচীনপন্থীরা দেখাইলেন, কোরআনে ও হাদিসে আল্লাহ্‌র গুণাবলীর কথা আছে, ওয়াসিলের মতবাদ অনৈসলামিক।

কিন্তু মনে হয়, ওয়াসিল নিজে সর্ব্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করিতেন যে তাঁহার মতই ইসলামের সত্যকার একেশ্বরবাদের সঙ্গে সুসঙ্গত। মুসলমানরা আরবের বাহিরে ইহুদী ও খৃষ্টানদের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন, আর এই সময়ে তাহারা মুসলিম সমাজের ভিতরে অন্ততঃ তার পশ্চিমাংশের অধিবাসী হইয়াছিল। ইহাদের প্রথমোক্ত শ্রেণীর নিকট হইতে আল্লাহ্‌র মানবসুলভ ব্যক্তিত্ববাদ ও দ্বিতীয় শ্রেণীর নিকট হইতে আল্লাহ্‌র গুণাবলীর স্বতন্ত্র সত্তায় বিশ্বাস, ত্রিত্ববাদ প্রভৃতি বিষয় তাঁহারা অবগত হইয়াছিলেন। আল্লহ্ সম্বন্ধে এই সমস্ত ধারণার প্রতিক্রিয়ারূপেই হয়ত ওয়াসিলের এই 'স্রষ্টার গুণাবলীর স্বাতন্ত্র্যের অস্বীকৃতি'-বাদের উদ্ভব। কেননা দেখা যায়, অল্পকাল মধ্যেই এইসব যুক্তি-তর্ক খৃষ্টানদের সঙ্গে বাগবিতণ্ডায় ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হয়। (অসমাপ্ত)

www.pathagar.com

ব্যবহার করিতেন। একজন ভক্ত তাঁহার সম্বন্ধে এই গল্পটী বলিয়াছেন (গল্পটা অবশ্য সত্যও হইতে পারে, মিথ্যাও হইতে পারে) : কোন কুচক্রী প্রতিদ্বন্দ্বী ওয়াসিলকে জব্দ করিবার জন্য খলিফার নিকটে তাঁহার সম্মান লাঘবের জন্য খলিফাকে অনুরোধ জানান যে ওয়াসিলকে এই বাক্যটি উচ্চারণ করিতে বলা হউক "আমারাল অমারু আঁইইয়াহ্ফিরা বিরা'ন লেইয়েশরিবা মিন্হল ওয়ারিদু ওয়াস্ সাদিরু" (বাদশা রাজপথে একটী কূপ খনন করিবার আদেশ দিয়াছেন যেন পথিকেরা গমনাগমনের সময় উহা হইতে জলপান করিতে পারে)। কৌতূহল পরবশ হইয়া খলিফা তাঁহাকে উক্ত কথাটী বলিতে বলেন। ওয়াসিল ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া বলিলেন—"হাকামাল হাকেমো আইইয়াজ আলা কালিবান ফিস্ সাবিলে লেইয়ানতাফেয়া মিন্হুস সাদিয়ো ওয়াল বাদিয়ো"। পূর্ব্ব বাক্যের সম্পূর্ণ অর্থ ইহাতে ব্যক্ত হইল, অথচ বিঘ্নকর 'র' অক্ষরটি আগাগোড়া বাদ দেওয়া হইল।

ওয়াসিলের চিন্তার প্রভাব তৎকালীন মুস্লিম চিন্তাশীলদের উপরে গভীর ও ব্যাপকভাবে পড়িয়াছিল বলিয়া মনে হয়, কেননা ইমাম হুসেনের পৌত্র যায়েদ (ইনি যায়েদিয়া সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা ও পিতামহের ন্যায় উম্মিয়বংশীয়দের সঙ্গে যুদ্ধে হিশাম ইব্ন আবদুল মালিকের রাজত্বকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন) ও দ্বাদশতম উম্মিয় খলিফা এযিদ ইব্ন্ ওয়ালিদ তাঁহার শিষ্যমণ্ডলীভুক্ত ছিলেন। এযিদের সিংহাসন আরোহণের পূর্ব্বে মোতাজেলাদের সংখ্যা এত বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে তাঁহাদেরই সাহায্যে তিনি নাকি সিংহাসন লাভ করেন, আর রাজ্যাভিষেকের অব্যবহিত পরে তিনি যে মনোরম অভিভাষণ প্রদান করেন তাহাও নাকি মোতাজেলাবাদের দ্বারা অনুপ্রাণিত।

'ইচ্ছাশক্তির স্বাধীনতা'–বাদ বস্রার উদার ভাবুকদল প্রচার করিয়াছিলেন। এ–বিষয়ে সত্যকার দার্শনিক বিচার–বিশ্লেষণের সঙ্গে অবশ্য তাঁহাদের পরিচয় হয় নাই। তাঁহাদের এই বিশ্বাসের মূলে ছিল দুইটি চিন্তা— (ক) স্বভাবতঃই আমরা ইচ্ছাপূর্ব্বক কোন কাজ করি অথবা তাহা হইতে বিরত থাকি, (খ) ইহার বিপরীত বিশ্বাস যদি আমরা পোষণ করি তাহা হইলে এই অদ্ভুত মীমাংসার অমাদের পৌঁছিতে হয় যে আল্লাহ তাঁহার নিজের কৃতকর্ম্মের জন্য শাস্তি দেন মানুষকে, কিন্তু ইহা আল্লাহ্র ন্যায়পরায়ণতার বিরোধী। এই শেষোক্ত যুক্তিদ্বারা ওয়াসিলের তর্কের ক্ষমতায় পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়, মানুষের ইচ্ছাশক্তির যদি কোন স্বাধীনতা না থাকে, তবে তাহার নৈতিক জীবনের জন্য তাহার কিছুমাত্র দায়িত্ব থাকে না, তাহা হইলে তাহার অবস্থা হয় নিছক যন্ত্রের মতো—সেই যন্ত্রের যত দোষত্রুটি তাহার জন্য দায়ী যন্ত্রী অর্থাৎ আল্লাহ্। এইভাবে পরমকরুণাময়কে সাজানো হয় অতি ঘোর অত্যাচারীরূপে (যেমন অত্যাচারী নাদির শাহ ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া তাহার জ্যেষ্ঠপুত্রের চক্ষু উৎপাটন করেন আবার সভাসদগণের শাস্তি দেন এই জন্য যে তাহারা তাঁহাকে বাধা দেয় নাই), শুধু তাই নয়, এই যদি সত্য হয় তবে মানুষ তাহার সুকৃতির জন্য পরকালে কোন পুরস্কারের আশা করিতে পারে না—ইত্যাকার কথা ওয়াসিলের মতো পরিষ্কার ও জোরালো করিয়া ইহার পূর্ব্বে আর কেহ বলিতে পারেন নাই। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় মোতাজেলারা 'মানব–ইচ্ছার স্বাধীনতা'–বাদ পোষণ করিতেন বিধাতৃবিধানের ন্যায়পরায়ণতা সমর্থনের জন্য। বলা বাহুল্য, বিশ্ববিধাতার ধারণায় ন্যায়পরায়ণতা অবশ্য গণনীয়। কিন্তু ওয়াসিলের মৌলিকত্ব বিশেষভাবে প্রকাশ পায় অন্য চিন্তাধারায়, সেটি হইতেছে জ্ঞান শক্তি ইচ্ছা জীবন প্রভৃতি আল্লাহ্র গুণাবলীর স্বতন্ত্র সত্তার অস্বীকার। প্রথমে এই মতবাদ খুবই

www.pathagar.com

কর্ম্মের সহিত ইহার সম্পর্ক নাই ; আর সেই কারণে যে পর্যন্ত কোন মুসলমান অন্তরে বিশ্বাসহীন না হয়, সে পর্যন্ত তাহাকে অমুসলমান কাফের বলা যায় না। তাহার পাপ যতই হউক, তবু তাহার সমুদয় পাপ করুণাময় আল্লাহ্ মাফ করিয়া দিতে পারেন। ইমাম আবু হানিফা এই শেষোক্ত-দল-ভুক্ত ছিলেন। এই দুই দল এইভাবে ধর্ম্মবিশ্বাস-হীনতা ও ধর্ম্মবিশ্বাস পরস্পরবিরোধী মনে করিতেন, হাসান বসরী মনে করিতেন অধর্ম্মাচারী মুসলমান মোনাফেক (ভণ্ড) পর্য্যায়ভুক্ত। ওয়াসিল হাসানের এই মত ও 'ইচ্ছাশক্তির স্বাধীনতা'-বাদ আরও যুক্তি-অনুবর্ত্তী করিলেন। অধর্ম্মাচারী মুসলমান কাফের ও মুসলমানের মধ্যবর্ত্তী, আর সেজন্য এরূপ লোককে ধর্ম্মবিশ্বাসীও বলা যায় না। এইভাবে ওয়াসিলের মতে ধর্ম্মবিশ্বাস ও ধর্ম্মবিশ্বাসহীনতা সম্পূর্ণ বিপরীতধর্ম্মী হইল না—কিছু বিরুদ্ধভাবাপন্ন হইল, তর্কশাস্ত্রের ভাষায় Contradictory হইল না, Contrary হইল। তাঁহার মতে পরকালে এইরকম লোকের শাস্তি মুসলমান হইতে গুরুতর হইবে কিন্তু অমুসলমান হইতে লঘুতর হইবে। এইভাবে অধর্ম্মাচরণ বা পাপ তাঁহার মতে হইল ধর্ম্ম ও ধর্ম্মবিশ্বাসহীনতার (কাফেরী) মাঝামাঝি। এই কথা শুনিয়া হাসান বলিলেন— "আমাদের ভাই আমাদের নিকট হইতে সরিয়া পড়িলেন (ই'তাজালা আল্লা আখুনা) ও তাঁহাকে স্বীয় শিষ্যমণ্ডলী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। ওয়াসিল শান্তভাবে বসরার মসজিদের আর এক স্তম্ভের নীচে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। শীঘ্রই একদল লোক তাঁহার চারিপাশে জুটিল। ওয়াসিল নিজে প্রচার আরম্ভ করিলেন। ইসলামের ধর্ম্মতত্ত্বে এই সুপ্রসিদ্ধ মতবাদের ফলে ওয়াসিল এক নূতন মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা হইলেন, তাঁহার অনুবর্ত্তীদের নাম হইল মোতাজেলা—অর্থাৎ দলত্যাগী।

ওয়াসিল পরম ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। ইসলামের সমস্ত বিধি বিধান, তিনি যথাযথভাবে পালন করিতেন, নিয়ম ও নিষ্ঠার সহিত নামাজ পড়িতেন। কিন্তু তাঁহার এইসব ধর্ম্ম কর্ম্মের ভিতরেও তাঁহার নিজের মতবাদের প্রতিষ্ঠার অনুকূল সাক্ষ্যপ্রমাণ সংগ্রহের জন্য তিনি যথেষ্ট ব্যস্ত থাকিতেন। তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁহার স্ত্রীর এই উক্তি হইতে। তাঁহার স্ত্রী বলিতেছেন : "তিনি (ওয়াসিল) রাত্রির অনেকখানি অংশ নামাজে ব্যয় করিতেন, কিন্তু সব সময়ে কাগজ কালি ও কলম পাশেই এক টেবিলের উপরে রাখিয়া দিতেন। কোরআন আবৃত্তি করিতে করিতে যখনই তাঁহার মতের সমর্থক কোন 'আয়াত' পাইতেন, তখনি থামিয়া উহা লিখিয়া রাখিতেন। কাজেই নামাজ তাঁহাকে নূতন করিয়া আরম্ভ করিতে হইত। এইভাবে এই সব ধর্ম্ম-কর্ম্ম এত দীর্ঘ সময় সাপেক্ষ হইয়া পড়িত।' তাঁহার ধর্ম্মমতের অশিথিলতার আর একটি গল্প আছে। তাঁহার এক প্রিয়বন্ধু এক সময়ে নাকি বলিয়াছিলেন, ধর্ম্ম বিষয়ে তাঁহার মত ভিন্ন আর কিছুতে যে বিশ্বাস করে সে কাফের! ইহাতে বন্ধুত্বে জলাঞ্জলি দিয়া তিনি তাঁহার সহিত সকল সম্বন্ধ ছিন্ন করেন।

ওয়াসিলের শিষ্য ও বন্ধু আমর-এর মতে ওয়াসিলের পাণ্ডিত্য অনন্যসাধারণ ছিল। ধর্ম্মতত্ত্ব ভিন্ন শিয়া জিন্দিক দাহ্‌রিয়া প্রভৃতি মতবাদ ও সে-সমস্তের খণ্ডন তাঁহার আয়ত্ত ছিল। মুসলিম ধর্ম্মতত্ত্বের সুপ্রসিদ্ধ ইতিহাস-প্রণেতা আবদুল জব্বার বলেন, আবুল হুদাইল আল্লাফের মতো ব্যক্তি তাঁহার পাণ্ডিত্যের জন্য ওয়াসিলের নিকট ঋণী, ওয়াসিলের পত্নী নাকি তাঁহার দুই সিন্দুক গ্রন্থ তাঁহাকে দিয়াছিলেন। কিন্তু এত বিদ্যাবত্তা ও বাক্ শক্তির সঙ্গে ওয়াসিলের একটি দোষ ছিল—তিনি 'র' অক্ষরটি উচ্চারণ করিতে পারিতেন না। তাঁহার আরবী জ্ঞান নাকি এমন অগাধ ছিল যে বক্তৃতায় ও রচনায় এই 'র' অক্ষর-বর্জ্জিত শব্দ তিনি

www.pathagar.com

এখন জনগণের অনুবর্ত্তনীয় নয়। ধর্ম্ম প্রচারে নিয়োজিত হইতেছে অজ্ঞেয় দল! জনগণ যে মুক্তি অথবা ধ্বংসের দ্বারে উপস্থিত হয় সেটি অধিকাংশ স্থলে 'ইমামে'র জন্যই। ভাবিয়া দেখুন আপনি কোন পথাবলম্বী। এমন জ্ঞানী কি কেহ আছেন যিনি তাহার নিজেরই আচরণের নিন্দা করেন, অথবা যাহা নিন্দিত বিবেচনা করেন তাহাই আচরণ করেন? যাহা বিধেয় বলিয়া আদেশ দেন তাহারই জন্য দণ্ড বিধান করেন, যাহা দণ্ডার্হ বিবেচনা করেন তাহারই বিধান দেন? আপনি কাহাকেও কখন দেখিয়াছেন—নিজে চলিতেছেন সত্যপথে আর অপরকে চালিত করিতেছেন বিপথে? এমন সদাশয়তা-গুণে-ভূষিত প্রভু কি আপনার নয়নগোচর হইয়াছেন যিনি তাঁহার ভৃত্যবর্গের উপর এমন আদেশ করেন যাহা তাহাদের সাধ্যের অতীত, অথবা তাঁহারই আদেশ পালনের জন্য তাহাদের শাস্তি দেন? এমন ধার্ম্মিক কি দেখিয়াছেন যিনি জনগণকে একই ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম পালনে বাধ্য করিতেছেন? এমন সত্যবাদী কি কখনও দেখিয়াছেন লোকের পরস্পরের প্রতি অসত্যাচরণ করুক ইহাই যাঁহার ইচ্ছা?' এই চিঠিরই অন্যস্থলে তিনি খলিফাকে এই অনুরোধ জানান যে তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তীরা অন্যায়ভাবে যাহা কিছু লোকদের নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়া সরকারী ধনাগার পূর্ণ করিয়াছেন সে-সব স্বত্বাধিকারীদের ফিরাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করিবার অনুমতি তাঁহাকে দেওয়া হউক। কথিত আছে এই পত্রখানি খলিফার মর্ম্ম স্পর্শ করিয়াছিল। গাইলানীকে তিনি প্রার্থিত অনুমতি প্রদান করিয়াছিলেন; যাহার যাহা প্রাপ্য কোষাগার হইতে তাহা তাহাকে বাস্তবিকই দেওয়া হইয়াছিল হিশামের সিংহাসনারোহণের কিছুদিন পরেই দিমাশকী একদিন বক্তৃতাকালে বলিয়া উঠিলেন, "কাহার সাহায্যে আমি ইহার হাত হইতে অব্যাহতি পাইব যে বলে তাহারাই (উম্মিয়গণ) সত্যাধর্ম্মাবলম্বীদের নেতা? যাহাদের ভাণ্ডারের অর্থ পুঞ্জীভূত অথচ জনগণ অনাহারে মরিতেছে?" এই সংবাদ হিশামের নিকট পৌঁছিলে তিনি বুঝিলেন ইহাতে তাঁহাকে ও তাঁহার পিতাকে অপমান করা হইয়াছে। এই সংবাদ পাইয়া গাইলানী ও তাঁহার বন্ধু সালিহ্ আর্ম্মেনিয়ায় পলায়ন করেন—কিন্তু শীঘ্রই ধৃত হইয়া কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন ও পরে হিশামের আদেশে নিদারুণ যন্ত্রণা ভোগের পর প্রাণত্যাগ করেন। শিরচ্ছেদের প্রাককালে হিশাম তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আল্লাহ তোমার জন্য কি করিলেন, মনে হয়?" খলিফার উপস্থিতিতে অথবা পরে আরও কত অত্যাচার তাঁহার উপর হইতে পারে এইসব চিন্তায় গাইলানী বিচলিত হইলেন না, খলিফার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া তিনি বলিলেন—'যাহারা আমার প্রতি এই ব্যবহার করিয়াছে আল্লাহর ন্যায় বিচার যেন তাহাদের লাভ হয়।'

ওয়াসিল ইব্ন্ আতা আল্ গাজ্জাল

ওয়াসিল প্রথমে ছিলেন বসরার উদারদলভুক্ত সুবিখ্যাত হাসানের শিষ্য। ইব্ন-হানাফিয়ার নিকটেও তিনি কিছুদিন বিদ্যাভ্যাস করেন। তখনকার দিনের প্রধান সমস্যা দাঁড়াইয়াছিল মুসলমান সমাজের অধর্ম্মাচারীদের লইয়া। এই বিষয়ে যথেষ্ট মতভেদ দেখা দিয়াছিল। ইহার মধ্যে এই দুইটি ছিল দুই প্রধান পরস্পরবিরোধী মত—খারিজদের মত ও মুর্জীদের মত। প্রথম দল ভাবিতেন, মুসলমান যখন কোন ধর্ম্মবিগর্হিত কার্য্য করে তৎক্ষণাৎ সে অমুসলমান কাফের হইয়া যায়, কেননা আল্লাহর আদেশের অনুবর্ত্তীতাই হইতেছে ঈমানের (ধর্ম্মবিশ্বাসের) প্রধান অংশ। অপর দল ভাবিতেন, ঈমান শুধু অন্তরের বিশ্বাস লইয়া,

www.pathagar.com

ধর্ম্মালোচনা-প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়—স্থাপয়িতা হাসান। সাধারণভাবে ধর্ম্ম-বিষয়ক মতবাদের উদারতা ও বিশেষভাবে মানুষের ইচ্ছাশক্তির স্বাধীনতা তাঁহার প্রচারের বিষয় ছিল বলিয়া মনে হয়। এক সময়ে মাবাদউল্-জুহানী তাঁহাকে জানাইয়াছিলেন—উম্মীয়বংশীয়গণ এই বলিয়া তাঁহাদের সমস্ত অন্যায় ও নৃশংসতা সমর্থন করিতেছেন যে, সব-কিছুই সংঘটিত হয় বিধিলিপি ও বিধাতৃ-ইচ্ছার ফলে, তাঁহাদের ইচ্ছা অনিচ্ছা এখানে নিরর্থক। ইহাতে হাসান নাকি বলিয়াছিলেন—নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র শত্রুরা মিথ্যাবাদী। তাঁহারই এক শিষ্য ওয়াসিল এই বিষয়ে (অমোঘ বিধিলিপি) প্রচলিত মতবাদের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধাচারী হন। তাঁহার শিষ্য মা'বাদের শোচনীয় পরিণাম দর্শন করিয়াই হাসান তাঁহার উদার মতবাদের প্রচারে অধিক দূর অগ্রসর হন নাই। তবু 'মানুষের ইচ্ছাশক্তির স্বাধীনতা'বাদের দিকে তাঁহার প্রবণতা অক্ষুণ্ন ছিল। বিচার সমন্বিত ধর্ম্ম-ব্যাখ্যার প্রবর্ত্তক হিসাবে হাসানের চেয়ে উচ্চতর আসন কাহারও নহে। সেই সময়ে মা'বাদ ও দিমাশকীর মতো ব্যক্তির অবির্ভাব হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় চিন্তার স্বাধীনতা তখন কত অকুতোভয় হইতে পারিয়াছিল।

হাসানের মতে ভয় হইতেই নৈতিক জীবনের উদ্ভব। তিনি নৈরাশ্যধর্ম্মী ছিলেন। তিনি বলিতেন, যে-কেহ মনোযোগসহকারে কোরআন পাঠ করিবেন তাঁহারই আল্লাহ্‌র ভয়ে অভিভূত না হইয়া উপায় নাই। তাঁহার সমকালবর্ত্তী একজন বলিয়াছেন—হাসানকে সব সময়ে নিরানন্দ ও চিন্তাগ্রস্ত দেখাইত ; তাঁহাকে দেখিলে মনে হইত কি এক দুঃখে তিনি পীড়িত। 'তাসাউফ' নামে ইসলামে সন্ন্যাসবাদের প্রবর্ত্তক বলিয়া তিনি খ্যাত।

চর্ম্মচক্ষে আল্লাহকে দেখা যাইবে কিনা এই বিষয়ে তাঁহার সম্বন্ধে দুইটি বিরোধী মত প্রচলিত আছে। একটিতে তিনি বলিয়াছেন, ইহা সম্ভবপর—অপরটিতে বলিয়াছেন, অসম্ভব।

গাইলানী দিমাশ্‌কী (মৃত্যু : ৭৩০ খৃষ্টাব্দ)

দিমাশ্‌কী একজন নীতিশিক্ষক ছিলেন। উম্মীয়বংশীয়দিগের সংসার লালসার তিনি তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। তিনি তৃতীয় খলিফা ওসমানের বিমুক্ত দাস কায়াসানিয়াদের ইমাম মোহাম্মদ ইবনুল হানাফিয়ার নিকট হইতে জ্ঞান শিক্ষা করেন। হজের সময়ে ইবন-হানফিয়ার দৃষ্টি তাঁহার উপরে পতিত হইলে তিনি (ইবন্ হানফিয়া) বলিয়াছিলেন 'দামশ্‌কবাসীদের প্রতিবাদরূপ এই আল্লাহর প্রমাণ চাহিয়া দেখ।' বিদ্যাবত্তায়, সংযমে, ধর্ম্মভাবে, আল্লাহর একত্ব ও ন্যায়পরায়নতায় বিশ্বাসে (উদারপন্থী ধর্ম্মতত্ত্ববিৎদের এই সব ছিল প্রধান মত) তৎকালে তাঁহার সমকক্ষ কেহ ছিলেন না। হিশাম-বিন-আব্দুল মালিকের বিচারে তিনি ও তাঁহার সঙ্গী সালিহ, অতি নির্দয়ভাবে নিহত হন। এই নিষ্ঠুরতার কারণ এই : দিমাশ্‌কী ওমর-বিন-আবদুল আজিজকে লিখিয়াছিলেন 'হে ওমর, আপনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন, কিন্তু হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই ; চিন্তা করিয়াছেন, কিন্তু মর্ম্মগ্রাহী হইতে পারেন নাই ; আপনি বুঝুন যে ইসলামের অতি নগন্য অংশই আপনি বুঝিয়াছেন। হায় মৃত পরিবেষ্টিত মৃত, আপনি কি জীবনে চলার কোন ইঙ্গিত পান নাই? আধ্যাত্মিক আলোক লাভ করা যায় এমন বাণী কোনখানে পান নাই? ধর্ম্ম সূত্র ছিন্ন হইয়াছে, আর ধর্ম্ম বিকার মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়াছে। কোন বিচারানুমোদিত ধর্ম্মতত্ত্ব

www.pathagar.com

অথবা যে-কোন ধর্ম্মবিধান সম্বন্ধে কোনরূপ জল্পনা-কল্পনা অবৈধ, মতপ্রকাশ নিষিদ্ধ ও বিচার-বিশ্লেষণ পাপজনক।

ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়, ধর্ম্মের মূলীভূত বিশ্বাস প্রভৃতি ব্যাপারে মোতাজেলারা অন্যান্য মুসলমানের চেয়ে কম নিষ্ঠাবান ছিলেন না। কিন্তু ইহার বাহিরে তাঁহারা চাহিতেন বিচার বুদ্ধির নির্দ্দেশিত পথে চলিতে, আর তাঁহাদের বিরুদ্ধবাদীরা চাহিতেন চিরাচরিত ধারার অনুবর্ত্তী হইয়া চলিতে। শেষোক্ত শ্রেণীর ধর্ম্মতত্ত্ববিদগণ ইন্দ্রিয়ের নির্দ্দেশের ভ্রান্তি ও অনেক বিষয়ে বিচারবুদ্ধির অক্ষমতা দেখিয়া উভয়েরই নির্দ্দেশ অস্বীকার করিয়া শুধু 'ওহী' বা প্রত্যাদেশকে অভ্রান্ত সত্য বলিয়া জানিতেন। ইহারা নিজেদের এই দৃঢ় প্রবল বিশ্বাসের কারণ অপরকে বুঝাইয়া বলিবার ক্ষমতা রাখিতেন না, আর অন্যের মতামত ও ইস্‌লামের প্রসারের দিকে আধুনিক মৌলানাদের মতোই ইহারা ছিলেন সম্পূর্ণ উসাদীন। পক্ষান্তরে মোতাজেলারা এরূপ মনোভাব নবীন ধর্ম্মের প্রতিপত্তি ও অমুসলমানদের ভিতরে উহার প্রসারের পক্ষে অকল্যাণকর মনে করিতেন, আর সেইজন্যই ইস্‌লামের বিধানের সঙ্গে বিচারবুদ্ধির সঙ্গতি সাধনের প্রাণপণ চেষ্টা করিতেন ; ইস্‌লামের কোন দুর্ব্বলতা প্রদর্শন যে ইঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল না, ইহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। বরং উঁহাদের লক্ষ্য ছিল ইস্‌লাম সম্বন্ধে যে-সব ধারণা ইঁহারা অপ্রধান ও উহার প্রসারের পরিপন্থী মনে করিতেন তাহাই দূর করিয়া ইস্‌লামকে আরও মনোজ্ঞ করা। কিন্তু ইঁহাদের এই ধর্ম্মের সেবার মর্য্যাদা উপলব্ধির পরিবর্ত্তে কোন কোন ধর্ম্মনেতা ইহাঁদিগকে বলিতেন : 'কাফের'—তাঁহাদের অধিকারে ইহাঁরা হস্তক্ষেপ করিতেছেন ইহা ত অপরাধের বিষয় হইবেই। এই ধরনের সামাজিক নির্য্যাতন আজিও অপ্রবল নয়।

মুখবন্ধস্বরূপ এই কয়েকটী কথা বলিয়া মোতাজেলাবাদের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস পাঠকদের সামনে উপস্থিত করিতে ইচ্ছা করি। ক্ষুদ্র প্রবন্ধে এতবড় একটি বিষয় সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা অসম্ভব। আমি তাই এই চিন্তাধারার কয়েকজন বিশিষ্ট নেতার সর্ব্বজনবোধ্য মতামত সম্বন্ধেই আলোচনা করিব। পরিতাপের বিষয় এই যে, সব চিন্তাশীলের কোন রচনাই আমাদের হাতে আসিয়া পৌঁছে নাই। ইহাঁদের কয়েক-শত-বৎসর-পরে আবির্ভূত ও প্রবল-বিরুদ্ধবাদী লেখকদের লেখা হইতেই, ইহাদের সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় জানিতে হয়। ইঁহাদের সম্বন্ধে যথাসম্ভব বিশ্বাস্য বিবরণ পাওয়া যায় এইসব গ্রন্থে :

১. মাকালাতুল ইসলামিঈন—আবুল হাসান আল্-আশারী
২. আল্-মিলাল ওন্নিহাল—বাকিলানী।
৩. আল্ মিলাল ওন্নিহাল—আবদুল কাহির বাগদাদী।
৪. আল্-ফস্‌সাল ফিল্‌মিলাল্ ওন্নিহাল-ইব্‌ন হাজ্‌ম্ যাহিরী।
৫. আল্-মিলাল ওন্নিহাল—আবদুল করীম শাহ্‌রিস্তানী।

হাসান বসরী (৬৪০-৭২৮ খৃষ্টাব্দ)

বস্‌রা এক সময়ে প্রবল ধর্ম্মান্দোলনের কেন্দ্র হইয়া উঠে। সেই আন্দোলন ক্রমে এক উদার মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে। হাসানের প্রচারকার্য্য এই আন্দোলনের প্রাক্কালে। এখানেই প্রথম

www.pathagar.com

সপ্তম বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতির অভিভাষণ

ফিদা আলী খান

অনাদিকাল হইতে মানুষ দুই দলে বিভক্ত হইয়া আসিতেছে। মনে হয়, এইরূপ বিভাগ বলবৎ থাকিবে আরও হাজার হাজার বৎসর—হয়ত বা অনন্তকাল। এই দুই দলের একটির নাম বিচারবাদী, অপরটি আনুগত্যবাদী। যাঁহারা প্রথম দলের তাঁহারা কোন-কিছু নির্ব্বিচারে গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক। তাঁহারা তাঁহাদের অন্তর্নিহিত বিচার শক্তির প্রেরণায় স্বাধীন অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া বিচারে যাহা সত্য অথবা মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হয় তাহাই গ্রহণ অথবা বর্জ্জন করেন। তাঁহারা জানেন, যে-জ্ঞান মানুষ লাভ করিতে পারে তাহা ইন্দ্রিয় ও বিচার-শক্তির সাহায্যেই সম্ভব। ইন্দ্রিয়ের নির্দ্দেশ অবশ্য সব সময়ে অভ্রান্ত হয় না, তাই সে-সব পরিশোধিত করিতে হয় বিচারবুদ্ধির দ্বারা। তাঁহাদের মতে বিচারবুদ্ধি হইতেছে সত্য-নির্ণয়ের চরম অবলম্বন। তাই যাহাতে এই বিচারবুদ্ধি পরিতৃপ্ত হয় না, তাহা গ্রহণে তাঁহারা একান্ত অনিচ্ছুক। অন্যান্য ব্যাপারের মতো ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় বিশ্বাস ও মতবাদেও তাঁহারা এই বিচারবুদ্ধির প্রয়োগ করেন। এই পথে বিপদ যে কত সে-সম্বন্ধে তাঁহারা পূর্ণভাবে সচেতন, কিন্তু তাঁহারা সাহসীপুরুষ-আত্মপ্রত্যয়ের দৃঢ়তা তাঁহাদের বলদান করে সমস্ত বিপদের সম্মুখীন হইতে।

যাঁহারা দ্বিতীয় দলের লোক তাঁহারা হয় নির্ব্বুদ্ধি অথবা অত্যন্ত শিথিল প্রকৃতির। স্বভাবতঃ তাঁহারা বিশ্বাস করিতে পারিলেই বাঁচিয়া যান, নিজেদের বুদ্ধি বিবেচনার উপরেও তাঁহাদের ভরসা নাই, তাই তাঁহারা অপরকে উচ্চতর জ্ঞান সম্পন্ন মনে করিয়া তাঁহাদের আনুগত্য স্বীকার করেন। অপরের নিকট হইতে নির্ব্বিচারে গ্রহণ করা মতের পুনরাবৃত্তি করিতে করিতে অবশেষে তাহাই তাঁহারা মনে করেন অভ্রান্ত সত্য ; আর যাহা তাঁহারা অভ্রান্ত বলিয়া ভাবিতে শিখিয়াছেন তাহার কোনরূপ সমালোচনা তাঁহাদের অসহ্য। তাঁহাদের সেই সব প্রিয় ধারণার বিরুদ্ধে যাঁহারা কোন কথা বলিতে যান তাঁহাদের বিপত্তির এমন কি প্রাণহানির আশঙ্কা আছে। মোতাজেলারা এই প্রথম দলের ও প্রাচীনপন্থীরা দ্বিতীয় দলের।

ইস্‌লামের চিন্তার ইতিহাসে কোন মুসলমানের পক্ষেই সংস্কারবিহীন হইয়া বিচার-জীবন আরম্ভ করা সম্ভবপর ছিল না, তাহা হইলে তিনি মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত থাকিতে পারেন না। কাজেই প্রথম ও দ্বিতীয় উভয় দলের মুসলমানদের কয়েকটি ধর্ম্ম বিষয়ক মতবাদ অপৌরুষেয় বাণী হিসাবে নির্ব্বিচারে গ্রহণ করিতে হইত। মোতাজেলাদের মতে ধর্ম্মের এই গোড়ার কথা হইতেছে আল্লাহ্, নবী ও 'ওহীতে' বিশ্বাস। এইসব বিষয়ের কোন প্রমাণের দাবী কোন দলই করেন নাই। মোতাজেলারাও এই সব বিষয়ে অন্যান্য মুসলমানের মতো সম্পূর্ণরূপে প্রত্যয়শীল ছিলেন। তবে তাঁহাদের ধারণা ছিল, ইস্‌লামের এই মূলভিত্তির স্বরূপ-নির্ণয় ও এই সবের সহিত সম্পর্কিত অন্যান্য প্রশ্ন সম্বন্ধে ইসলাম তাঁহাদিগকে স্বাধীনতা দিয়াছে। কিন্তু প্রাচীনপন্থীদের ধারণা ছিল যে, ধর্ম্মের এই মূলভিত্তির সম্বন্ধে

www.pathagar.com

করিয়াছি। যদি জীবন-রক্ষাই প্রকৃতিগত ধর্ম্ম হয়, আর যদি সেবাই জীবন রক্ষার উপায় হয় তবে এই সেবাধর্ম্মে আত্মনিয়োগ করিয়াই আমাদিগকে জীবন রক্ষা করিয়া ধন্য হইতে হইবে। কিন্তু সেবার পূর্ব্বে যাহাকে সেবা করিব তাহার জন্য প্রাণে দরদ অনুভব করা চাই, তাহার দুঃখে সমবেদনা চাই, তাহার অভাব-অভিযোগে সহানুভূতি চাই, কারণ এই অনুভূতি ব্যতীত কর্ম্মপ্রেরণা জন্মে না এবং কর্ম্ম না হইলে দুঃখমোচনও সম্ভব হয় না।

যখন সমাজের জন্য আমাদিগের প্রকৃত দরদ হইবে এবং সমাজের বেদনা মনে প্রাণে অনুভব করিব তখনই আমাদের সেবার প্রেরণা জাগিবে—তাহার পূর্ব্বে নয়। এই সেবাধর্ম্মের বিনিময়ে আমরা সমাজ হইতে যে প্রতিদান পাইব তাহা দ্বারাই আমাদের জীবন-সমস্যার সমাধান হইবে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি জীবন রক্ষার এই প্রকৃতিগত ধর্ম্ম রক্ষা করিতে হইলে আত্মশক্তির সাধনা আবশ্যক। কিন্তু এই সাধন-পথের অন্তরায়—অনুভূতিহীনতা, আত্মবিশ্বাসের অভাব, সংস্কার ও চিত্ত।

যে সময় যাইতেছে তাহা আর ফিরিতেছে না, যে আয়ুক্ষয় হইতেছে তাহা ফিরিয়া আসিবে না। সুতরাং আমরা যদি প্রতিমুহূর্ত্ত সজাগ না থাকি আর কাজ না করি, তাহা হইলে ভবিষ্যতে এই সকল ক্ষতির সমষ্টিই আমদিগকে সম্পূর্ণভাবে বিনাশ করিয়া দিবে, এবং তাহাই বর্ত্তমানে হইতেছে।

জড়ভাব ও অবসাদ ত্যাগ করিয়া একটী ভালো কাজ করিতেই হইবে, কারণ ভালো কাজের পুরস্কার আছেই। সুতরাং নিজের ও জগতের প্রতিপালনের জন্য যে সেবা-ধর্ম্ম তাহাই গ্রহণ করুন—তাহার দ্বারাই ধর্ম্ম রক্ষা হইবে। এবং অহংভাব ত্যাগ করিয়া তাঁহার উপরেই সর্ব্বতোভাবে নির্ভর করুন। (অসমাপ্ত)

www.pathagar.com

দান। সমালোচনাক্ষেত্রেও অন্ততঃ আমাদেরই দুই একজন সাহিত্যিক এক সুপ্রতিষ্ঠিত আসন অধিকার করিয়াছেন। কিন্তু এঁরা তো যথেষ্ট নন। দর্শন, বিজ্ঞান, নাট্যকলা ইত্যাদি ক্ষেত্রে দেশমান্য লেখক এখনও আবির্ভূত হন নাই। আমাদের গদ্য সাহিত্যের ক্ষেত্রে বিশেষ করিয়া কথা সাহিত্যে, কতদিনে বঙ্কিমচন্দ্র বা শরৎচন্দ্রের আবির্ভাব হইবে কে জানে।

হিন্দুর লেখা সাহিত্য এবং মুসলমানের লেখা সাহিত্য ঠিক একই বস্তু না হইয়া হয়ত বিষয় ভেদে বা রুচিভেদে কিঞ্চিৎ বিভিন্ন হইতে পারে। সে বিভিন্নতার অর্থ বৈষম্য বা বিরোধ নয়, বৈচিত্র্য। আমি মুস্‌লিম সাহিত্য বা চিন্তাধারার কথা বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিতেছি এই জন্য যে শরীরের যে অঙ্গে ব্যাধি সেই অঙ্গেরই চিকিৎসার প্রয়োগ দরকার।

বাংলা সাহিত্য এত দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতেছে যে পূর্ব্বে যদিও বিদ্যাসাগরী যুগ, বঙ্কিমী যুগ, রবীন্দ্রের যুগ ইত্যাদি বলিয়া প্রগতির এক একটা স্তরকে চিহ্নিত করা যাইত কিন্তু এখন দেখা যাইতেছে রবীন্দ্রনাথের আরব্ধ যুগ শেষ হইতে না হইতেই শরৎচন্দ্র নব যুগের সূচনা করিলেন। আবার রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের লেখনীর ধার তীক্ষ্ণ থাকিতে থাকিতেই আর একদল অতি আধুনিক চাঞ্চল্যকর সাহিত্যিকের আবির্ভাব হইয়াছে। উন্নত ধরনের উদ্যানে যেমন নানা জাতীয় কুসুম ইতস্ততঃ প্রস্ফুটিত থাকে বাংলা সাহিত্যেও তেমনি বস্তুতন্ত্র, ভাবতন্ত্র, রূপতন্ত্র ইত্যাদি নানা শ্রেণীর শিল্পাদর্শ মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু মুসলিম সাহিত্যিকরা এখনও কত পশ্চাতে।

ঘটনা বৈচিত্র্য হইতে উপাদান গ্রহণ করিয়া নূতন নূতন শিল্প চাতুর্য্যের প্রকাশ এক প্রেরণা-সাপেক্ষ। প্রেরণার জন্য জাতির সম্মুখে উচ্চাদর্শ চাই। বড় বড় ধর্ম্মীয় আন্দোলন এই জন্য সমাজের পক্ষে কল্যাণকর। মিস্ মার্টিনো বলিয়াছেন, জগতে যদি কোনও ধর্ম্মমত প্রচলিত না থাকিত, আমি সমাজের সম্মুখে উচ্চাদর্শ স্থাপনের জন্য নিজেই একটা ধর্ম্মমতের প্রবর্ত্তন করিতাম। এ সম্বন্ধে রাডল্‌ফ ইউকেন-এর কথাটি প্রণিধানযোগ্য—"We are concerned not with adornment of life but with emergence of new life and new reality." "Awakenings which great religions testify are turning points of a great process." আমি কোনও বিশেষ ধর্ম্মের জন্য propaganda করিতেছি না। বাংলা ভাব-সাধনার দেশ। কেহবা ইহাকে আউল বাউলের দেশ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সীমাকে অতিক্রম করিয়া অজানা এক অসীমের দিকে সদাই এ দেশের লোকের চিত্ত ধাবিত হয়। অসীম কখনও সীমার নিবিড় সঙ্গ চাহে কি না জানি না, কিন্তু—

"সীমা হতে চায় অসীমের মাঝে হারা"।

রবীন্দ্রনাথ ইন্দ্রিয়াতীতকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আবেষ্টনের মধ্যে আনিয়া তাহাকে উপলব্ধি-গোচর করিয়াছেন এবং ইন্দ্রিয়গোচর অনুভূতি-সাপেক্ষ সকল বস্তুকে এক অরূপ এবং অতীন্দ্রিয় জগতের মধ্যে অপূর্ব্ব লীলাবিন্যাসে সজ্জিত করিয়া অফুরন্ত রস উৎসের আয়োজন করিয়াছেন। তাই তাঁহার কাব্য হইয়াছে দর্শন এবং দর্শন হইয়াছে কাব্য। আর সেই কারণেই রবীন্দ্রনাথের কাব্য কখনও পুরাতন মনে হয় না। উহা চিরনবীনত্বে সজীব ও মধুময়। উহা নূতনের চেয়েও নূতন তাই তাকে নবীন বলি আমরা। কবি নিজেই বলিয়াছেন নূতনত্বে আর নবীনত্বে প্রভেদ আছে। নূতনত্ব কালের ধর্ম্ম, নবীনত্ব কালের অতীত। রাজার জয়ধ্বজা আজ নূতন কাল পুরানো, সূর্য্য যে রথে চিরকাল বিহার করছেন, তার অরুণ ধ্বজা নবীন,

www.pathagar.com

কেননা উহা চির নূতন। আমরা যদি শাশ্বত চিরন্তন কোনও কিছুর সঙ্গে আমাদের সংযোগ না রাখিতে পারি তবে আমাদের কাব্য আজ নূতন, কাল পুরাতন হইয়া জীর্ণ পাতার ন্যায় খসিয়া পড়িবে। আর চিরন্তন অসীমের (Transcendental Immanece) জন্য যেখানে প্রেরণা জাগে সেখানে সৃষ্ট হয় এক চিরনবীন রসউৎস যাহা অনন্তকাল ধরিয়া নিরবধি পান করিয়াও লোকের আকাঙ্ক্ষা মিটে না। উপাদানগুলিকে একত্র করিলেই সৃষ্টি হয় না। সৃষ্টি তার অংশগুলির যোগফলের চেয়ে আরও কিছু বেশী। সেই বেশীটুকুই অজ্ঞেয়, যাকে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন রূপরহস্য যাহা সকল সৃষ্টির মূলে প্রচ্ছন্ন। প্রত্যেক সৃষ্টির মধ্যে সেইটাই হইল অদ্বৈত ; বহুর মধ্যে সে ব্যাপ্ত অথচ বহুর দ্বারা তার পরিমাপ হয় না।

সৃষ্টির অর্থই নূতন রূপদান। নূতন প্রাণের নূতন অনুভূতি দ্বারাই তাহা সম্ভব। তাই এই নবীন সঙ্ঘকে আহ্বান করিতেছি নব নব সৃষ্টির দ্বারা আমাদের আনন্দ বর্দ্ধন করিতে।

www.pathagar.com

নবম বার্ষিক অধিবেশনের অভ্যর্থনা-সভাপতির অভিভাষণ

মোহাম্মদ ইব্রাহিম

... (মুসলিম সাহিত্য সমাজের) উপর দিয়া নানারকম ঝঞ্ঝাবাত বহিয়া গিয়াছে। নিজের মানসিক ক্ষুধায় এই শিশু যখন সুখাদ্যের জন্য একদিন চীৎকার করিয়া উঠিয়াছিল, তখন সমাজপতিগণ এ'কে আতুর ঘরেই বিনষ্ট করিয়া দিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। কিন্তু নিজের প্রাণশক্তির জোরে সে-সব বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া, অত্যাচারের হাত হইতে নিজেকে রক্ষা করিয়া এই সমাজ আজ নয় বৎসর টিকিয়া রহিয়াছে।

এই সমাজের নাম 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' হইলেও ইহা একটি সার্ব্বজনীন প্রতিষ্ঠান। ইহার কর্ম্মপ্রচেষ্টা ও দৃষ্টিসীমা শুধু মুসলিম সমাজ ও সাহিত্যের মধ্যেই আবদ্ধ নহে। এ-সমাজ ক্ষুদ্র হইলেও বিশ্বসাহিত্যের প্রতি ইহার দৃঢ়নিবদ্ধ দৃষ্টি, পূর্ণ হইতে পূর্ণতর জীবন-বিকাশের জন্য ইহার আকুল আকুতি। ... যদিও কোন কোন সময় ইহা মুসলমান সমাজ ও মুসলমান সাহিত্যের দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া থাকে, তবু উহা শুধু আত্মবিশ্লেষণের জন্য—বিশ্ব সমাজ ও বিশ্বসাহিত্যের তুলনায় নিজের মূল্য নিরূপণের চেষ্টায়।

দেশের জাতীয় জীবনের বিকাশ-সাধনে মুসলমানের কর্ত্তব্য কি তাহা আমাদের ভাবিয়া দেখা উচিত। ... বাঙ্গালা দেশে জাতীয় জীবনের সাধনায় আজ বাঙ্গালী মুসলমানেরও ডাক পড়িয়াছে। তাই মুসলমানেরও আজ ভাবিয়া দেখা উচিত ... তাহার কি দিবার ও বলিবার আছে।

পঙ্গু শ্রীহীন সমাজকে আজ মুক্ত বুদ্ধি ও সুস্থ মনের অধিকারী করিতে হইলে তাহাকে আঘাত করা অপরিহার্য্য হইয়া পড়িয়াছে। এই সাহিত্য-সমাজ যদি সেই অপরিহার্য্য কর্ত্তব্যপালনে তৎপর হইয়া থাকে, তবে তাহা কোন ব্যক্তিবিশেষ, শ্রেণীবিশেষ বা কোন বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে অশ্রদ্ধা বা অবজ্ঞা করিবার উদ্দেশ্যে নহে, সমাজকে উন্নত করিবার উদ্দেশ্যে। (আংশিক)

www.pathagar.com

নবম বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতির অভিভাষণ

মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী

মুসলিম সাহিত্য-সমাজের বন্ধুগণ,

আপনারা আমাকে আপনাদের বার্ষিক সভার সভাপতি নির্ব্বাচন করে আমার প্রতি গভীর ভালোবাসার পরিচয় দিলেন, এজন্যে আপনাদের অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাই। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ-ও স্মরণ করিয়ে দিই যে, ভালোবাসা সব সময়েই কিছু-না-কিছু দৃষ্টিহীন, এবং সম্ভবতঃ এই কারণেই আপনারা দেখ্‌তে পাননি যে, আমার মতো অভাজনকে আপনাদের মতো জ্ঞানী ও গুণীদের সভার নেতৃত্বের ভার দিয়ে আমার তুচ্ছতাকে আপনারা অনাবৃত কল্লেন এবং তাতে আপনাদেরও প্রচুর অমর্য্যাদা হ'লো। যাঁরা আমার অন্তরের অতি নিকটে বাস করেন, তাঁরা জানেন : সমারোহের সম্মুখের পংক্তিকে আমি কতোখানি এড়িয়ে চলি। তার কারণ : চলিষ্ণু মানুষের সাম্‌নে দাঁড়াবার যোগ্যতা যাঁদের, তাঁদের কাঁধে কাঁধ মেলাবার মতো উচ্চতা সত্যিই আমার নেই। তথাপি আমার খর্ব্বতাকে আপনারা তুচ্ছ কল্লেন, আমার ভীরু পলাতক চিত্তকে প্রীতির কঠিন নিগড়ে বেঁধে নিয়ে এলেন আপনাদের মাঝখানে। আজ আপনাদের মুক্ত পক্ষপুটের তলে যেন আশ্রয় পাই, আপনাদের ভালোবাসার আতিশয্যে যেন অভিভূত না হই-এই আমার অন্তরের পরম প্রার্থনা।

সাহিত্য-সমাজের পক্ষ থেকে প্রথম যেদিন নিমন্ত্রণ গেলো, সেদিন একটি কথা বিশেষভাবে আমার মনে এসেছিলো। বুড়ীগঙ্গার কূলে ঐতিহাসিকের যে-ঢাকা তার আহ্বান আমার কাছে খুব বেশী সত্যি হ'তে পারে না। কিন্তু পুরাতন ঢাকার জীর্ণতাকে ভেদ ক'রে এক নতুন ঢাকা জন্মলাভ কচ্ছে। আলোকপন্থী তরুণ বন্ধুদের চিত্তসুন্দর সাধনা এর প্রথম মাল-মসলা জুগিয়েছে। এর পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে যে-নদী সে বুড়ীগঙ্গা নয়, সে এক নবগঙ্গা যার আসন্ন যৌবন-সম্ভাবনার রূপের ছোঁয়ায়, রসের প্রাচুর্য্যে নতুন ঢাকা ধীরে ধীরে স্ফূর্ত হ'য়ে উঠ্‌ছে আমাদের চোখের সাম্‌নে জীবনশ্রীমণ্ডিত এক অপূর্ব মূর্ত্তিতে। এই নবগঙ্গার কূলের নতুন-পথচারী বন্ধুদের প্রীতিসিক্ত আমন্ত্রণ যখন পৌঁছুলো, তা আমার কাছে মিথ্যে হ'তে পারলো না, আমার যতো-কিছু দৈন্য, যতো-কিছু অক্ষমতা সকলকে আপনার নির্ব্বন্ধে সম্বৃত ক'রে সে আমায় বিনিসূতায় বেঁধে নিয়ে এলো আপনাদের হাতে-গড়া এই তরুণের রাজসভায়।

এ-সভা আপনাদের ; কিন্তু বস্তুতঃ এ কালের সৃষ্টি। প্রাচীনপন্থীদের সব-চাইতে বড়ো দুর্ব্বলতা সম্ভবতঃ এই যে, ইতিহাস নিয়ে, ইতিহাসের বস্তু নিয়ে এরা গৌরব করে, কিন্তু তার প্রাণধর্ম্মকে এরা জানে না, অতীতের স্রোতোধারার যে-বিচিত্র গতি-ভঙ্গিমা তার সঙ্গে যেন এদের পরিচয় ঘটেনি। কালকে এরা নিজেদের মনে খণ্ড খণ্ড ক'রে তার একটিকে মানে দেবতা, আর সবগুলোকেই ভাবে তার অনুশাসনের অধীন। দেখে না যে, মাহাত্ম্য যার যতোটুকু থা'ক সেজন্যে কালের কোনো একটি টুক্‌রোকে অবাধ রাজ-অধিকার দেওয়ার

www.pathagar.com

মানেই একটা বিরাট ফাঁকিকে প্রশ্রয় দেওয়া। এক টুক্‌রো কাল যদি রাজাই হয়, তবু তার পরিপূর্ণ অধিকার তার সীমাতেই আবদ্ধ থাক্‌বে, এই হ'লো জগতের চিরন্তন নীতি। এই সনাতন তথ্যকে ডিঙিয়ে তার পূর্ণ অধিকার যুগ-সীমানার বাইরে বিস্তৃত কত্তে গেলেই বাধ্‌বে দ্বন্দ্ব।

বস্তুতঃ দ্বন্দ্ব বেধেছেও প্রচুর। রাজার যদি অধিকার থাকে, প্রজারও আছে। আমাদের মনে এর চাইতে সোজা কথা আর কিছু হ'তে পারে না, কেননা জগৎ এখন এর চাইতেও সহজতর তত্ত্বে চলে গেছে। এ-যুগ আমরা শুন্‌ছি : প্রজারই অধিকার, রাজা কেউ নয়। আর রাজা যদি থাকেই তো সবাই নিজের নিজের রাজা, সকলের রাজা ; কেউ একজন সকলের রাজা নয়। কিন্তু এতো বড়ো সাহসের কথা বলবার অধিকার পেতে গিয়ে মানুষকে ঢের ঢের লড়াই কত্তে হ'লো। তাতে প্রাচীনপন্থীদের পরাজয়কে কেউ ঠেকিয়ে রাখ্‌তে পার্‌লো না এই জন্য যে, যেখানে দাঁড়িয়ে এদের বিক্রম সেখানে চোরাবালির স্তূপ, তার নীচে শক্ত ভিত্তি কিছু নেই।

আমরা এদের দিকে বেশী দৃষ্টি দেবো না। কালকে টুক্‌রো টুক্‌রো কর্ব্বার চেষ্টা আমাদের কাছে মিথ্যে। আমরা যুগের সন্তান। পিছনে ফিরে আমরা দেখ্‌বো যতোদূর আমাদের দৃষ্টি চলে—কালকে খণ্ডিত ক'রে নয়, বরং যতোদূর সম্ভব অখণ্ডিতরূপে। মানুষের আদিম চিত্ত নানাবিধ আশা-আশঙ্কা ভক্তি-ভয় বিশ্বাস-সন্দেহের সহজ দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়ে বিকশিত হ'তে হ'তে আমাদের অধিকারে চলে এসেছে, এর দিকে আমরা তাকিয়ে দেখ্‌বো, আর তাতেই হয়তো বুঝতে পার্ব্বো : কেমন ক'রে আমরা বর্ত্তমানের বুকে এসে দাঁড়িয়েছি, এবং অদূর ভবিষ্যতে মানুষ যে-পথ-ধ'রে চল্‌বে ব'লে আমরা অনুমান কত্তে পারি তার দিকে কোন্ ভঙ্গিতে আমাদের পা-বাড়ানোর চেষ্টা চল্‌তে পারে।

আদিম যুগ থেকে বর্ত্তমান যুগের আরম্ভ পর্য্যন্ত কালের ধারা অনুসরণ কত্তে গিয়ে আমরা ভূতের পূজা, প্রকৃতির পূজা, প্রাণী-দেবতার পূজা ও মানুষ-দেবতার পূজা থেকে এক নিঃশ্বাসে সর্ব্বশক্তিমান অদৃশ্য ভগবানের ও মানুষের-মারফতে-পাওয়া অলৌকিক জ্ঞানের পূজায় চলে আস্‌তে পারি। কেননা বস্তুতঃ এইখান থেকেই মানুষের ইতিহাসে নবীন যুগ-সম্ভাবনার বেদনা সত্যিকাররূপে অতি করুণ হ'য়ে ফুটে উঠ্‌লো এবং এখান থেকে কাল যতোই এগিয়ে চল্‌লো, ততোই বিশ্বাসকে বুদ্ধির দ্বারা মার্জ্জিত কর্ব্বার আকাঙ্ক্ষা বহু দ্বন্দ্বের মধ্যেও মানুষের মনে বেশ সবল হ'য়ে দাঁড়ালো।

মুস্‌লিম জগতে এই আকাঙ্ক্ষার বলিষ্ঠ প্রকাশ আমরা গ্রীক সাধনার উত্তরাধিকারী মুতাজিল্‌দের মধ্যে প্রথম দেখ্‌তে পাই। এঁদের চিন্তা নির্ম্মুক্তমনে জ্ঞানবিজ্ঞান-চর্চ্চার পথ বেশ খানিক প্রশস্ত করেছিলো। তারপর মুসলিম মনের প্রদীপ্ত আলোকে প্রতীচ্য যখন জেগে উঠ্‌লো, হেলেনিক ও সেমিটিক চিন্তায় এক অপূর্ব সমন্বয় মানুষের চিত্তে বিকশিত হতে লাগ্‌লো। আবার নতুন ক'রে অন্ধতার সঙ্গে তার লড়াই শুরু হ'লো। এ লড়াই যতোই ভীষণ হোক, তার প্রবলতায় দুর্দ্ধর্ষতায় নির্ম্মমতায় যতোই আমরা শিউরে উঠি, শেষে কালগতিই আপনার অনিবার্য্যতায় জয়ী হ'য়ে দাঁড়ালো। এই জয়ের ফলভোগী এ-যুগের মানুষ আমরা।

তথাপি একথা বলিনে যে, মানুষের মুক্তবুদ্ধির দিগ্বিজয় সবখানে সম্পূর্ণ হ'লো। বিশেষভাবে আমাদের কথা যখন ভাবি, তখন মনে হয় : প্রাচীনপন্থীদের উদগ্র লড়ুয়ে মনের যেন অন্ত নেই। একালের আগে আমীর খসরু, আকবর, আবুল ফজল, দারা প্রভৃতির বিচিত্র

www.pathagar.com

চিত্ত-বিকাশ আমরা বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করি, কিন্তু জয় তাঁদের মুঠার মধ্যে এলো না। এবং বিশেষ ক'রে একালে আমাদের রাষ্ট্রীয় ও ধর্ম্মীয় জীবনের গাঢ় অন্ধকারে আপনার অন্তরের প্রদীপ জ্বেলে যখন এগিয়ে চল্লেন সৈয়দ আহ্‌মদ, শুরু থেকেই নিষ্কন্টক পথ তাঁকে অভিনন্দিত করলো না। মুতাজিল্‌দের বুদ্ধি নিয়ে অপৌরুষেয় জ্ঞানকে লৌকিক জ্ঞানের সঙ্গে যুক্ত করবার প্রয়াস তিনি কল্লেন। চারদিক থেকে সুতীক্ষ্ণ বিষাক্ত অস্ত্র তাঁর উপর পড়তে লাগ্‌লো। সারাটী অঙ্গ তাঁর জর্জ্জরিত হ'লো, কিন্তু আপনার অস্থি দিয়ে তিনি যে-বজ্র রচনা ক'রে গেলেন, সে হ'লো একেবারে অমোঘ। এর সাম্‌নে প্রাচীনপন্থীরা ভয়ে ভয়ে পিছিয়ে গেলো, সৈয়দ আহ্‌মদের নতুন অস্ত্রের দাহন হ'লো জয়ী।

এইখানে আমরা ওহাবী আন্দোলনের দিকে একটীবার তাকিয়ে নিই। এর রাষ্ট্রিক রূপের চাইতে ধার্ম্মিক রূপটাই যেন একটু বেশী স্পষ্ট। সম্ভবতঃ রাষ্ট্রিক রূপ এর দৈব, ধার্ম্মিক রূপই হ'লো এর নিজস্ব। দূর অতীতের একটি যুগ তার মৌলিক রূপে যে-যে বৈশিষ্ট্য নিয়ে কালের অঙ্গে ফুটে উঠেছিলো, তার দিকে এর দৃষ্টি যেমন প্রখর অতীতমুখী, তার কোনো আন্দোলনই হয়তো তেমন নয়। যে-নদী তার মূল-উৎস থেকে চির-প্রবহমান কালের ধারা বেয়ে চলে এলো, পথের অনেক ফুলপাতা, অনেক আবর্জ্জনা তার অঙ্গে অঙ্গে জড়িয়ে গেলো। শেষে ফুলপাতা ও আবর্জ্জনা মিলে হ'লো একাকার। তার জড়ত্বের প্রাচুর্য্যে স্রোতস্বিনীয় স্রোত গেলো রুদ্ধ হ'য়ে। কাল দাঁড়াবার নয়, সে এগিয়ে চল্‌লো। ওহাবীর ক্রুদ্ধ দৃষ্টি পড়্‌লো আবর্জ্জনার উপর। মুমূর্ষু নদীকে বাঁচাবার এক অদ্ভুত উপায় সে ঠাওরালো। তার মনে হ'লো : যার জড়ত্বের ভারে এর এই দুর্দ্দশা, তাকে ঝেড়ে ফেলে আবার এক মূল-উৎসের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে গেলেই এর মুক্তি হবে, আগেকার শক্তিকে এ আবার ফিরে পাবে, নতুন ক'রে এর দেহে প্রাণ-সঞ্চার হবে।

ওহাবীর মমতাকে আমরা জানি। কিন্তু মমতা অতি সহজেই মানুষকে ভুল পথে চালিয়ে দিতে পারে। ওহাবী তার ভালোবাসার উগ্রতায় দৃষ্টিকে যেন হারিয়ে ফেল্‌লো। বুঝ্‌লো না যে, বাঁচার একমাত্র অর্থ কালগতির সঙ্গে সঙ্গে বাঁচা, তার পিছনে প'ড়ে নয়। তার চেষ্টা হ'লো মৃতপ্রায় নদীটাকে পিছনের দিকে চালিয়ে দেবার, সাম্‌নের পথ সে কাট্‌লো না। পথের যা-কিছু দান-তার ফুলপাতা, তার ধূলামাটি, তার আবর্জ্জনা—সবকেই তার বিষম ভয়।

এই জন্যে ওহাবীর চেষ্টা ব্যর্থ হ'লো। কিন্তু তার নাড়াচাড়ার চমৎকার একটা ফল ফল্‌লো। অতীতের জলধারা যেখানে এসে আপনার দেহের জড়ত্বে থম্‌কে দাঁড়িয়েছিলো ওহাবীর দণ্ড নেমে এসে সেখানে একটা প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি কর্‌লো। তাতে তার যে-আকাঙ্ক্ষা সেটি পূর্ণ হ'লো না, কিন্তু দেওবন্দ্ সম্ভব হলো, সৈয়দ আহমদ বুদ্ধির নিকষে অপৌরুষেয় জ্ঞানের যে-যাচাই শুরু কল্লেন সে-ও সঙ্গত হলো, গ্রহণীয় হ'লো। শেষে এমন দিন এলো, যখন ওহাবী-অনওহাবী দুই দলেরই এক এক অংশে যুক্তি তাদের কতকটা অজ্ঞাতসারেই আপনার আসর জমিয়ে নিলে। তাদের চিত্তের এক নতুন প্রকাশ, তাদের প্রচারের এক অভিনব ভঙ্গিমা আমরা দেখ্‌তে পেলুম।

এখান থেকে খানিকটা পিছিয়ে একটি বিপুল চিত্তের দিকে আমরা দৃষ্টিপাত করি। ইনি বহুপ্রশংসিত রাজা রামমোহন রায়। হিন্দুর যে-সব ধর্ম্মীয় আচার ও প্রথার বিরুদ্ধে তিনি লড়াই কল্লেন, তাদের পিছনে ইসলামের কোনো সমর্থন ছিলো না। বরং এ-কথা বল্লে বোধ

www.pathagar.com

হয় বেশী ভুল বলা হবে না যে, প্রতীচ্য মনীষীদের সঙ্গ ও শিক্ষা রাজার দৃষ্টিতে যতোখানি মুক্ত করেছিলো, তা সম্ভব হয়েছিলো এই কারণে যে এদেশে ইসলাম ছিলো এবং ইসলামের শাস্ত্রের সঙ্গে, মুসলমান সমাজের সঙ্গে তাঁর অন্ততঃ খানিকটা আত্মীয়তা জন্মেছিলো। বস্তুতঃ মুসলমানের প্রতিবেশ প্রভাব শুধু যে তাঁকে দৃষ্টি দিয়েছিলো তা নয়, তাঁকে সাহস দিয়েছিলো, শক্তি দিয়েছিলো। এ-ও আমরা জানি যে, রাজপুরুষদের পৃষ্ঠপোষকতা ছিলো রাজার একটি বড়ো অবলম্বন। তথাপি তিনি যে সমাজের বিপুল বিরুদ্ধ শক্তির সঙ্গে লড়াইয়ে নেমে জয় অর্জ্জন করেছিলেন, এর জন্যে প্রশংসা ন্যায়ত এবং প্রধানত তাঁরই প্রাপ্য। কিন্তু এই অবিসম্বাদিত স্বীকারোক্তির সঙ্গে সঙ্গে আমরা স্মরণ রাখবো যে, তাঁর নিঃশঙ্ক সাধনায় ইসলাম বাধা দেয়নি, সমর্থন দিয়েছিলো।

এইভাবে ইসলাম ও মুসলমান রাজার জীবনে ক্রিয়াশীল হ'লেও উত্তরকালে মুসলমানের জীবনেও রাজার যুক্তিবাদিতার প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিলো। তিনি যখন হিন্দু আচার ও প্রথার বিরুদ্ধে যুক্তি দিতে শুরু কল্লেন, তখন তিনি ইসলামের বা ক্রিশ্চানিটির দোহাই দিলেন না। সত্যের উপর, যুক্তির উপর, মানুষ-জীবনের মহিমা ও পবিত্রতার উপর তিনি জোর দিলেন। যারা তাঁর প্রাণ নিতে এসেছিলো, তাদের হলো পরাজয়। এইভাবে ধর্ম্মীয় আচার ও প্রথার উপরে রামমোহন বুদ্ধিকে জয়ী ক'রে গেলেন। ধর্ম্মের সঙ্গে বুদ্ধির মুকাবিলায় এক নূতন পরিস্থিতির সৃষ্টি হ'লো। মুসলমানেরও চেতনায় এই পরিস্থিতি অংশতঃ সত্যি হ'লো নিশ্চয়ই, কিন্তু কিছু বিলম্বে।

বিলম্বের দু'টো কারণ স্বতই আমাদের মনে আসে। প্রথমতঃ, রাজা রামমোহন রায়ের নব-হিন্দুত্ব সত্যনিষ্ঠা ও যুক্তিবাদিতাকে আশ্রয় ক'রে তাঁর জীবনে যে-যে চেষ্টায় আত্মপ্রকাশ করেছিলো, তার অধিকাংশই প্রাচীনপন্থী মুসলমানের দৃষ্টিতেও অসাধারণ ঠেকবার কোনো কারণ ছিলো না। দ্বিতীয়তঃ রাজার যুক্তিপ্রীতির বহিঃপ্রকাশ হয়েছিলো যে-যে দ্বন্দ্বে, তাকে ডিঙিয়ে শুধু তাঁর মনের সাহস ও সত্যানুরাগকে একান্তভাবে দেখ্‌তে গেলে যে-চোখের দরকার তাকে মুসলমান পেয়েছিলো বিলম্বে—তার সমাজে প্রতীচ্য শিক্ষা ও চিন্তার প্রভাব বিস্তৃত হবার পর।

তথাপি এ-কথা স্বীকার কত্তে বাধা নেই যে, যতোই বিলম্বে হোক রাজা রামমোহন রায় তাঁর প্রতিষ্ঠিত নতুন সমাজের মধ্যে যে-নবজাগ্রত একটি মন রেখে গেলেন, তার কিছু প্রভাব মুসলিম মনের উপর পড়েছিলো—বিশেষ ক'রে তখন, যখন আলীগড়ের সৈয়দ আহমদ এবং বাংলার আবদুল লতীফ প্রতীচ্য শিক্ষা বিস্তারের জন্যে মুসলমানের অন্ধতার সঙ্গে অবিরত সংগ্রাম চালিয়ে জয়ী হলেন। অবশ্যি পরিপূর্ণ জয় যে এই দুই মহামানুষের হাতের মুঠার মধ্যে এসেছিলো, একথা বল্‌তে কিছু বাধা পাই। তাঁদের মন, তাঁদের পরিবেশ, তাঁদের যুগ, প্রাচীন অন্ধতা ও কুসংস্কারের ভিত্তিমূল সম্পূর্ণরূপে উচ্ছিন্ন কর্ব্বার যোগ্যতা হয়তো তাঁদের দেয়নি। এইজন্যে অন্ততঃ শিক্ষার ক্ষেত্রে তাঁরা পুরাতনের সঙ্গে খানিক সন্ধি করেছিলেন। কিন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষা ও চিন্তার স্রোত মুসলমানের মরানদীর সঙ্গে মিলিয়ে তাঁরা আপনাদের ক্ষুদ্র পরাজয়কে তাতে ভাসিয়ে দিলেন। পুরাতনে এবং নবীনে যে-অনিবার্য সংঘর্ষ তাকে ঘোরতর কর্ব্বার পথ তাঁরা রচনা কল্লেন। হয়তো তাঁদের আশা হ'লো ঃ নতুন আলোকের প্রদীপ্ত প্রভায় প্রাচীন অন্ধতার যেদিন পরাজয় ঘটবে, সেই দিন তাঁদের পরাজয়ের কলঙ্কলেখা মানুষের ললাট থেকে ধুয়ে মুছে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যাবে।

www.pathagar.com

তাঁদের আশা ব্যর্থ হ'লো না। তাঁদের রচিত পথ ধ'রে মানুষের যাত্রা শুরু হলো। আবদুল আজীজ, হেমায়েৎ উদ্দীন, আবদুল মজীদ প্রভৃতি তরুণেরা আপনাদের পরিবেশ থেকে অনেকখানি স্বতন্ত্র হ'য়ে নতুনের পতাকা বহন ক'রে এগিয়ে চল্লেন। পাশ্চাত্যের শিক্ষাকে এঁরা গ্রহণ কল্লেন, মাতৃজাতির মনের অন্ধগুহায় প্রদীপ জ্বেলে তার আলোকে গৃহকে পরিস্নাত কর্ব্বার—বাংলার সাহিত্যকে স্বীকার ক'রে বাঙালী মুসলমানের মূক মুখে আবার জীবনের ভাষা ফিরিয়ে দেবার সাধনা হ'লো তাঁদের। ঢাকা সুহৃৎ সম্মিলনী হলো তাঁদের যুক্ত সাধনার কর্ম্মকেন্দ্র। এইখানে সম্মিলিত হ'য়ে সুহৃৎ সাধকেরা নানাভাবে আপনাদের কল্যাণ-প্রয়াসকে বিস্তৃত কত্তে লাগ্‌লেন। দিকে দিকে তাঁদের জীবনের আহ্বান ধ্বনিত হ'লো। তাঁরা মানুষের বুকে আশা, মুখে ভাষা দিয়ে তাদের বিপুল সম্ভাবনাকে নন্দিত কল্লেন।

বাংলার আর এক প্রান্তে দেখা দিলেন আমীর আলী, খোদাবক্‌শ, আবদুর রহীম, আবদুল্লাহ্ প্রভৃতি নতুন-পথচারীর দল। তাঁরা নতুন চোখে জগতের দিকে তাকিয়ে দেখ্‌লেন। বাঙালীর ভাষাকে তাঁরা স্বীকার কল্লেন না। এইজন্যে বাংলার মুসলিম সমাজের সঙ্গে তাঁদের যোগ সম্পূর্ণ হ'তে পারলো না। তাঁদের চিত্তকে বাংলার মাটীতে সফল কর্ব্বার জন্যে আর একদল মানুষের আবির্ভাব আমরা প্রত্যক্ষ করি। পাশ্চাত্য শিক্ষাকে তাঁরা বিশেষভাবে স্বীকার কল্লেন না। কিন্তু তাঁরা আমাদের প্রাণের ভাষাকে জাগিয়ে তুল্লেন, এবং পাশ্চাত্য শিক্ষার কাছ থেকে যে-নতুন জ্যোতির প্রত্যাশা ক্রমশঃ সবল হ'য়ে উঠ্‌ছিলো, তার অঞ্জন তাঁরা সস্নেহে আমাদের চোখে মাখিয়ে দিলেন। আমীর আলী প্রভৃতি বাঙালী মুসলমানের অন্তর্দ্দেশ থেকে বেশ খানিক স্বতন্ত্র হ'য়ে গেলেন ; কিন্তু তাঁদের চিত্তকে আমরা পেলুম পণ্ডিত রিয়াজউদ্দীন, মেয়ারাজউদ্দীন, রিয়াজউদ্দীন, মোজাম্মেল হক, আবদুর রহীম প্রভৃতি বাঙালি বন্ধুদের হাত দিয়ে।

এইভাবে অনেক সাধকের সাধনা, জ্ঞানপ্রীতি ও সমাজহিতৈষা আমাদের জন্যে নতুন পথ রচনা ক'রে গেলো। এখানে দাঁড়িয়ে জগতের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হলো অভিনব। চারিদিকের মানুষের মনের নাড়া পেয়ে তার প্রতি আমাদের দৃষ্টি যেন ওহাবীর পুরাতন প্রত্যাশাকে বিদ্রূপ ক'রে বেশ একটু সজাগ হয়ে উঠলো। অপৌরুষেয় জ্ঞানের উপাসকরাও ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় ধর্ম্মবিধানের সমর্থনে নানারূপ যুক্তি উপস্থিত কত্তে শুরু কল্লেন।

অবশ্যি ফেক্‌হ্ ও ওসুলের যুগেও একপ্রকার যুক্তিচর্চ্চা হয়েছিলো। তখনো ধর্ম্মীয় সূত্র থেকে অবরোহ পদ্ধতিতে যুক্তি খাটিয়ে নানারূপ ব্যবস্থা ও অনুশাসন বের কর্ব্বার প্রথা আমরা দেখ্‌তে পাই। কিন্তু তার সঙ্গে নবযুগের এই নব মনোভাবের পার্থক্য সুস্পষ্ট। ফেক্‌হর কোনো ব্যবস্থার মূলসূত্রের সন্ধান আমরা যেখানে পাই, ধর্ম্মীয় বিধানের সমর্থনে ন্যায় ও যুক্তি উপস্থিত কর্ব্বার জন্যে সেখানে যাওয়ার দরকার হ'লো না। প্রাচীনপন্থীদের এই নব মনোভাব যেখানে যেখানে বাসা বাঁধলো তার মধ্যে আঞ্জুমানে-ওলামায়ে-বাঙ্গালার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ ও মওলানা মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী এর কর্ম্মীদের অগ্রণী। এতোদিন এঁরা ছিলেন মুসলমানের গণ্ডীর মধ্যে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে বিবাদ নিয়ে। কিন্তু নানারূপ ঘাত-প্রতিঘাত ও ঘটনা-পরম্পরার ভিতর দিয়ে এঁরা যখন বাইরে চলে এলেন, নতুন পরিবেশের তাগিদে শাস্ত্রশাসনের পক্ষে যুক্তি উপস্থিত কর্ব্বার প্রয়োজন প্রবলভাবে এঁদের সামনে এসে দাঁড়ালো। এঁরা তখন

www.pathagar.com

নিঃসঙ্কোচে অতিশাস্ত্রীয় জ্ঞানের আশ্রয় নিলেন। দেখলুম : অবশ্যপালনীয় উপাসনা ও উপবাসের পক্ষেও বুদ্ধির সমর্থন খুঁজতে এঁদের বাধা হ'লো না।

এঁদের এই যে নতুন মন, এর গভীরতা, ব্যাপকতা ও পূর্ণ সম্ভাবনার দিকে এঁদের দৃষ্টি পড়েনি কোনোদিন। কিন্তু সত্যিই যে-শিশু জন্মলাভ করলো, তার কৈশোর আস্‌বে, যৌবনের জোয়ারে সে একদিন ভেসে চল্‌বে দুর্ব্বার গতিতে, এটী কোনো নতুন কথা নয়। অথচ যাঁদের গৃহে শিশু লালিত হ'লো তাদের স্নেহচ্ছায়ায় কবে যে সে বেড়ে উঠ্‌লো তার খবর তাঁদের নেই। তাঁরা একদিন তরুণের আবির্ভাব দেখে তার আকস্মিকতায় একেবারে চম্‌কে উঠ্‌লেন। বল্লেন ঃ আমাদের ঘরের ছেলে এ নয়, কোন্ এক সংশয়সমাকীর্ণ অজ্ঞাত রাজ্য থেকে এ আমাদের গ্রাস কত্তে এসেছে! ভয়ানক সর্ব্বনাশের কথা! চারিদিকে মহাকোলাহল শুরু হ'লো। কলকাতায় সওগাতী দল, প্রাতিকা, ক্ষণস্থায়ী সাহিত্য-সংসদ, পরিশীলন সমিতি, এন্টি-মোল্লা লীগ, ঢাকায় মুসলিম সাহিত্য-সমাজ, শিখা, ওদুদী দল প্রভৃতি মূর্ত্তি ধ'রে পিতৃবর্জ্জিত তরুণ বিভীষিকার সৃষ্টি কত্তে লাগ্‌লো।

কিন্তু সত্যিই এতে বিভীষিকার কোনো কারণ ছিলো না। প্রাচীনপন্থীরা হয়তো আশা করেননি যে, কাঠের ঘোড়া ছেড়ে তরুণ সত্যিই একদিন জীবন্ত ঘোড়ার পিঠে গিয়ে আসন পাত্‌বে, এবং তার স্ফূর্ত্তিমান নিঃশঙ্ক গতির দাপটে পথের বাধা গুঁড়িয়ে চূর্ণ হবে। কিন্তু তাঁরা আশা না কর্‌লেও শিশুর চোখ খুল্‌লো, কারুর হাত ধ'রে চল্‌বার বয়স তার আর নেই। এখন সে স্বস্থ বলিষ্ঠ জীবনের সন্ধানে ব্যস্ত। বল্গার অন্যায় শাসন সে মান্‌বে না এবং মানবে না যে, তার একটা প্রমাণ আপনারা—আপনাদের এই সাহিত্যসমাজ।

এই জন্যেই বলেছি ঃ আপনাদের সমিতি যতোই আপনাদের হোক বস্তুতঃ এ কালের সৃষ্টি। এক এক টুক্‌রো কালের রাজ্যাধিকারের দাবী সত্যি নয়। তার কোলে পরবর্ত্তী কাল লালিত হয়েছে ব'লে পিতৃত্বের দাবী সে কত্তে পারে। কিন্তু তরুণ তার পিতৃপুরুষের যে-মত ও পথ তাকে নেবেই—এ আশা পূর্ণ হবার নয়। যুগের পর যুগ ছুটে চলেছে অনাগত অনন্ত কালের দিকে। এরই সঙ্গে তরুণের তাজা মন মার্জিত বুদ্ধির আলোকে স্নান ক'রে এগিয়ে যাচ্ছে নব নব তত্ত্বের সন্ধানে,—বিশ্বের অণু-পরমাণুতে যে-সক্রিয় সচেতন চিত্ত বিরাজ কচ্ছে তার সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপনের জন্যে। সে অনিবার্য্য, সে অমৃত ; কালের রাজটীকা তার ললাটে প্রদীপ্ত।

বিশ্বের এক যুগসন্ধিক্ষণে এসে আমরা দাঁড়িয়েছি। এখানে তরুণ বন্ধুদের আমরা বিশেষভাবে স্মরণ করি। যাঁরা বয়সে তরুণ, বিশেষ ক'রে তাঁদের কথাই আমার মনে পড়লো। বর্ত্তমানে তরুণ আন্দোলন নামে যে-জিনিষটি যুগপৎ কীর্ত্তি এবং নিন্দা অর্জ্জন ক'রে চলেছে, তার মর্ম্মকে ছেড়ে যেন বাইরের দিকে আমাদের দৃষ্টি বাঁধা না পড়ে, এটী অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে আমাদের দেখ্‌তে হবে। সত্যিকার কল্যাণ-জিজ্ঞাসা এবং নির্ম্মুক্ত বুদ্ধি যেখানে নেই, সেখানে তরুণ আন্দোলনের পোষাক থাক্‌তে পারে, কিন্তু তার মনটীকে কখনো পাবো না, নতুন যুগের বাণী যে-তত্ত্বে যে-ভাবেই আমরা লাভ করি, তাকে আমাদের ভয় নেই। প্রাচীন জীর্ণ সংস্কারকে জড়িয়ে যে-জীবন গ'ড়ে উঠ্‌লো, তার উপর মুক্তবুদ্ধি মুক্তদৃষ্টি বিজ্ঞানবাদীর হাত থেকে যতো বড়ো কঠিন আঘাতই নেমে আসুক, তার নির্ম্মমতার ব্যথা আমাদের প্রাণে বাজবে না। মানুষে মানুষে সম্পর্ক, নর-নারীর যৌন সম্বন্ধ, অর্থাধিকারের

www.pathagar.com

বিলি-ব্যবস্থা, রাষ্ট্র-চালনার পদ্ধতি ও অধিকার—এ-সব নিয়ে পুরাতন ব্যবস্থার যতো বড়ো বিরুদ্ধ তত্ত্বই আমাদের কাছে স্বীকৃতি দাবী করুক, বিজ্ঞান ও যুক্তিকে আশ্রয় ক'রে শ্রদ্ধা ও সততার সঙ্গে তাকে জান্‌তে ও বুঝতে আমাদের বিন্দুমাত্র অসম্মতি থাকবে না। এই হ'লো তরুণের বুদ্ধি, এই হ'লো তার নির্ম্মুক্ত মনের ভাবগতি। এর কষ্টিপাথরে যার অকৃত্রিম পরিচয় প্রস্ফুট হ'য়ে উঠ্‌বে না, তরুণ আন্দোলনের সঙ্গে সে সংযুক্ত নয়, জীবনে সত্যিকার ভোগের অধিকার সে পায়নি।

অর্থাৎ তরুণদের মনের দরজায় সদাজাগ্রত প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে থাক্‌বে নির্ম্মম ও স্বচ্ছ যুক্তিবাদিতা। যুক্তিকে আশ্রয় ক'রে, বিজ্ঞানকে ভিত্তি ক'রে পরিবার সমাজ, রাষ্ট্র কিভাবে নতুন ক'রে গড়ে উঠতে পারে, তার অনেক পরিকল্পনা আমাদের সাম্‌নে আস্‌ছে। সবগুলোর দিকেই আমরা চোখ ভ'রে তাকাবো। যেটা আমাদের নির্ম্মুক্ত বুদ্ধির কষ্টিপাথরে টিকে যাবে, তাকেই আমরা গ্রহণ কর্ব্বো, আর কোনোটীকে মমতা ক'রে পুষে রাখবো না।

কিন্তু এরি মধ্যে কথা উঠ্‌ছে : নির্ম্মম যুক্তিকে আশ্রয় করে মানুষের মন টিকবে কিনা। মুক্ত বুদ্ধি ও যুক্তিবাদিতার নির্ব্বল অধিকার আমাদের জীবনে প্রতিষ্ঠিত হ'লে মানুষ-প্রাণীটি না মর্‌তে পারে, কিন্তু যে-মন, যে-রসানুভূতি মানুষকে কর্‌লো মানুষ, তার অধিকার কতোখানি সঙ্কুচিত হবে? এবং সঙ্কুচিত কত্তে কত্তে যদি তাকে আমরা একদম বেদখল করি, তা'হলে তার ফল কি দাঁড়াবে? অর্থাৎ দয়া-মায়া, স্নেহ-কোমলতা, ভক্তি-ভালোবাসা প্রভৃতি যে-সকল অনুভূতি থেকে বিযুক্ত করে মনকে আমরা ভাব্‌তে পারিনে, তাদেরে মেরে ফেলে জীবন চলবে কিনা?

এ-সকল প্রশ্নে চম্‌কে উঠ্‌বার কোনো কারণ এখনই আমরা দেখ্‌তে পাইনে, কেননা বর্ত্তমানে সত্যিই এদের খুব বেশী সার্থকতা নেই। যুক্তিবাদ ও বিজ্ঞানবাদকে আমরা এ যুগে যে-রূপে পেয়েছি, হয়তো দূর ভবিষ্যতে সে-রূপে এদের পাওয়া যাবে না। কিংবা আপোষহীন যুক্তিবাদিতার সঙ্গে, এখন যাকে আমরা রসাবিষ্ট মন বল্‌তে পারি তার যদি সত্যি-সত্যিই কোনো শক্ত লড়াই বেধে ওঠে, তখন মনই হয়তো আপনাকে সাম্‌লাবে। অর্থাৎ মনের ভাবাবেগ যে-ছন্দে, যে-রূপে যে-গতিতে চল্‌ছে ব'লে আমরা মান্‌ছি, তাতে হয়তো এক অদ্ভুত রকমের পরিবর্ত্তন দেখা দেবে। বস্তুতঃ প্রাচীন কাল থেকে যে-বিশিষ্ট পরিবেশে মানবমনের ভাবালুতা এক বিশিষ্টরূপে বিকশিত হ'লো, সেটী যখন বদ্‌লে যাবে, তখন তার ঐ রসাবেশ কিভাবে থাক্‌বে এবং প্রবল হ'য়ে থাকবে, কি আদতেই থাক্‌বে না—এ-সব নিয়ে কতো তর্ক আমরা কর্ব্বো? তর্ক যদি অপরিহার্য্যই হয়, তথাপি তাকে আমরা এখনই কেন এতো প্রবল করে তুলবো যাতে জ্বলন্ত জীবন্ত বর্ত্তমানের যুক্তিবাদ ও বিজ্ঞানবাদের কল্যাণ-সম্ভাবনা ব্যর্থ ও ব্যাহত হতে পারে? বস্তুতঃ মনের অতীতপুষ্ট প্রকৃতির সঙ্গে বিজ্ঞানসম্ভাবিত জীবনের বিরুদ্ধতা কল্পনা কত্তে গিয়ে যে-প্রশ্ন আবছায়ার মতো আমাদের সাম্‌নে এসে দাঁড়াচ্ছে, তাকে নিয়ে বর্ত্তমানে একান্ত মমতার সঙ্গে লালন কর্ব্বার প্রয়োজন যদি আমরা স্বীকার করি, চরম-সত্য-সন্ধানের অবাঞ্ছিত ঘূর্ণিপাকে আমরা দিশাহারা হ'য়ে পড়্‌বো। তাতে মানুষের ভবিষ্যৎ বিপন্ন হবে, এবং মানুষ তার উচ্চতা সম্বন্ধে ধীরে ধীরে যে-চেতনা অর্জ্জন কচ্ছে তাকে সে হারাবে। এটী বস্তুতই আমাদের লাভের বিষয় নয়।

www.pathagar.com

অথচ বর্ত্তমান ক্ষতিকন্টকিত জীবনে কিছু লাভ আন্‌বার প্রয়াস আমাদের। ক্ষতিকে আমরা কামনা করিনে। এবং আপনাদের সাহিত্য-সমাজ যে এতো ঝঞ্ঝাবাতের মধ্যে বেঁচে আছে, তারও এই কারণ। ক্ষতিকে বিদূরিত ক'রে মঙ্গলের জন্যে আমরা স্থান রচনা কর্ব্বো, এই আমাদের পণ। সাহিত্যের সাধনাকে আমি কল্যাণের সাধনা ব'লেই মানি। এইখানেই আপনাদের সাহিত্য-সমাজের সঙ্গে কল্যাণলিপ্সু মনের গভীর যোগ। কল্যাণজিজ্ঞাসা যুগ-দ্রষ্টাদের কাছে আমরা যে-ভাবে পেলুম তাকে অতিআপনার করে যেদিন পাওয়া যাবে, সেই দিন সাহিত্য-সমাজ—সাহিত্য-সমাজের সঙ্গে আমাদের সংযোগ—সত্যি হবে, সার্থক হবে।

অর্থাৎ আমাদের মনে সাহিত্য-সমাজের জন্যে যে-একটি বিশিষ্ট স্থান রচিত হলো, তার প্রধানতম কারণ এর পতাকায় অঙ্কিত 'বুদ্ধির মুক্তি'-বাণী এবং এর পিছনে বিরাজ কচ্ছে যে-মন, তার একান্ত মঙ্গল-লিপ্সা। এই মনটীকেই আমি বিশেষ ক'রে দেখ্‌লুম এবং ওকে যতোটুকু জেনেছি আপনাদের কাছে নিবেদন কল্লুম। আমাদের দেশে সাহিত্যের ভিতর দিয়ে কিভাবে এ আত্মপ্রকাশ কর্‌লো, সেটী বিশেষভাবে আপনাদের দেখ্‌বার বিষয় এই জন্যে যে, আপনাদের পতাকা যেখানে উড়ছে সে-স্থানটী হ'লো সাহিত্যের। এখানে দাঁড়িয়ে এবং আপনাদের পতাকার বাণীকে স্মরণ ক'রে আমি আপনাদের দৃষ্টির পশ্চাতে পশ্চাতে চলি। প্রথমেই দেখতে পেলুম রাজা রামমোহন রায়কে।

ইংরাজের সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্যের শিক্ষা, সভ্যতা ও চিত্তের অন্ততঃ খানিকটা এদেশে এলো। তার শক্তির আলোকে ইসলাম ধর্ম্ম ও মুসলিম সমাজের পরিবেশ অনেকখানি স্পষ্ট হ'য়ে উঠ্‌লো ; আর তখনই রাজা রামমোহন রায়কে আমরা পেলুম। শাস্ত্রীয় ও সামাজিক আচারের উপরে বিচারকে ইনি স্থান দিলেন। এঁর লেখনী ও কর্ম্মপ্রয়াস সমান তেজে চারিদিকের মনকে আকর্ষণ কত্তে লাগ্‌লো।

এঁর পরে যাঁরা এলেন, তাঁরাও সমস্যা নিয়ে লিখ্‌লেন, কাজ কল্লেন। কিন্তু তাঁদের আগমন-পথ রচনা করে গেলেন রামমোহন রায়। কালানুসারে রামমোহনের পর রামতনু লাহিড়ী, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঈশ্বররন্দ্র বিদ্যাসাগর, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রাজনারায়ণ বসু, নবাব বাহাদুর আবদুল লতীফ, বঙ্কিমচন্দ্র ও শিবনাথ শাস্ত্রীর নাম সহজেই আমাদের চিত্ত আকর্ষণ করে। এঁদের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র, ভূদেব ও বঙ্কিমচন্দ্র হলেন সনাতনপন্থী হিন্দু। কিন্তু হিন্দু হ'লেও রামমোহন যে-মনটী বাঙালী সমাজের এক কোণে রেখে গেলেন, তার উত্তরাধিকারিত্বের দাবী এঁদেরও কিছু ছিল। এবং যদিও এঁদের বুদ্ধি প্রাচীন হিন্দুত্বের সমর্থনেই নিয়োজিত হ'লো, তথাপি ঈশ্বরচন্দ্র অন্ততঃ বিধবার বেদনাকে মানুষের অন্তর দিয়ে অনুভব কল্লেন, ভূদেব বুদ্ধিসহযোগে সমাজের কিঞ্চিৎ সংস্কার কামনা কল্লেন এবং বঙ্কিমচন্দ্র অবতার কৃষ্ণের কলঙ্ক স্খলন ক'রে তাঁকে যেন মানুষের পংক্তিতে এনে বসালেন। আবদুল লতীফও কিছু কিছু লিখ্‌লেন, কিন্তু তার চেয়ে কাজ কল্লেন ঢের ঢের বেশী। তাঁর কর্ম্মময় জীবন এবং পারিপার্শ্বিক কুসংস্কারের কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধে তাঁর চিন্তা আমরা সশ্রদ্ধ বিস্ময়ের সঙ্গে প্রত্যক্ষ করি। তাঁর উপরে রামমোহনের প্রভাব কতোখানি পড়েছিলো, এ-প্রশ্ন এখানে আমাদের কাছে হয়তো বেশী প্রয়োজনীয় নয়। কেননা বাঙালীর ভাষাকে বিশেষভাবে স্বীকার না ক'রেও বাঙালী সমাজের সঙ্গে তাঁর যে-ঘনিষ্ঠতা তার ভিতরে যদি বা তিনি রামমোহনের স্পর্শ পেয়েছিলেন, তথাপি সেটী সাহিত্যের নয়, সে বরং তাঁর সাহসের, তাঁর শক্তিমান মনের।

www.pathagar.com

এর পরই মুসলমানদের মধ্যে নতুন ক'রে সাহিত্যিক চেতনার সঞ্চার হ'তে শুরু করলো, কিন্তু তাদের সাহিত্যে সচেতন বুদ্ধির প্রকাশ এরও পরের কথা। মশার্‌রফ হোসেনের মধ্যেই একটা বলিষ্ঠ মনের দৃঢ়তা আমরা প্রথম লক্ষ্য করি। শাস্ত্রীয় শাসনের রক্ষচক্ষুর সম্মুখেও তাঁর উন্নতশির দেখে আমরা বিস্মিত হই। এঁর পরে যাঁদের আমরা পেলুম তাঁদের মধ্যে কাজী ইমদাদুল হক ও সিরাজীর জন্যে আমাদের অন্তরে একটী বিশিষ্ট স্থান রচিত হ'লো।

এঁদের সমসময়ে বাংলার মুসলিম সমাজে জেগে উঠেছিলো অপূর্ব্ব ভঙ্গিমায় একটী বিশাল নারীচিত্ত। মাতৃজাতির মুক্তিকামনাকে সমাচ্ছন্ন করেছিলো মুসলমানের যে-গভীর অন্ধতা, মিসেস আর. এস. হোসেন তাকে নির্ম্মমভাবে আঘাত কল্লেন। তাঁর মনের বিচিত্র বিভা বিচ্ছুরিত হ'লো শিক্ষার ক্ষেত্রে, নারীর কল্যাণ আয়োজনে, তাঁর সুন্দর সাহিত্যিক প্রয়াসে। তিনি আমাদের গৃহে গৃহে যে-মঙ্গলদীপ জ্বেলে গেলেন, তার আলোকে নারীর অগ্রগতির পথ আজ আমাদের সম্মুখে অনেকখানি স্পষ্ট হয়ে উঠলো।

তরিকুল আলমের ভিতরে আমরা এক বিপুল সম্ভাবনা প্রত্যক্ষ করেছিলুম। তাঁর জীবনে, তাঁর লেখায় সচেতন বুদ্ধির এক স্বচ্ছ সাবলীল প্রকাশ বিস্ময়ের মতো আমাদের চোখের সাম্‌নে ফুটে উঠ্‌লো। তাঁর মনের দীপ্তিতে আমাদের অন্তর খানিক আলোকিত হ'লো।

জীবিতদের মধ্যে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ কল্লেন লুৎফর রহমান, ইয়াকুব আলী চৌধুরী, কাজী আবদুল ওদুদ। এঁদের মধ্যে লুৎফর রহমান ও ইয়াকুব আলী চৌধুরীর রচনা আজ আর গতিশীল নয়। তথাপি আমার মনে হয় ঃ লুৎফর রহমানের রচনায় আমরা এমন একটী জিনিসের সন্ধান পাই যা অত্যন্ত সৌষ্ঠবশালী না হ'য়েও যথেষ্ট সজীব এবং তার স্পর্শ আমাদের নিদ্রিত চিত্তকে বেশ খানিকটা চেতনা দেয়। ইয়াকুব আলী চৌধুরীকে বঙ্কিমচন্দ্রের পাশে দাঁড় করিয়ে দেখ্‌তে আমার ইচ্ছা হয়। তিনি মহানবী মোহাম্মদের মানব-চরিত্রকে মুগ্ধ কিন্তু মানুষের দৃষ্টিতে দেখ্‌লেন, যেমন ক'রে বঙ্কিম তাঁর অবতারের চরিত্রকে দেখেছিলেন।

আর আর যাঁদের রচনা আমাদের বর্ত্তমান সাহিত্যিক জীবনের এক বৃহৎ অংশকে আলোকিত কচ্ছে, তাঁদের সম্বন্ধে আমি কিছু বল্‌বো না এই জন্যে যে, যাঁদের অতি নিকটে আমরা বাস করি তাঁদেরকে সত্যিই আমরা ভালো ক'রে দেখিনে। তাঁদের রচনা বেশ গতিশীল। তাঁর বিকাশের সম্ভাবনাকে সসীম ক'রে দেখবার প্রয়াস কখনো আমাদের নয়।

একজন সাহিত্যিকের কথা নিশ্চয়ই আমাদের মনের কোণে বারবার উঁকি দিচ্ছে। এবং তাঁর কথা যে এতোবার আমাদের মনে আসছে এইটীই তাঁর বিশিষ্টতার একটী প্রমাণ। বস্তুতঃ নজরুল ইসলামের রচনা আমাদের আধুনিক মনকে বিশেষভাবে স্পর্শ করলো, তার কারণ সাহিত্যে তাঁর বিদ্রোহী মনের সুস্পষ্ট ও শক্তিমান প্রকাশ। তাঁর রচনা গভীর জীবনের সঙ্গে যুক্ত নয়—এ অভিযোগ আমরা শুনেছি, এবং সঙ্গীতে কাব্যে সাহিত্যে সমাজে—সর্ব্বত্রই তাঁর উদ্দাম গতির পরিচয় পেয়েছি। কিন্তু তাঁকে যদি দোষ দিতেই হয়, তবে সে-অধিকার ঠিক আমাদের নয় এই কারণে যে, তিনি এখনো আপনাকে নিঃশেষে দান করেননি এবং তাঁর বলিষ্ঠ প্রতিভার অভিনবত্বে আমরা একেবারে চম্‌কে গেছি। অর্থাৎ নজরুল ইসলামের রচনার মূল্য নির্দ্ধারণ কর্ব্বার প্রয়াস না ক'রে এটুকু হয়তো বলা চলবে যে, তাঁর লেখনী তরুণদের মনে একটা বিষম আলোড়ন সৃষ্টি কর্‌লো এবং তার ফলে জগতের প্রতি

www.pathagar.com

তাদের দৃষ্টি অনেকখানি সহজ হ'য়ে দাঁড়ালো। যাঁর কাছ থেকে এই বৃহৎ লাভ আমরা অর্জ্জন কুল্লুম, বুদ্ধির মুক্তি-আন্দোলনে তাঁর অসামান্য দান চিরদিন আমরা স্বীকার কর্ব্বো।

মুসলমান সমাজের বাইরে শিবনাথ শাস্ত্রীর পরে রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী, শরৎচন্দ্র এবং এঁদেরও পরে অতি-আধুনিক তরুণদের আমরা সামনে দেখতে পাচ্ছি। এঁদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী ও শরৎচন্দ্রের প্রভাব বাঙালীর মনকে বিশেষভাবে আন্দোলিত করলো। শাস্ত্রীয় জ্ঞান ও সামাজিক আচারের বাইরে বুদ্ধিকে টেনে এনে এরা এক নতুন জগতের খবর আমাদের দিলেন। এঁদের কাছে কৃতজ্ঞতার ঋণ আমরা নতমস্তকে স্বীকার কর্ব্বো। এঁদের পরে যাঁরা এলেন তাঁদের আমরা দেখেছি এবং দেখবো। তাঁদের বিচারের ভার আমাদের উপর নয়, আমাদের পরবর্ত্তীরাই সে-কাজ কর্ব্বেন।

এইভাবে হ'লো আমাদের সাহিত্যে মুক্তবুদ্ধির প্রকাশ, যদিও সে এখনো যথেষ্ট বিস্তৃত ও নিঃশঙ্ক নয়। কোন্ পথে, সাহিত্যের কোন্ রূপে সে আপনাকে সার্থক কর্ব্বে তার ইঙ্গিতের সন্ধানী আমরা। অতি-আধুনিকদের লেখায় কেউ কেউ তার খোঁজ কল্লেন, কিন্তু সেটাকে সত্যিই যে সেখানে পাওয়া গেলো তার কিছু নিশ্চয়তা নেই। আমরা শুধু এইটুকু দেখ্‌ছি যে, পাশ্চাত্যের শিক্ষা সভ্যতা চিন্তা আমাদের পুরোবর্ত্তীদের চিন্তাকে বহুপরিমাণে নিয়ন্ত্রিত করেছিলো, আমাদের কচ্ছে এবং সম্ভবতঃ অনাগত দিনেও অনেক কাল ধ'রে কত্তে থাক্‌বে। বস্তুতঃ আমাদের পূর্ববর্ত্তী চিন্তাবীর, কর্ম্মবীর ও সাহিত্যরথীদের কাছে আমাদের যে-ঋণ তাঁদের কাছে গিয়েই সেটা নিঃশেষ হয়নি, তার বিস্তৃতি স্পর্শ করলো পাশ্চাত্যকে। কেননা পাশ্চাত্য সভ্যতার সঙ্গে এদেশী সমাজের যে-বুদ্ধিগত সংঘর্ষ তা থেকেই তাঁদের জন্ম। এই জন্ম যাঁরা কালানুসারে বিশেষ ক'রে আমাদের, তাঁদেরও লাভ হলো এবং অনাগত সাহিত্যব্রতীদেরও লাভ হবে। এইটুকু যদি আমরা জানি, তাহলে সম্ভবতঃ এ-ও আমরা জান্‌লুম যে, বিজ্ঞানবাদ ও যুক্তিবাদ যে-পথে চলবে, আমাদের বুদ্ধিপন্থী সাহিত্যিক প্রয়াসও তার অনুসারী হবে।

অর্থাৎ জীবন থেকে বিযুক্ত ক'রে সাহিত্যকে আমরা পাবো না। এই জন্যে লেখার ভিতরে মানুষের কল্যাণ-সাধনার বিচিত্র গতি-ভঙ্গিমাকে রূপ দেবার যে-আর্ট যে-কারুতা তাকেই হয়তো আমরা শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-শিল্প মনে কর্ব্বো। যিনি সত্যিকার সাহিত্য-শিল্পী অর্থাৎ জীবনের নানা সমস্যার মাঝখানে যাঁর জাগ্রত চিত্ত বিরাজমান, নানাভাবে নানাদিকে তিনি আপনাকে প্রসারিত করেন। সম্ভবতঃ এই কারণেই রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র—আমাদের সমাজে নবাব আবদুল লতীফ ও তাঁর পরে মশার্‌রফ হোসেন থেকে নজরুল ইস্‌লাম—এঁদের অনেকেরই জীবন বিবিধ কল্যাণ-প্রয়াসের সঙ্গে যুক্ত হ'লো। যাঁরা নতুন জগৎ রচনার স্বপ্ন দিয়ে আমাদের চোখের জ্যোতিকে প্রদীপ্ত কল্লেন, গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে নতুন আশা দিয়ে আমাদের সম্মুখের পথকে আলোকিত কল্লেন, তাঁদের চিত্তকে আমরা দেখ্‌তে পেলুম বাস্তব কর্ম্মময় জীবনের মাঝখানে।

এঁদের পথকে স্বীকার কর্ব্বার জন্যে আমাদের কাছে আহ্বান এলো যে-বিশিষ্ট ক্ষেত্রে বুদ্ধির মুক্তিকামী চিত্ত আজ বিকশিত হলো, তার চারিদিকে সীমারেখা রচনা ক'রে শান্তির নীড় যেন আমরা নির্ম্মাণ না করি, এই হোক আমাদের অন্তরের কামনা। বস্তুতঃ এই কামনাই আজ আমাকে আপনাদের সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত করলো। জীবনের নানা সমস্যা বর্ত্তমান

www.pathagar.com

সচেতন মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ কচ্ছে। তাদের দিকে মুক্ত দৃষ্টিতে আমরা তাকাবো। তাদের সমাধানের জন্যে, মানুষের অভিনব জীবন-শিল্পকে সুষ্ঠুতায় সৌন্দর্য্য সার্থক কর্ব্বার জন্যে সজ্ঞান প্রয়াস হবে আমাদের। নবযুগের নতুন পথের তরুণ যাত্রী আমরা। আমাদের সম্মুখ প্রাচীর উদয় গিরি-শীর্ষে নব প্রভাতের বিচিত্র বর্ণচ্ছটা প্রদীপ্ত হ'য়ে উঠ্‌লো। আজ নতুন ক'রে আমাদের জীবন-দীক্ষার বহ্নি-উৎসব শুরু হ'লো। নির্ম্মুক্ত জ্ঞানের মশাল হাতে নিয়ে পথের আবর্জ্জনাকে জ্বালিয়ে আমরা এই উৎসবে যোগদান কর্ব্বো। আমরা উৎসবের শিশু, অমৃত্যের পুত্র। আলোক আমাদের ধর্ম্ম।

www.pathagar.com

দশম বার্ষিক অধিবেশনের অভ্যর্থনা-সভাপতির অভিভাষণ

খান বাহাদুর আবদুর রহমান খান

শ্রদ্ধেয় ও স্নেহাস্পদ বন্ধুগণ,

আজ মুসলিম সাহিত্য-সমাজের দশম বার্ষিক অধিবেশন। আমি এই উপলক্ষে সমাজের পক্ষ হইতে আপনাদিগকে সাদর সংবর্দ্ধনা জানাইতেছি। আপনারা ইহার আহ্বানে সাড়া দিয়াছেন তজ্জন্য ইহার সভ্যগণ আনন্দিত ও কৃতার্থ হইয়াছেন। আপনাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

ঢাকা নগরী ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থান। ইহা বহু রাজ-রাজন্যের বিশেষতঃ মুসলিম রাজন্যবর্গের লীলাভূমি। ভারতের মুসলিম ইতিহাসে ইহা একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। ইহা এখনো জাহাঙ্গীরনগর নামে সুপরিচিত। ইহার বহু প্রাসাদ, সমাধি-মন্দির এবং মসজিদ এখনো মুসলিম-কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। কেবল রাজনীতি-ক্ষেত্রেই যে ঢাকা মুসলিম কৃষ্টির পরিচয় দিয়াছে, তাহা নহে। সাহিত্যক্ষেত্রে মুসলিম ইতিহাসে ঢাকার দান অকিঞ্চিৎকর নহে। এখনো ফারসি ও উর্দ্দু ভাষায় রচিত এমন অনেক গ্রন্থ বিদ্যমান রহিয়াছে যাহা হইতে ঢাকার সাহিত্যচর্চ্চার প্রভূত প্রমাণ পাওয়া যায়।

ঢাকার মুসলিম প্রাধান্য এখনো বিলুপ্ত হয় নাই। কিন্তু ঢাকার সাহিত্য-চর্চ্চা বহুদিন যাবৎ ইহার ঐতিহাসিক প্রাধান্যের তুলনায় মর্য্যাদাহীন ছিল। বর্ত্তমানে বাংলা ভাষা ভাষা-জগতে একটী সম্মানের আসন অধিকার করিতে বসিয়াছে। হিন্দু হউক, মুসলিম হউক, বৌদ্ধ হউক, খৃস্টান হউক, বাঙ্গালী মাত্রই বাংলা ভাষাকে তাহার সাহিত্য-চর্চ্চার বাহন করিতে বাধ্য। বাংলার মুসলমান কিছুদিন পূর্ব্বে এই সহজ সত্যটির প্রতি উদাসীন হইয়া পড়িয়াছিলেন। বাংলা সাহিত্যে সেকালের মুসলমানের দান গৌরবের হইলেও একালের মুসলমানের দান সামান্য। কিন্তু সুখের বিষয় বর্ত্তমানে বাংলার মুসলমান মাতৃভাষা বাংলার প্রতি আর উদাসীন নহেন। তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছেন মাতৃভাষার উৎকর্ষ-সাধন তাঁহাদের জীবনের একটী বড় কাজ—তাঁহাদের দানে ইহাকে সমৃদ্ধ করিতে হইবে। এই ভাবে অনুপ্রাণিত হওয়াই দশ বৎসর পূর্ব্বে কতিপয় সাহিত্য-সেবী মুসলিম তরুণ ঢাকা নগরীতে মুসলিম সাহিত্য-সমাজের প্রতিষ্ঠা করেন। সকল দিক দিয়া বিবেচনা করিতে গেলে দেখা যাইবে, বঙ্গদেশে এরূপ প্রতিষ্ঠানের জন্মভূমি হওয়ার গৌরব ঢাকা নগরীরই প্রাপ্য।

সাহিত্যের কার্য সমাজের সমসাময়িক চিত্র সর্ব্বসমক্ষে উপস্থিত করা এবং সঙ্গে সঙ্গে এক আদর্শ চিত্রের আভাস প্রদান করা। সাহিত্য একাধারে সমাজের সৃষ্টি এবং স্রষ্টা। সমাজ সাহিত্যের মাল-মসলা যোগায়, আবার সাহিত্য সমাজের গতিপথ নির্দেশ করে। সাহিত্যকে এইভাবে গ্রহণ করিতে হইলে বুদ্ধির মুক্তি আবশ্যক। কেবলমাত্র মুক্তবুদ্ধিই সমাজের প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি করিতে এবং তাহার দোষগুণ বিচার করিয়া তাহাকে সুনিয়ন্ত্রিত করিতে সক্ষম হয়। মুসলিম সাহিত্য-সমাজের ভিত্তি হইতেই মুক্তবুদ্ধিকে উহার আদর্শ অবলম্বন স্বরূপ গ্রহণ

www.pathagar.com

করা হইয়াছে। এই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়াই উহা আপন কার্য্যে ব্রতী হইয়াছে। বাংলা ভাষা বাঙ্গালীমাত্রেরই মাতৃভাষা। কিন্তু বাংলার মুসলিম-জীবনের একটী বৈশিষ্ট্য আছে যাহা অপরাপর সম্প্রদায়ের জীবনধারা হইতে একটু স্বতন্ত্র। এই স্বতন্ত্রতা কি, কোথায় ইহার সার্থকতা, কি ভাবে ইহাকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করা যায়, ইহাই মুসলিম সাহিত্য-সমাজের আলোচ্য বিষয়। এই আলোচনা হইতেই মুসলিম সাহিত্যের স্বরূপ প্রকাশ পাইবে। লেখক যিনিই হউন, যাঁহার লিখিত সাহিত্যের সহিত মুসলিম-জীবনের যোগাযোগ থাকিবে একমাত্র তিনিই মুসলিম সাহিত্যিকরূপে পরিচিত হইতে পারিবেন। অধুনা সাহিত্যক্ষেত্রে মুসলমানের আবির্ভাব হইয়াছে বটে কিন্তু প্রকৃত মুসলিম সাহিত্যের ভিত্তির পত্তন এখনো হয় নাই। এই অভাব পূরণই মুসলিম সাহিত্য-সমাজের লক্ষ্য।

মুসলিম সাহিত্য-সমাজের বয়স এখনো অতি অল্প ; বলিতে গেলে ইহা এখনো শৈশবে। লোকের সমক্ষে বলিবার মত সফলতা ইহার জীবনে এখনো হয় নাই। ইহার কার্য্য-কলাপ ও গবেষণা অদ্যাপি প্রবন্ধ পাঠেই পর্য্যবসিত। ইহার বার্ষিক অধিবেশনের প্রবন্ধগুলি কয়েক বৎসর ধরিয়া ইহার মুখপত্র 'শিখা'তে প্রকাশিত হইয়াছে। সমস্ত প্রবন্ধ খুব উচ্চ ধরনের না হইলেও, উহাতে যে মুসলিম যুবকদের মধ্যে চিন্তাধারার একটা আমূল পরিবর্ত্তন সাধন করিয়াছে তাহা অস্বীকার করা যায় না। হইতে পারে, উহাদের চিন্তাধারা কোন কোন সময় সমাজের সর্ব্বসাধারণের অননুমোদিত হয়—হইতে পারে, উহা সব সময় সুনিয়ন্ত্রিত নহে। কিন্তু একথা নিশ্চিত যে, উহা মুসলিম সমাজে সমস্ত জিনিস বুদ্ধির যোগে গ্রহণ করিবার জন্য একটা সাড়া জাগাইয়াছে। মুসলিম যুবক প্রাণের কথা খুলিয়া বলিবার সাহস পাইয়াছে, তাহার নিজের ধারণা যাচাই করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছে এবং সমালোচনার যোগে নিজের ভুল ভ্রান্তি সংশোধন করিবার পথ পাইয়াছে। আমার মনে হয় মুসলিম সাহিত্য-সমাজের পক্ষে ইহা কম গৌরবের বিষয় নহে।

মুসলিম সাহিত্য-সমাজ কখনই সাহিত্যিকগণের সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত হয় নাই। কিন্তু উহার আজ যে সৌভাগ্যলাভ হইয়াছে তাহা পূর্ব্বে কখনও হয় নাই। বাংলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কথা-শিল্পী ডক্টর শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অদ্যকার অধিবেশনে সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিবেন। ইহা অপেক্ষা গৌরবের বিষয় সাহিত্য-সমাজ কল্পনাও করিতে পারে না। এস্থলে সভাপতি মহাশয়ের পরিচয় দিতে প্রয়াস পাইয়া আমি তাঁহার অবমাননা করিব না, তবে তাঁহার একটী বিশেষত্বের কথা না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। বাংলা ভাষায় বহু কৃতবিদ্য সাহিত্যিক হইয়াছেন ; কিন্তু তাঁহাদের অতি অল্প সংখ্যকই মুসলিম সমাজকে ঘনিষ্ঠভাবে দেখিবার সুযোগ লাভ করিয়াছেন। ফলে তাঁহাদের সাহিত্যে মুসলিম সমাজ কোন স্থান পায় নাই। কিন্তু শরৎচন্দ্রের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মুসলিম সমাজের প্রতিও পতিত হইয়াছে। 'মহেশ' ও 'পল্লী সমাজ' ইহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ। মুসলিম চাষীর মধ্যেও যে একটা মস্ত বড় প্রাণ আছে, ইহা তিনি সম্যক উপলব্ধি করিয়াছেন এবং তাহার সুখে দুঃখে তিনি অকৃত্রিম সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন। এই সহানুভূতিই তাঁহাকে মুসলিম সমাজের আপন করিয়া তুলিয়াছে। মুসলিম সাহিত্যকে সঞ্জীবিত করিতে এবং উহাকে সমগ্র বঙ্গ-সাহিত্যের অঙ্গীভূত করিতে তাঁহার চেয়ে যোগ্যতর ব্যক্তি আর নাই। এই কথাটির উল্লেখ করিয়াই আমি তাঁহাকে সভাপতির আসন গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিতেছি। এই সমাজের প্রথা অনুযায়ী তিনি সমগ্র বৎসর ইহার সভাপতি থাকিবেন এবং ইহার কার্য্যকলাপ পরিচালিত

www.pathagar.com

করিবেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এই এক বৎসরকালে সমাজ তাঁহার তত্ত্বাবধানে এরূপ উন্নতি সাধন করিবে যাহা ইহার জীবনে অদ্যাপি সম্ভবপর হয় নাই। ভগবৎ-সমীপে আমার ঐকান্তিক প্রার্থনা, তিনি দীর্ঘ জীবন লাভ করুন, তাঁহার সংস্পর্শে এই সমাজ উত্তরোত্তর উন্নতির পথে ধাবিত হউক এবং বঙ্গসাহিত্যে মুসলিম সমাজের স্থান দিয়া তাঁহার লেখনী ধন্য হউক।

www.pathagar.com

দশম বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতির অভিভাষণ

ডক্টর শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

মুসলিম সাহিত্য-সমাজের দশম বার্ষিক অধিবেশনে আমাকে আপনারা সভাপতি নির্ব্বাচন করেছেন। যদিও এর নাম দিয়েছেন মুসলিম সাহিত্য-সমাজ, তথাপি এই নির্ব্বাচনের মধ্যে একটি পরম ঔদার্য্য আছে। আমি হিন্দু অথবা মুসলমান সমাজের অন্তর্গত, আমি বহুদেবতাবাদী অথবা একেশ্বরবাদী—এ প্রশ্ন আপনারা করেন নি। শুধু ভেবেছেন আমি বাঙালী, বঙ্গসাহিত্যের সেবায় প্রাচীন হয়েছি। অতএব সাহিত্যিকের দরবারে আমার একটি স্থান আছে। সেই স্থানটি অকুণ্ঠ চিত্তে আমাকে দিয়েছেন। আমিও সানন্দে সকৃতজ্ঞ মনে দু'হাত পেতে সেই দান গ্রহণ করেছি। ভাবি, সকল বিষয়েই আজ যদি এমনি হতে পারতো! যে গুণী, যে মহৎ, যে বড়—সে হিন্দু হোক, মুসলমান হোক, কৃশ্চান হোক, অস্পৃশ্য হোক স্বচ্ছন্দে সবিনয়ে তাঁর যোগ্য আসন তাঁকে দিতে পারতাম! সংশয় দ্বিধা কোথাও কন্টক রোপন করতে পারতো না! কিন্তু যাক সে কথা। আমি পূর্ব্বে একটী পত্রে বলেছিলাম সাহিত্যের তত্ত্ব-বিচার অনেক হয়ে গেছে। অনেক মনীষী, অনেক রসিক, অনেক অধিকারী বহুবার এর সীমানা এবং স্বরূপ নির্দ্দেশ করে দিয়েছেন, সে আলোচনা আর প্রবর্ত্তন করার আমার রুচি নেই। আমি বলি সাহিত্য-সম্মিলন প্রবন্ধ পাঠের জন্য নয়, সুতীক্ষ্ণ সমালোচনায় কাউকে ধরাশায়ী করার জন্য নয়, কে কত অক্ষম উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করার জন্য নয়, যে যা লিখেচে তার চেয়ে ভালো কেন লেখেনি এ কৈফিয়ৎ আদায়ের জন্য নয়, এ শুধু সাহিত্যিকের মিলনক্ষেত্র। এর আয়োজন একের সঙ্গে অপরের ভাব-বিনিময় ও সম্যক পরিচয়ের জন্য; আমার মনে পড়ে বয়স যখন অল্প ছিল, এ ব্রতে আমি যখন নূতন ব্রতী, তখন আমন্ত্রণ পেয়েও কত সাহিত্য-সভায় দ্বিধায় সংকোচে উপস্থিত হতে পারি নি। নিশ্চিত জানতাম সভাপতির সুদীর্ঘ অভিভাষণের একটা অংশ আমার জন্য নির্দ্দিষ্ট আছেই, কখনো নাম দিয়ে, কখনো না দিয়ে। বক্তব্য অতি সরল। আমার লেখায় দেশ দুর্নীতিতে পরিপূর্ণ হয়ে এলো এবং সনাতন হিন্দু-সমাজ জাহান্নমে গেল বলে। যাবার আশঙ্কা ছিল অসহিষ্ণু হয়ে যদি নজির দিয়ে আমি তার জবাব দিতাম। কিন্তু সে অপকর্ম্ম কোনো দিন করি নি—ভাবতাম আমার সাহিত্যরচনা যদি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে একদিন না একদিন লোকে বুঝবেই। যাই হোক, যে দুঃখ নিজে ভোগ করেছি সে আর অপরকে দিতে চাই নে। তবে অকপটে বলতে পারি আমার অভিভাষণ শুনে সাহিত্যিক বিজ্ঞতা আপনাদের এক তিলও বাড়বে না। এবং বাড়বেই না যখন জানি, তখন কতকগুলো বাহুল্য কথার অবতারণা করি কেন? এইখানে শেষ করলেই ত হতো। হতো না তা নয়, তবে নিজেই নাকি কথাটা একদিন তুলে ছিলাম, তাই তারই সূত্র ধরে এই সম্মিলনে আরও গোটা কয়েক কথা বলবার লোভ হয়।

www.pathagar.com

একদিন আমার কলকাতার বাড়ীতে কাজী মোতাহার সাহেব এসে উপস্থিত। সাহিত্য-আলোচনা করতে তিনি যান নি, গিয়েছিলেন দাবা খেলতে,—এ দোষ আমাদের উভয়েরই আছে—অসুস্থ ছিলাম, খেলা হলো না, হলো বর্ত্তমান সাহিত্য-প্রসঙ্গে দুটো আলোচনা—তারই মোটামুটি ভাবটা আমি বর্ষবাণীতে চিঠির আকারে লিখে পাঠাই এবং সেইটিই 'অবাঞ্ছিত ব্যবধান' শিরোনামায় বুলবুল মাসিক পত্রের সম্পাদক শ্রদ্ধাস্পদ মুহম্মদ হবীবুল্লাহ সাহেব উদ্ধৃত করেছেন তাঁর বৈশাখের কাগজে। দেখলাম তার একটা জবাব দিয়েছেন শ্রীযুক্ত লীলাময় রায়, আর একটা দিয়েছেন ওয়াজেদ আলী সাহেব জৈষ্ঠ্যের বুলবুলে।

লীলাময়ের লেখার মধ্যে ক্ষোভ আছে, ক্রোধ আছে, নৈরাশ্য আছে। আমি বলেছিলাম সাহিত্য-সাধনা যদি সত্য হয় সেই সত্যের মধ্য দিয়েই ঐক্য একদিন আসবেই। কারণ সাহিত্য-সেবকেরা পরস্পরের পরমাত্মীয়। হিন্দু হোক, মুসলমান হোক, কৃশ্চান হোক তবু পর নয়—আপনার জন। লীলাময় বলেছেন, "প্রতিকার যদি থাকে তবে তা সাহিত্যে নয়, তা স্বাজাত্যে।" স্বাজাত্য শব্দটায় তিনি কি বলতে চেয়েছেন বুঝলাম না। বলেছেন, "ঐক্য জিনিসটা organic, হাড়ের সঙ্গে মাংস জুড়লে যেমন মানুষ হয় না তেমনি হিন্দুর সঙ্গে মুসলমান জুড়লে বাঙালি হয় না, ভারতীয় হয় না।" পরে বলেছেন, "হিন্দু-মুসলমানে আপোষ ছাড়া আর কিছু করবার নেই। সুতরাং ব্যবধান থেকে যাবে, জাতীয়তাও হবে না, আত্মীয়তাও না।" এসব উক্তি ক্ষোভের প্রকাশ ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু বলি—এঁদের মত শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক, পণ্ডিত ও চিন্তাশীল ব্যক্তিরাও আজ যদি এই কথা বলতে থাকেন ত নৈরাশ্যে যে সমস্ত দিক কালো হয়ে উঠবে! এ কি এঁরা ভাবেন না? মনের তিক্ততা দিয়ে কোনো মীমাংসাও হয় না, মিলনও ঘটে না। আবার এমনি হতাশা প্রকাশ পেয়েছে মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলীর প্রবন্ধে। তিনি বলেছেন, "আজ যাঁরা নূতন করে আমাদের দুই প্রতিবেশী সমাজের সম্বন্ধ বিচার করবেন, এ নিয়ে যে আশ্চর্য্য সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে তার বন্ধন কেটে কল্যাণের অভিসারী হবেন, দীর্ঘ তাঁদের পথ, কঠিন তাঁদের সাধনা।" আমি এই কথাটাই মানতে চাই নে। জোর করে প্রশ্ন করতে চাই কেন তাঁদের পথ দীর্ঘ হবে? কিসের জন্য সাধনা তাঁদের সুকঠিন হয়ে উঠবে? কেন একটি সহজ সুন্দর পথে এই সমস্যার সমাধান আমরা খুঁজে পাবো না? ওয়াজেদ আলী সাহেব পরে বলেছেন, "যাদের মনে রইলো প্রবল বিরুদ্ধতা, অন্তরে রইলো গভীর অপ্রেম, চিত্তে রইলো দীর্ঘ ব্যবধান তাদেরকে টেনে পাশাপাশি দাঁড় করানো হলো। তাতে শিষ্টাচারের তাগিদে হাতের সাথে হাত মিললো, তাদের দৃষ্টি-বিনিময় হলো না, একজনের অন্তর রইলো আর একজনের অন্তর থেকে শত যোজন দূরে।" এর হেতু দেখাতে গিয়ে বলেছেন, "অচেনা মুসলিম এলো বিজয়ীর বেশে, অধিকার করলো রাজার আসন। আনুগত্য, রাজসম্মান সে পায় নি এমন নয়; কিন্তু ভারতবর্ষকে স্বদেশ স্বীকার করেও দেশ মনের মিতালী তার ভাগ্যে হয় নি, এদের অপরিচয়ের যে ব্যবধান সেটি অবাঞ্ছিত হলেও কোনো দিন ঘোচে নি।" কিন্তু এই কি সমস্ত সত্য? সত্য হলে এই অবাঞ্ছিত ব্যবধান ঘুচিয়ে মিতালি করতে ক'টা দিন লাগে? মনে হয় লীলাময় অনেক ব্যথার মধ্য দিয়েই লিখেছেন, "যাঁরা বিদেশ থেকে এসেছেন ও আজও তা মনে রেখেছেন, যাঁরা জলের উপর তেলের মতো থাকবেন বলে স্থির করেছেন আবহমান কাল, দেশের অতীত সম্বন্ধে যাঁদের অনুসন্ধিৎসা ও বর্ত্তমান সম্বন্ধে যাঁদের বেদনা-বোধ নেই, রাষ্ট্রের ভিতরে আর একটা রাষ্ট্র রচনাই যাঁদের স্বপ্ন আমরা তাঁদের কে যে গায়ে পড়ে তাঁদের অপ্রিয় সত্য শোনাতে যাবো?"

www.pathagar.com

এ কথার অর্থ এ নয় যে ব্যবধান আমরা ভালোবাসি, মিতালি চাই নে, পরস্পরের আলোচনা সমালোচনা পরিহার করাই আমাদের বিধেয়। এ উক্তির তাৎপর্য্য যে কি সমস্ত সাহিত্য-রসিক বিদগ্ধ মুসলিম সমাজকেই আমি দিতে বলি। কলহ-বিবাদ, তর্ক-বিতর্ক, বাদ-বিতণ্ডা করে নয়। কোথায় ভ্রম, কোথায় অন্যায়, কোন্‌খানে অবিচার লুকিয়ে আছে, সেই অকল্যাণকে সুস্থ-সবল চিত্ত দিয়ে আবিষ্কার করে নিতে। তখন পরস্পরের স্নেহ, প্রেম, ক্ষমা আমরা পাবোই পাবো!

ওয়াজেদ আলী সাহেব একটি চমৎকার ভরসার কথা বলেছেন, সেটি হিন্দু-মুসলমান সকলেরই মনে রাখা উচিত। বলেছেন, "মুসলিম সাহিত্য-সেবক আরবী ফারসী শব্দ বাঙলা ভাষার অঙ্গে জুড়তে চাইছেন, এতে আপত্তি অনাপত্তি অতি তুচ্ছ কথা ; কেননা শুধু কলম চালিয়ে ওটি হতে পারে না, তার জন্যে চাই প্রচুর সাহিত্যিক শক্তি, চাই সৃষ্টিশীল প্রতিভা। এ দু'টি যেখানে নেই সেখানে ভাষা ভূষণ পরতে গিয়ে অতি সহজেই সং সাজতে পারে।"

পারেই ত। কিন্তু এ জ্ঞান আছে কার? যিনি যথার্থ সাহিত্য-রসিক—তাঁর। ভাষাকে যিনি ভালোবাসেন, অকপটে সাহিত্যের সেবা করেন তাঁর। তাঁকে তো আমার ভয় নেই। আমার ভয় শুধু তাঁদের যাঁরা সাহিত্যসেবা না করেও সাহিত্যের মুরুব্বি হয়ে বসেছেন। প্রিয় না হলেও একটা দৃষ্টান্ত দিই। 'মহেশ' নামে আমার লেখা একটী ছোট গল্প আছে, সেটি সাহিত্য-প্রিয় বহু লোকেরই প্রশংসা পেয়েছিল। একদিন শুনতে পেলাম গল্পটি Matric-এর পাঠ্য-পুস্তকে স্থান পেয়েছে ; আবার একদিন কানে এলো সেটি নাকি স্থানভ্রষ্ট হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে নিজের কোন যোগ নেই, ভাবলাম এমনিই হয়ত নিয়ম। কিছুদিন থাকে, আবার যায়। কিন্তু বহুদিন পরে এক সাহিত্যিক বন্ধুর মুখে কথায় কথায় তার আসল কারণ শুনতে পেলাম। আমার গল্পটিতে নাকি গোহত্যা আছে। অহো! হিন্দু বালকের বুকে যে শূল বিদ্ধ হবে! বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের বহু টাকা মাইনের কর্ত্তা মশায় এ অনাচার সইবেন কি করে? তাই মহেশের স্থানে শুভাগমন হয়েছে তাঁর স্বরচিত গল্প 'প্রেমের ঠাকুরে'র। আমার মহেশ গল্পটা হয়ত কেউ কেউ পড়ে থাকবেন, আবার অনেকেই হয়ত পড়েন নি। তাই শুধু বিষয়বস্তুটা সংক্ষেপে বলি। একটী হিন্দুপ্রধান, হিন্দু-জমিদারশাসিত ক্ষুদ্র গ্রামে গরীব চাষী গফুরের বাড়ী। বেচারার থাকার মধ্যে ছিল বহুজীর্ণ, বহুছিদ্রযুক্ত একখানি খড়ের ঘর, বছর দশেকের মেয়ে আমিনা আর একটা ষাঁড়। গফুর ভালোবেসে তার নাম দিয়েছিল মহেশ। বাকি খাজনার দায়ে ছোট গাঁয়ের ততোধিক ছোট জমিদার যখন তার ক্ষেতের ধান খড় আটক করলে তখন সে কেঁদে বললে, 'হুজুর! আমার ধান তুমি নাও, বাপ-বেটিতে ভিক্ষে করে খাবো, কিন্তু খড় ক'টি দাও,—নইলে এ দুর্দ্দিনে মহেশকে আমার বাঁচাবো কি করে?' কিন্তু রোদন তার অরণ্যে রোদন হলো—কেউ দয়া করলে না। তারপরে শুরু হলো তার কত রকমের দুঃখ, কত রকমের উৎপীড়ন। মেয়ে জলের জন্যে বাইরে গেলে সে জীর্ণ কুটিরের খড় ছিঁড়ে নিয়ে লুকিয়ে মহেশকে খাওয়াতো, মিছে করে বলতো মা আমিনা, আজ আমার জ্বর হয়েছে, আমার ভাত ক'টি তুই মহেশকে দে। সারাদিন নিজে অভুক্ত থাকতো। ক্ষুধার জ্বালায় মহেশ অত্যাচার করলে এই দশ বছরের মেয়েটার কাছেও তার ভয় ও কুণ্ঠার অবধি থাকতো না। লোকে বলতো, গরুটাকে তুই খাওয়াতে পারিস নে গফুর, ওকে বেঁচে দে। গফুর চোখের জল ফেলে আস্তে আস্তে তার পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়ে বলতো, 'মহেশ তুই আমার ব্যাটা,—আমাকে তুই সাত সন প্রতিপালন করেছিস। খেতে না

www.pathagar.com

পেয়ে তুই কত রোগা হয়ে গেছিস,—তোকে কি আজ আমি পরের হাতে দিতে পারি বাবা !' এমনি করে দিন যখন আর কাটতে চায় না তখন একদিন অকস্মাৎ এক বিষম কাণ্ড ঘটলো। সে গ্রামে জলও সুলভ নয়। শুকনো পুকুরের নীচে গর্ত্ত কেটে সামান্য একটুখানি পানীয় জল বহু দুঃখে মেলে। আমিনা দরিদ্র মুসলমানের মেয়ে, ছোঁয়া-ছুঁইর ভয়ে পুকুরের পাড়ে দূরে দাঁড়িয়ে প্রতিবেশী মেয়েদের কাছে চেয়ে চিন্তে অনেক দুঃখে বিলম্বে তার কলসিটি পূর্ণ করে বাড়ী ফিরে এলো। এখন ক্ষুধার্ত্ত, তৃষ্ণার্ত মহেশ তাকে ফেলে দিয়ে, কলসি ভেঙে ফেলে এক নিঃশ্বাসে মাটি থেকে জল শুষে খেতে লাগলো। মেয়ে কেঁদে উঠলো। জ্বরগ্রস্ত, পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ গফুর ঘর থেকে বেরিয়ে এলো—এদৃশ্য তার সইলো না। হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে যা সুমুখে পেলে—একখণ্ড কাঠ দিয়ে সবলে মহেশের মাথায় মেরে বসলো। অনশনে মৃতকল্প গরুটা বার-দুই হাত পা ছুঁড়ে প্রাণ ত্যাগ করলে।

প্রতিবাসীরা এসে বললে হিঁদুর গাঁয়ে গো-হত্যা ! জমিদার পাঠিয়েছেন তর্করত্নের কাছে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা নিতে। এবার তোর ঘর-দোর না বেঁচেতে হয়। গফুর দুই হাঁটুর ওপর মুখ রেখে নিঃশব্দে বসে রইলো। মহেশের শোকে, অনুশোচনায় তার বুকের ভেতরটা তখন পুড়ে যাচ্ছিল। অনেক রাতে গফুর মেয়েকে তুলে বললে, চল আমরা যাই।

মেয়ে দাওয়ায় ঘুমিয়ে পড়েছিল, চোখ মুছে বললে, কোথায় বাবা? গফুর বললে ফুলবেড়ের চটকলে কাজ করতে।

আমিনা আশ্চর্য্য হয়ে চেয়ে রইলো। ইতিপূর্ব্বে অনেক দুঃখেও তার বাবা চটকলে কাজ করতে রাজি হয় নি। বাবা বলতো ওখানে ধর্ম্ম থাকে না, মেয়েদের আব্রু-ইজ্জৎ থাকে না—ওখানে কখনো নয়। কিন্তু হঠাৎ এ কি কথা?

গফুর বললে, দেরি করিস নে মা, চল। অনেক পথ হাঁটতে হবে। আমিনা জল খাবার পাত্র এবং বাবার ভাত খাবার পিতলের বাসনটী সঙ্গে নিতে ছিল, কিন্তু বাবা বারণ করে বললে ওসব থাক মা, ওতে আমার মহেশের প্রাচিত্তির হবে।

তারপরে গল্পের উপসংহারে বইয়ে এইরূপ আছে—"অন্ধকার গভীর নিশীথে সে মেয়ের হাত ধরিয়া বাহির হইল। এ গ্রামে আত্মীয় তাহার কেহ ছিল না, কাহাকেও বলিবার কিছুই নাই। আঙ্গিনা পার হইয়া পথের ধারে সেই বাবলা তলায় আসিয়া সে থমকিয়া দাঁড়াইয়া হু হু করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। নক্ষত্রখচিত কালো আকাশে মুখ তুলিয়া বলিল, "আল্লাহ ! আমাকে যত খুশী সাজা দিয়ো, কিন্তু মহেশ আমার তেষ্টা নিয়ে মরেছে। তার চরে খাবার এতটুকু জমী কেউ রাখে নি। যে তোমার দেওয়া মাঠের ঘাস, তোমার দেওয়া তেষ্টার জল তাকে খেতে দেয় নি তার কসুর তুমি কখনো যেন মাফ করো না।"

এই হলো গো-হত্যা ! এই পড়ে হিন্দুর ছেলের বুকে শেল বিঁধবে ! তার চেয়ে পড়ুক "প্রেমের ঠাকুর"। তাতে ইহলোকে না হোক তাদের পরলোকে সদগতি হবে ! Text book থেকে পয়সা পাই নে—ও ব্যবসা আমার নয়—সুতরাং ক্ষতিবৃদ্ধিও নেই—তবু ক্লেশ বোধ হয়। নিজের জন্য নয়,—অন্য কারণে। শুধু সান্ত্বনা এই যে অযোগ্যের হাতে ভার পড়লে এমনই হয়। যে ব্যক্তি কোনদিন সাহিত্য-সাধনা করে নি সে কি করে বুঝবে কার মানে কি ! শুনেচি নাকি আমার 'রামের সুমতি' গল্পটা দিয়েছেন। অতি নিরীহ বস্তু,—বোধ করি, আশা এর থেকে রামেদের সুমতি হবে। কিন্তু মুশকিল এই দেশে রহিমরাও আছে যে !

www.pathagar.com

আর শুধু বিদ্যালয়ই নয়, মহেশের ভাগ্যে অন্য দুর্ঘটনাও ঘটেছে। তার বিস্তারিত বিবরণ দিতে চাই নে, কিন্তু নিঃসংশয়ে জানি এক হিন্দু জমিদার রক্তচক্ষু হয়ে শাসিয়ে বলেছিলেন ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের সাহায্যে ছাপা মাসিক বা সাপ্তাহিকে এ ধরনের গল্প যেন আর ছাপা না হয়। এতে জমিদারের বিরুদ্ধে প্রজা ক্ষেপিয়ে দেওয়া হয়। অর্থাৎ দেশের সর্ব্বনাশ হয়!

যাক নিজের কথা। উপরিউক্ত হিন্দু মুরুব্বির মত আবার মুসলমান মুরুব্বিও আছেন। শুনেছি তাঁরা নাকি আদেশ করেন ইতিহাস ফরমায়েশ মত লিখতে। ইসলাম-ধর্ম্মী কোন ব্যক্তি কোথাও অন্যায়-অবিচার করেছেন এর লেশমাত্রও যেন কোন পড়ার বইয়ে না থাকে। এখানেও সান্ত্বনা এই যে এঁদের কেউ কখনো কোন কালে সাহিত্য-সেবা করেন নি। করলে এমন কথা মুখে আনতে পারতেন না। সত্যিকার সাহিত্যিকদের হাতে যদি এই ভার পড়ে আমার বিশ্বাস—না হিন্দু, না মুসলিম কোন পক্ষ থেকেই বিন্দুমাত্র অভিযোগ শোনা যাবে না। ভাষার প্রতি সত্যিকার দরদ তাঁদের সত্য পথেই পরিচালিত করবে।

ওয়াজেদ আলী সাহেব একস্থানে বলেছেন, "মুসলিমের এই নবস্ফূর্ত্ত আত্মপ্রকাশ, ইসলামী কৃষ্টির এই বলিষ্ঠ জাগরণ, সাহিত্যক্ষেত্রে শরৎচন্দ্রের মতো শক্তিমান প্রতিভার মনোযোগ আকর্ষণ করলো, হয়ত দেশের অনাগত কল্যাণের এ এক শুভ ইঙ্গিত। কিন্তু তবু কেন মন সন্দেহ-অবিশ্বাসে, দ্বিধা-জিজ্ঞাসায় দুলে উঠে? 'বুলবুলে' প্রকাশিত তাঁর পত্রখানিতে যেন চোখে পড়ে মুসলিমের প্রতি তাঁর সহানুভূতির অভাব, ভালবাসার অভাব এবং মোটামুটি একটা অন্তর্দৃষ্টির অভাব।"

আমার জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা করে, মুসলিমের এই নবস্ফূর্ত আত্মপ্রকাশ, ইসলামী কৃষ্টির এই "বলিষ্ঠ জাগরণ" যাঁরা প্রাচীনপন্থী তাঁদের, না যাঁরা নবীন, উদার, বাঙলা ভাষাকে যাঁরা অকুণ্ঠিত মনে মাতৃভাষা বলে স্বীকার করেন তাঁদের? আমার অভিমত এই যে যাঁরা প্রাচীনপন্থী, যাঁরা পিছনে ছাড়া সুমুখে চাইতে জানেন না, তাঁদের জাগরণ কি মুসলিম কি হিন্দু সকল সমাজেরই বিঘ্ন স্বরূপ! হিন্দুদের সম্বন্ধে এ কথা আমি বহুবার বহুস্থানে লিখেচি। মুসলিম সমাজের সম্বন্ধেও অসংশয়ে বলতে পারি, এ জাগরণ হয় যদি নবীনের—আসুক সে শ্রাবণের পূর্ণিমা জোয়ারের মতো সমস্ত ভাসিয়ে দিয়ে, তবু তাকে আমি দুহাত তুলে সম্বর্ধনা করে নেবো। জানবো এদের হাতে সমস্তই হবে শুভ এবং সুন্দর,—এদের হাতে হিন্দু-মুসলিম কারও ভয় নেই—এদের হাতে আমরা দুজনেই হবো নিরাপদ। আমার আশঙ্কা শুধু প্রাচীনপন্থীদের সম্বন্ধে।

তিনি পরে বলেছেন, "শরৎচন্দ্রের মতে সাহিত্যিকদের সম্প্রদায় জাতি এক ছাড়া দুই নয়। এ কথা সহজেই আমাদের স্বীকৃতি দাবী করতে পারে। কিন্তু আরও একটি সহজ কথার দিকে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করি। সেটি এই যে সাহিত্য মনের সৃষ্টি; এবং মানুষের মনকে তৈরী করে তার ধর্ম্ম, তার সমাজ, তার পরিবেশ, তার কৃষ্টি। এদের থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করা কি সামান্য ব্যাপার? এবং সাধারণতঃ সেটি কি সম্পূর্ণরূপে সম্ভব?"

এই কথাগুলি শুধু আংশিক সত্য—সম্পূর্ণ সত্য নয়। কারণ, এটুকু মোটামুটি জেনে রাখা দরকার যে মানুষ যখন সাহিত্য-রচনায় নিবিষ্টচিত্ত তখন সে ঠিক হিন্দুও নয়, মুসলিমও নয়। তখন সে তার সর্ব্বজনপরিচিত 'আমি'-টাকে বহুদূরে অতিক্রম করে যায়, নইলে তার সাহিত্য-সাধনা ব্যর্থ হয়। এইজন্যেই যেখানে কিছুই এক নয়, বাহ্যতঃ কিছুই মেলে না,

www.pathagar.com

সেখানেও ম্যাক্সিম গর্কির মতো সাহিত্য-সেবকেরা আমাদের বুকের মধ্যে অনেকখানি আত্মীয়ের আসন জুড়ে বসে থাকেন। এই কথাটি আমি সকল সাহিত্যিককেই মনে রাখতে বলি। কে কোথায় তার অসতর্ক মুহূর্ত্তে কি কথা বলেছে সেইটিই তার জীবনের পরম সত্য নয়। কেবল তাই দিয়েই বিচার চলে না। এবং এই জন্যই ওয়াজেদ আলী সাহেব তাঁর প্রবন্ধে আমার সম্বন্ধে যে সব কঠিন উক্তি করেছেন আমি তার জবাব দিতে বসবো না। রাগ যখন পড়বে তখন আপনিই মনে হবে আমি সত্যি কথাই বলেছিলাম। ওয়াজেদ আলী সাহেব সবচেয়ে মর্ম্মান্তিক কথা বলেছেন এইখানে—"বস্তুতঃ, দুইটি বিষম অনাত্মীয় কৃষ্টির সংঘর্ষের ফলে এই বিক্ষোভ। এর জন্যে আক্ষেপ বৃথা। হিন্দু মুসলিমকে বোঝে না এ জন্যে দুঃখের বিলাপ আজ চারিদিকে ধ্বনিত হচ্ছে। কিন্তু এমনও হতে পারে যে তার যাবতীয় ধর্ম্ম, সমাজ ও সংস্কৃতি তার মনকে করেছে অপরিসর, দৃষ্টিকে করেছে আচ্ছন্ন। আপনার পরিধিকে অতিক্রম করে গতি তার নিশ্চল। আপনার আভিজাত্যের গর্ব্বে যে চিরবিলীন, পরাজয়ের প্রাচীন অভিমান যার আজো দুর্জ্জয়, বিনাযুদ্ধে সূচ্যগ্র পরিমিত স্থান দান কর্ত্তেও যার আপত্তি অন্তহীন, তার বুদ্ধিকে মুক্ত বলা কঠিন। অথচ, মুক্তি যার নেই সে চলে না, চলতে পারে না—সে জড়। এই আত্মকেন্দ্রী পরবিমুখ জড়বুদ্ধির পরিবেষ এ দেশের মুসলিমকে "নিজ বাসভূমে পরবাসী' করে রেখেচে, ভারতের মাটির রসে রসায়িত হয়েও তার মন যেন ভিজছে না।"

এই যে বলেছেন দুইটী বিষম অনাত্মীয় কৃষ্টির সংঘর্ষের ফলে এই বিক্ষোভ। এর জন্যে আক্ষেপ বৃথা। আমরা উভয়ে উভয়ের প্রতিবেশী, আমাদের আকাশ বাতাস মাটি জল এক। মাতৃভাষা এক বলেই স্বীকার করি। তবু সংঘর্ষ এত বড় কঠোর যে তার জন্যে আক্ষেপ পর্য্যন্ত করা বৃথা—এই মনোভাবই যদি সমস্ত হিন্দু-মুসলমানের সত্য হয় ত এই কথাই বলবো যে এর চেয়ে বড় দুর্গতি মানুষের আর ঘটতে পারে না। রবীন্দ্রনাথের বুদ্ধিও কি জড়বুদ্ধি? মন তাঁর মুক্ত হয় নি? এ যদি সত্য, তবে ওয়াজেদ আলী সাহেবের এ ভাষা এল কোথা থেকে? সহজ, সুন্দর ও অবলীলায় আপন মনোভাব প্রকাশ করার শক্তি তাঁকে কে দিলে? এ যুগে এমন লেখক, এমন সাহিত্য-সেবক কে আছে যে প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে তাঁর কাছে ঋণী নয়? সাহিত্য ধর্ম্ম-পুস্তকও নয়, নীতি শিক্ষার বইও নয়। অথচ, আপন বিশাল পরিধির মধ্যে আপন মাধুর্য্যে সে সব কিছুকেই আপন করে রেখেচে। তাই সাহিত্য কি, রসবস্তু কি, আজও কেউ তার সত্য নির্দ্দেশ পেলে না। কত তর্ক, কত মতভেদ। এই অবাঞ্ছিত ব্যবধান সম্বন্ধে মীজানুর রহমান সাহেব জৈষ্ঠ্যের বুলবুল মাসিক পত্রে তাঁর প্রবন্ধের এক স্থানে অকরুণ হয়ে বলেছেন, "শরৎ বাবু তাঁর রাশিকৃত উপন্যাসের ভিতর স্থানে স্থানে মুসলমান সমাজের যে সব ছবি এঁকেছেন তা মুসলমান সমাজের খুব উঁচুদরের লোকের নয়।' কিন্তু জিজ্ঞাসা করি উঁচু-নীচু স্তরের পাত্র-পাত্রীর উপরেই কি উপন্যাসের উচ্চতা-নীচতা, ভালো-মন্দ নির্ভর করে? এ যদি তাঁর অভিমত হয় তবে আমার সঙ্গে তাঁর মতের ঐক্য হবে না। না হোক, কিন্তু উপসংহারে যে বলেছেন, "হিন্দু-সমাজের বিবিধ গলদ ও সমস্যা নিয়ে শরৎচন্দ্র যে সকল গল্প ও উপন্যাস লিখেছেন এবং প্রতিকারের উদ্দেশ্যে তাঁর সমাজকে যে চাবুক কশেছেন, সদিচ্ছা-প্রণোদিত এমন ধারা নির্ম্মম কশাঘাতও মুসলিম-সমাজ অম্লান বদনে গ্রহণ করবে তা' জোর করে বলতে পারি। বাঙ্গলার কথাসাহিত্য-সম্রাটকে একবার পরীক্ষা করে দেখতে অনুরোধ করি।"

www.pathagar.com

সেদিন জগন্নাথ হলে আমার অভিনন্দনের প্রতিভাষণে এ কথার উত্তর দিয়েছি। অন্তরের শুভ কামনাকে এঁরা কেমন করে গ্রহণ করেন এ দুনিয়া থেকে বিদায় নেবার পূর্ব্বে আমি দেখে যাবো। সে যাই হোক, মানুষে শুধু ইচ্ছা প্রকাশ করতেই পারে, কিন্তু তার পরিপূর্ণতার ভার থাকে আর এক জনের পরে যিনি বাক্য ও মনের অগোচর। সেদিন খেতে বসে His Excellency আমাকে এই প্রশ্নই করেছিলেন। আমি উত্তর দিয়ে ছিলাম আমার সংকল্প কাজে পরিণত করতে চাই উভয় সমাজের আশীর্ব্বাদ। যে ভাষার, যে সাহিত্যের এতকাল সেবা করেছি, তার পরে অকারণ অনাচার আমার সয় না। আমার একান্ত মনের বিশ্বাস, আমার মতো সাহিত্যের যথার্থ সাধনা যাঁরা করেছেন তাঁরা হিন্দু-মুসলিম যা-ই হোন, কারও এ অনাচার সইবে না। সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যের জন্য পরিবর্ত্তন যদি কিছু কিছু প্রয়োজন হয়—এমন ত কতবার হয়েছে—সে কাজ ধীরে ধীরে এঁরাই করবেন, আর কেউ নয়। সে হিন্দুয়ানীর কল্যাণে নয়, মুসলমানীর কল্যাণেও নয়,—শুধু মাতৃভাষা ও সাহিত্যের কল্যাণে। এই আমার মোট আবেদন।

কোথায় কোন লেখায় মুসলিম সমাজের প্রতি অবিচার করেছি,—করি নি বলেই আমার ধারণা—তার চুল-চেরা বাদ-প্রতিবাদ প্রতিকারের পথ নয়, সে কলহ-বিবাদের নতুন রাস্তা তৈরী করা।

বুলবুল কাগজখানির নানাস্থান থেকে আমি উদ্ধৃত করেছি—প্রয়োজনবোধে। এই পত্রিকার অবিচ্ছিন্ন উন্নতি কামনা করি, কারণ যতটুকু পড়েছি, তাতে সাহিত্যের উন্নতিই এঁদের কাম্য, আমারও তাই। হয়ত, কোথাও একটু কটূক্তি করে থাকবেন, কিন্তু সে মনে করে রাখবার বস্তু নয়, ভুলে যাবার জিনিষ।

কিন্তু আর নয়। বলবার বিষয় এখনো অনেক ছিল, কিন্তু আপনাদের ধৈর্য্যের প্রতি সত্যিই অত্যাচার করেছি। সে জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করি। এ অভিভাষণে পাণ্ডিত্য নেই, কারুকার্য্য নেই, বলার কথাগুলো কেবল সোজা করে বলে গেছি, যেন তাৎপর্য্য বুঝতে কারও ক্লেশ-বোধ না হয়। শোনার পরে কেউ না বলেন—যেমন অতুলনীয় শব্দসম্পদ, তেমনি কারুকার্য্য, কিন্তু ঠিক কি যে বলা হলো ভালো বুঝা গেল না।

বাঙলা সাহিত্যের সেবা করে মুসলমানদের মধ্যে যাঁরা চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন, তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা আমার অপরিসীম, তবু তাঁদের নামোল্লেখ করতে আমি বিরত রইলাম।

পরিশেষে কৃতজ্ঞতা নিবেদনের একটা রীতি আছে। যেমন আছে আরম্ভ করার সময় বিনয় প্রকাশের প্রথা। প্রথমটা আমি করি নি। কারণ, সাহিত্য-সভায় সভাপতির কাজ এত বেশী করতে হয়েছে যে এই ষাট বছর বয়সে নিজেকে অনুপযুক্ত, বেকুফ ইত্যাদি যত প্রকারের বিনয়সূচক বিশেষণ আছে নিজের নামের সঙ্গে সংযোগ করে দিলে ঠিক শোভন হবে মনে হলো না। কিন্তু কৃতজ্ঞতা প্রকাশের বেলায় তা নয়। সমস্ত বিদগ্ধ মুসলিম সমাজের কাছে আমি অকপটে কৃতজ্ঞতা নিবেদন করছি। আপনারা আমার সালাম গ্রহণ করুন। বলার দোষে যদি কাউকে বেদনা দিয়ে থাকি সে আমার ভাষার ত্রুটি, আমার অন্তরের অপরাধ নয়।

www.pathagar.com

অভিভাষণ সমীক্ষা

প্রথম বার্ষিক অধিবেশন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলিম হল মিলনায়তনে, যা ছিল মুসলিম সাহিত্য সমাজের সূতিকাগার, ১৯২৭ সালের ২৭ ও ২৮ শে ফেব্রুয়ারি সাহিত্য সমাজের প্রথম বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। অধিবেশনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি নিযুক্ত হন মুসলিম হলের প্রথম প্রভোস্ট এ. এফ. রহমান (আহমেদ ফজলুর রহমান) ও সাধারণ সভাপতি খান বাহাদুর তসদ্দক আহমদ।

এ. এফ. রহমান ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের রিডার। সাহিত্য সমাজের সঙ্গে তিনি প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন না, কিন্তু এর প্রতি তার যথেষ্ট সহানুভূতি ছিল। তিনি জানতেন বাঙালি মুসলমান সমাজে নবজাগরণের প্রয়াস শুরু হয়েছে আরও আগে থেকে। তাই সাহিত্য সমাজের প্রচেষ্টাকে তিনি নতুন উদ্যম ও স্পন্দনের চিহ্ন বলে অভিহিত করেন। হলের বার্ষিক রিপোর্টেও তিনি মন্তব্য করেন, 'This literary movement has set in a new pulsation in life in the hall.'[১]

বাঙালি মুসলমান সমাজের অগ্রগতির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে রেখেছে এমন কিছু সমস্যাকে এ. এফ. রহমান তার বক্তৃতায় চিহ্নিত করেন। সেগুলির মধ্যে প্রথমেই এসেছে তাদের অতীতমুখিনতা ও মুগ্ধতার কথা। এই মনোভাবকে তিনি তুলনা করেছেন গোরস্থানে স্মৃতিস্তম্ভ 'জেয়ারৎ' করে পুণ্যভাগী হয়ে নিশ্চিন্ত থাকার সঙ্গে। অতীত নিশ্চয় ভবিষ্যতের পথ দেখাতে সাহায্য করে। কিন্তু মুসলমানরা সেভাবে অতীত চর্চা করে না। তাই ভবিষ্যতেরও কোনো লক্ষ্য নির্ধারণ তারা করতে পারে নি। এরপর এসেছে সাহিত্যচর্চার কথা। এক্ষেত্রেও তারা যে উদাসীন তার কারণ হিসেবে তিনি তাদের সামাজিক জীবনের লক্ষ্যহীনতাকে দায়ী করেছেন। তিনি বিশ্বাস করেন সাহিত্যচর্চা যেমন জাতির জীবনীশক্তির পরিচায়ক তেমনি তার উন্নতিরও সহায়ক। তাই যে-জাতির মধ্যে সাহিত্যচর্চা নেই সে-জাতি আসলে নিজেদের ইতিহাসের উপর সমাধি মন্দির তুলে দিয়েছে। এ প্রসঙ্গে তার আরও ধারণা সাহিত্যচর্চার সঙ্গে জাতির আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদাবোধের সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। আমরা যে আমাদের সবকিছুকে ইউরোপের মানদণ্ডে বিচার ও তুলনা না করে স্বস্তি পাই না তার মূলে রয়েছে হীনমন্যতাবোধ। এই মানসিকতা জাতীয় উন্নতির পক্ষে ক্ষতিকর। মাতৃভাষা প্রসঙ্গে তার বক্তব্য হচ্ছে যে-কোনো কারণে হোক উর্দুর প্রতি সারা ভারতের মুসলমানের সঙ্গে বাঙালি মুসলমানেরও দুর্বলতা থাকলেও বাংলাই তার মাতৃভাষা এবং সেই ভাষাতেই তার সাহিত্যচর্চা করা উচিত।

মুসলিম সাহিত্য সমাজের জন্মকালের আগে থেকেই দেশে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক প্রীতিকর ছিল না। এ প্রসঙ্গে এ. এফ. রহমান এই বিশ্বাস ব্যক্ত করেন যে পারস্পরিক জানাশোনার অভাবেই মানুষের মধ্যে মনোবিবাদ হয়। তাই আরও অনেকের মতো তিনিও

www.pathagar.com

এই ধারণা পোষণ করতেন যে সাহিত্যচর্চা সাম্প্রদায়িক মনান্তর দূর করতে অনেকখানি সাহায্য করবে।

আবুল ফজল তার স্মৃতিকথায় জানিয়েছেন এ. এফ. রহমানের বক্তৃতা নিয়ে ঢাকার গোঁড়া মুসলিম মহলে নাকি কানাঘুষা ও চাপা প্রতিবাদ উঠেছিল। এর কারণ অবশ্য এ নয় যে তিনি ইসলামের বিরুদ্ধে কোনো কথা বলেছিলেন, কারণটি ছিল বক্তৃতার শেষাংশে তিনি কিছুটা হিন্দু পরিভাষা ব্যবহার করেছিলেন। কিন্তু তিনি এত জনপ্রিয় আর সজ্জন ছিলেন যে তার বিরুদ্ধে প্রকাশ্য প্রতিবাদ সম্ভব ছিল না।[২]

সাধারণ সভাপতি তসদ্দক আহমদ ছিলেন ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের প্রধান শিক্ষক। সমাজহিতৈষণা ও সাহিত্যানুরাগ ছিল তার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। শিক্ষাবিদ হিসেবেও ঢাকায় তার খ্যাতি ছিল সর্বজনবিদিত। সাহিত্য সমাজের সঙ্গে তার যোগাযোগ ছিল। বার্ষিক অধিবেশন ছাড়া সাধারণ অধিবেশনেও তাকে সভাপতির দায়িত্ব পালন করতে দেখা যায়। বার্ষিক অধিবেশনে প্রদত্ত তার ভাষণটি ছিল যথেষ্ট দীর্ঘ ; 'শিখা'র দশ পৃষ্ঠাব্যাপী। বাঙালি মুসলমানের ভাষা, সাহিত্য, শিক্ষা ইত্যাদি সমস্যা, তার প্রাণহীন ধর্মচর্চা—এসব ছিল তার বক্তৃতার বিষয়।

তসদ্দক আহমদ মাতৃভাষাকে মাতৃসম জ্ঞান করতেন। বাঙালি মুসলমানের মাতৃভাষা বাংলাকে অস্বীকার করার মনোবৃত্তি তার কাছে তাই নিজের মাকে অস্বীকার করার সামিল। এই মনোভাব ত্যাগ করে বাংলা ভাষায় সাহিত্যচর্চার প্রতি তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন। এ. এফ. রহমানের মতো তিনিও এই ধারণা ব্যক্ত করেন যে সাহিত্যের মধ্য দিয়ে মুসলমান যদি তার আত্মপরিচয় প্রকাশ করতে পারে তাহলে হিন্দুর সঙ্গে তার মিলন সম্ভব হবে। তিনি মনে করেন একে অন্যকে জানতে পারলেই পরস্পরের মধ্যে ভক্তি ও শ্রদ্ধার ভাব জাগ্রত হয়। সাহিত্যের মাধ্যমেই সেই কাজটি করতে হবে। তার মতে রাজনৈতিক প্যাক্ট দ্বারা তা সম্ভব হবে না।

তসদ্দক আহমদ যে-সাহিত্য রচনার প্রতি এতখানি গুরুত্ব দিয়েছেন তার প্রকৃতি কেমন হবে ? তার মতে মুসলমানের সাহিত্যকে ইসলামের আদর্শে গড়ে তুলতে হবে, প্রকৃত ইসলাম দ্বারা তাকে অনুপ্রাণিত করতে হবে। কিন্তু সেই আদর্শ অনুপ্রেরণা আপাতত আরবি, ফারসি ও উর্দু ভাষার মধ্যে নিবদ্ধ রয়েছে। তাই যারা ঐ সব ভাষা জানেন তাদেরই বাংলা ভাষায় ইসলামের আদর্শ ফুটিয়ে তুলতে হবে। সে-ক্ষেত্রে আবশ্যক মতো ইসলামি ভাবাপন্ন শব্দ ধীরে ধীরে বাংলা ভাষায় প্রচলন করতে হবে।

তসদ্দক আহমদ সৎ সাহিত্যের পক্ষপাতী। সৎ সাহিত্য বলতে তিনি বোঝাতে চান সেই সাহিত্যকে যা নিজের ভেতরকার সর্বোৎকৃষ্ট পদার্থ পরম ভক্তি ও শ্রদ্ধাভরে বিশ্বমানবের উপকারার্থে উপস্থাপিত হয়। তার মতে সেই সাহিত্য সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন সত্যিকার শিক্ষার অর্থাৎ জ্ঞানচর্চার।

এ প্রসঙ্গেই এসেছে শিক্ষার ভাষা-মাধ্যমের কথা। বাঙালি মুসলমানের শিক্ষার জন্য তার মাতৃভাষা বাংলাকেই তিনি সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। কিন্তু একালে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সঙ্গে যোগাযোগ বৃদ্ধি পাওয়ায় তিনি অন্তত আরও দুটি আধুনিক ভাষা শেখা অবশ্য কর্তব্য বিবেচনা করেছেন। এ দুটি ভাষার মধ্যে একটি হচ্ছে ইংরেজি আর অন্যটি উর্দু। ইংরেজি

www.pathagar.com

শিখতে হবে এ কারণে যে যেহেতু এটি রাজ ভাষা, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রধান ভাষা ও সাহিত্যের হিসেবে সম্পদশালী ভাষা। অন্যদিকে উর্দুর সাহায্যেই বাঙালি মুসলমানের পক্ষে বাংলা সাহিত্যকে তাদের নিজেদের উপযোগী করে সৃষ্টি করা অল্পায়াসসাধ্য হবে, সেজন্য তিনি এই ভাষা শেখার 'বিশেষ পক্ষপাতী'। তবে সর্বসাধারণের জন্য নয়, কেবল উচ্চ শিক্ষাভিলাষীদের জন্যই তিনি উর্দু ভাষা শিক্ষা 'অতীব প্রয়োজনীয়' মনে করেন। তারপর যারা 'কোরানের রত্নরাজী' আহরণ করার জন্য অনুবাদে তৃপ্ত নন তাদের আরবি ভাষাও শিখতে হবে বলে মত প্রকাশ করেন।

ধর্মীয় আচারবিধি পালন সম্পর্কে তসদ্দক আহমদ যৌক্তিক মত প্রকাশ করেছেন। তার মতে ধর্মের বাহ্যিক ক্রিয়ানুষ্ঠান পালন করলেই প্রকৃত ধর্ম পালন হয় না, তার মূল সত্যকে অন্তরে গ্রহণ করতে হবে এবং সেই অনুযায়ী কাজ করতে হবে। কথা ও কাজে মিল না থাকলে চরিত্রবান হওয়া যায় না। তাই কথাবার্তা, কাজকর্ম প্রত্যেক বিষয়েই ধর্মাচরণ আবশ্যক এবং সেজন্য হযরত মুহম্মদের ন্যায় আদর্শ ও মহামূল্য কোরানের উপদেশাবলি থাকতে মুসলমানকে 'অন্যত্র যাওয়ার প্রয়োজন নেই' বলে তিনি মনে করেন।

অধিবেশনের শেষ দিনে সকল আলোচনা শেষে সভাপতি এই বক্তব্য প্রকাশ করে সম্মেলনের কাজ শেষ করেন : "আজ দুই দিন ধরে আমরা বস্তা বস্তা ময়লা কাপড় ধুয়েছি। মাঝে মাঝে এরূপ করে ময়লা না পরিষ্কার করলে সমাজের মন রুদ্ধ হয়ে যায়।"[৩]

দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন

সাহিত্য সমাজের দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় ১৯২৮ সালে মুসলিম হলে। এ অধিবেশনের অভ্যর্থনা-সভাপতি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক মাহমুদ হাসান। তিনি ছিলেন অবাঙালি। বাংলা ভাষা জানা না থাকায় তিনি অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন ইংরেজিতে। 'শিখা'য় এর বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়।[৪] মাহমুদ হাসান অবাঙালি হয়েও মুসলিম ভাবাবেগে অনেকের মতো উর্দুকে সারা ভারতের মুসলমানের সাংস্কৃতিক ও ঐক্যের ভাষা হিসেবে গ্রহণ করে বাঙালি মুসলমানের জন্য তাকে প্রয়োজনীয় ভাবেন নি এবং এর প্রতি তাদের দুর্বলতা ও প্রীতিবোধকে সমর্থন করেন নি। তিনি বাস্তব দৃষ্টিকোণ ও অভিজ্ঞতা থেকে বাঙালি মুসলমানের উন্নতির জন্য তাদের মাতৃভাষা বাংলায় শিক্ষালাভ ও সাহিত্যচর্চার উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। সন্দেহ নেই, যুক্তি ও বাস্তবতাবোধ দ্বারা চালিত হয়ে তিনি এ অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন।

সাধারণ সভাপতি ঢাকা বোর্ডের সেক্রেটারি খান বাহাদুর আবদুর রহমান খাঁ মুসলিম সাহিত্য সমাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন। একাধিক সাধারণ সভায়ও তিনি সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। পরে তিনি ঢাকার বাইরে বদলি হয়ে যান। সাধারণ সভাপতি হিসেবে প্রদত্ত তার ভাষণটিও ছিল যথেষ্ট দীর্ঘ, 'শিখা'র ১৩ পৃষ্ঠাব্যাপী।

আবদুর রহমান তাঁর বক্তৃতার ভূমিকায় সাহিত্য সমাজের চারিত্র্যের উপর আলোকপাত করেন। তাঁর এ আলোচনা পড়লে বোঝা যায় সাহিত্য সমাজের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য তিনি অনেকখানি অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। পত্র-পত্রিকায় ১ম বর্ষ 'শিখা' সম্পর্কে পক্ষে-বিপক্ষে যে-সব আলোচনা হয়েছিল সেগুলি থেকে সভাপতি এই মূল সত্য উদ্‌ঘাটন করেন

www.pathagar.com

যে সমাজের কর্মীরা এক নতুন উৎসাহে উৎসাহিত, এক নতুন প্রেরণায় প্রাণিত। তারা সত্যান্বেষী, তাই গতানুগতিক ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট নয়। সেজন্য সত্যকে তারা বুদ্ধির মাপকাঠি দিয়ে ভালো রূপে যাচাই করে গ্রহণ করতে চান এবং তার সাহায্যে মুসলিম সমাজে বিদ্যমান দুঃখ-দৈন্য দূর করে বিশ্বের দরবারে তাকে একটি গৌরবময় আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে চান। তিনি মন্তব্য করেন সত্যান্বেষণের এটিই একমাত্র পথ।

সভাপতির নিজের উপলব্ধ সাহিত্য সমাজের উক্ত দৃষ্টিকোণ থেকেই মূলত তিনি সাহিত্যের ভাব, ভাষা, শিক্ষা, ধর্ম ইত্যাদি বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করেছেন। যথার্থ সাহিত্যসৃষ্টি সম্পর্কে তিনি মনে করেন পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও সাহিত্যিকের মন এ দুয়ের যোগেই তা সৃষ্টি হতে পারে। এ প্রসঙ্গে ইউরোপীয় রেনেসাঁস যুগের সাহিত্যের কথা তিনি উল্লেখ করেন। নবজাগরণে উদ্বুদ্ধ বাঙালি হিন্দু রচিত সাহিত্যের কথাও তিনি বলেছেন। ইসলামের আবির্ভাবে নতুন যুগের পরিপ্রেক্ষিতে আরবি সাহিত্যেও যে একটি যুগান্তর এসেছিল তিনি সে-কথাও উল্লেখ করেছেন। কিন্তু বাঙালি মুসলমান এ জাতীয় সাহিত্য সৃষ্টি করতে সক্ষম হচ্ছে না। এই ব্যর্থতার কারণ হিসেবে তিনি তাদের একটি 'কৃত্রিম ভাবধারার মধ্যে হাবুডুবু' খাওয়াকে দায়ী করেছেন। আলিম সম্প্রদায় উর্দুকে বাঙালি মুসলমানের ধর্মভাষায় পরিণত করে তুলেছেন আর বাঙালি মুসলমান তাকে স্থান দিয়েছে মাতৃভাষারও উপরে। সেজন্যই বোধহয় তাদের জীবন আনন্দ ও স্ফূর্তিহীন। তা না হলে, সভাপতির ধারণা, চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর আগে তাদের জীবনে পুথি সাহিত্যের যে একটি 'চমৎকার প্রভাব' ছিল তা ক্রমবিকাশ লাভ করে নতুনতর রূপে আজ মুসলমানের সাহিত্যের অভাব পূরণ করত।

সাহিত্যে অবলম্বনীয় ভাষার ব্যাপারে আবদুর রহমান উদার ও সত্যদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন। তার মতে সংস্কৃতবহুল, নাকি আরবি-ফারসিবহুল বাংলায় সাহিত্য রচনা করা হচ্ছে সেটি বড় কথা নয় ; বড় কথা হচ্ছে এটি স্মরণ রাখা যে, "...ভাষা সাহিত্যের বাহন মাত্র, উহাই সাহিত্য নহে। প্রকৃত সাহিত্যের পরিচয় উহার ভাবে ও প্রকাশের ভঙ্গীতে। যে স্থলে এই দুইটী জিনিস বিদ্যমান আছে, তথায় ভাষায় সংস্কৃত বা আরবী ফারসী শব্দের ন্যূনাধিক্যে সাহিত্যের ক্ষতি বৃদ্ধি হয় না।"[৫]

তসদ্দক আহমদের মতো আবদুর রহমানও মুসলিম সাহিত্য বা ইসলামি সাহিত্য রচনার পক্ষপাতী। তার মতে কিছু মুসলিম শব্দ ব্যবহার করলেই সে-সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব হবে না, তা সম্ভব হবে সেই সাহিত্যের ভাব-বস্তুতে মুসলিম আদর্শ ফুটিয়ে তোলায়। অধুনা যে-সব মুসলমান সাহিত্য রচনা করছেন তাদের অনেকেই 'হিন্দু আদর্শ' দ্বারা অনুপ্রাণিত। সে-সব লেখা পড়লে তা যে মুসলমানের লেখনীপ্রসূত তা সহসা মনে হয় না। তিনি বিশ্বাস করেন তার প্রত্যাশিত সাহিত্য সৃষ্টি করা গেলে সেই সাহিত্যের দ্বারা অপর সম্প্রদায়ের শ্রদ্ধা ও আত্মীয়তা লাভ করা যাবে এবং এই পথেই তাদের মধ্যে মিলন সম্ভব হবে।

কোনো কোনো হিন্দু লেখকের রচনায় মুসলমানের নিকৃষ্ট চিত্র অঙ্কিত হওয়ায় কিছু মুসলমান পাল্টা রচনার মাধ্যমে তার বদলা নেয়া অবশ্য কর্তব্য বলে মনে করেন। আবদুর রহমান এই মনোভাবকে ক্ষুদ্রতা বিবেচনা করেন। তার মতে মুসলমানের উচিত হবে উন্নত মনোবৃত্তি ও রুচির আদর্শ অনুসরণ করে নিজেদের জীবনের মার্জিত রূপ সাহিত্যের মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তোলা। তা যে সম্ভব হয় নি বা হচ্ছে না তার জন্য হিন্দু ও মুসলমান উভয়ই

www.pathagar.com

দায়ী। হিন্দুর উচিত ছিল মুসলমানকে যথার্থরূপে জানার চেষ্টা করা, আর মুসলমানের উচিত ছিল নিজেকে হিন্দুর নিকট যথার্থরূপে প্রকাশ করা। মুসলমান যদি নিজেকে গৌরবময় রূপে দেখতে চায় তাহলে তার উচিত হবে সুন্দর ও মার্জিত জীবনের অধিকারী হওয়া। কিন্তু তেমন জীবন-সম্পদ কি মুসলমানের আছে? তা নেই বলেই অন্য সমাজের লোক তাকে ঘৃণা করে ও তার নিকৃষ্ট জীবনরূপ চিত্রিত করে। এজন্য শিল্পীকে দোষ না দিয়ে দোষ দেওয়া উচিত মুসলমানের সমাজরূপকে। উল্লেখ্য যে মুসলমানের নিকৃষ্ট রূপ-চিত্র অঙ্কনে হিন্দুর ইচ্ছাকৃত প্রবণতা যে একেবারেই ছিল না তা নয়, কিন্তু আবদুর রহমান তা উল্লেখ করেন নি। এতে তথ্যগত সত্যতা কিছুটা অস্বীকৃত হয়েছে বটে, কিন্তু যে বক্তব্য তিনি রেখেছেন তা থেকে এক উদার-মহৎ চিত্তবৃত্তির পরিচয় পাই আমরা।

ধর্ম সম্পর্কেও আবদুর রহমানের মত উদার ও যৌক্তিক। তিনি লক্ষ্য করেছেন মুসলমানরা ধর্মের বাহ্যিক আচার-আচরণ নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করে এবং সেজন্য প্রাণ দিতেও কুণ্ঠিত নয়, কিন্তু ধর্মের মর্মবস্তু সম্পর্কে তারা উদাসীন। জড়তা দ্বারা তারা সমাচ্ছন্ন। যদি কোনো নবালোকের বিচ্ছুরণে এই জড়তা কেটে যেয়ে তাদের চিত্ত উদ্ভাসিত হতে পারে তবেই মুসলমানের দ্বারা যথার্থ সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব হবে। মুসলিম সাহিত্য সমাজ সেই নবালোকের পথ পরিষ্কার করতে পারবে বলে তার বিশ্বাস।

সাহিত্য রচনা ও তা উপভোগ করার জন্য শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। তাই স্বাভাবিকভাবেই আবদুর রহমান তাঁর ভাষণে শিক্ষার প্রতিও সমধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এই শিক্ষাকে তিনি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দেখেন নি, যদিও এই সূত্রে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার কথাও এসেছে। তার কাছে শিক্ষা হচ্ছে অধ্যয়ন ও পর্যবেক্ষণ। এ দুয়ের দ্বারাই প্রকৃত শিক্ষিত হওয়া সম্ভব। মুসলিম সাহিত্য সমাজ যে-সাহিত্য সৃষ্টি করতে চায় তার যোগ্য পাঠক তৈরির জন্য তাদের শিক্ষা বিস্তারে চেষ্টা করা কর্তব্য।

কী উপায়ে এবং কোন পদ্ধতি অবলম্বন করলে মুসলিম সমাজে শিক্ষার বিস্তার সম্ভব হবে সে-বিষয়ে অনেক মনীষী অনেক আলোচনা করেছেন। আলোচ্য ভাষণে তাই শিক্ষার পদ্ধতি সম্পর্কে আলোকপাত করা হয় নি, সভাপতি তার আলোচনা সীমাবদ্ধ রেখেছেন মূলত নবপদ্ধতির মাদ্রাসা শিক্ষার মধ্যে।[৬] এই পদ্ধতি যে গলদমুক্ত তা নয়। সেজন্য অনেক মুসলমান পুরনো পদ্ধতির সঙ্গে নবপদ্ধতির মাদ্রাসা শিক্ষাও তুলে দেয়ার পক্ষপাতী। অন্যদিকে আরেক দল একে সমর্থন করতে গিয়ে এর গলদ স্বীকারে কুণ্ঠিত।

তবে একথা সত্য যে, নবপদ্ধতির মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠার পর যে সব মুসলমান আগে আধুনিক শিক্ষার প্রতি উদাসীন ছিল তারাও এর প্রতি কিছু পরিমাণে আকৃষ্ট হয়েছে। এমন অনেক বালক এখানে পড়তে যাচ্ছে যারা অন্য কোনো বিদ্যালয়ে যেত না। অথচ এখানে যে ইসলামি শিক্ষার সুচারু ব্যবস্থা করা হয়েছে তা নয়। তবু কেন তাদের এই আকর্ষণ? আবদুর রহমান এর কারণ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে লিখেছেন, "তথাপি ইহার প্রতি মুসলিমগণের আস্থা স্থাপিত হওয়ার কারণ এই যে, তাঁহারা যে মোহের বশবর্ত্তী হইয়া আপনাদিগকে সর্ব্বসাধারণ মানব হইতে পৃথক রাখিতে চান ইহাতে তাহার একটা পরিতুষ্টি হয়। তাঁহারা অতি ধর্ম্মপ্রাণ, তাঁহারা ধর্ম্মহীন শিক্ষার বিরোধী, এই কথাটাই তাঁহারা সব সময়ে সপ্রমাণ করিতে চান।"[৭] এই উক্তির মধ্য দিয়ে বাঙালি মুসলমানের সংস্কারগত এক বিশেষ মনোভাবের পরিচয় প্রতিফলিত হয়।

www.pathagar.com

যেহেতু নবপদ্ধতির মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠার পর ধর্মকাতর মুসলমানরা আধুনিক শিক্ষার প্রতি কিছুটা আকৃষ্ট হয়েছে সেহেতু আবদুর রহমান একে উপেক্ষা বা বর্জন করাকে যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করেন নি। তার মতে এই শিক্ষাব্যবস্থায় ত্রুটি যা আছে তা সংশোধন করে এরই মাধ্যমে মুসলমান সমাজে শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা পেতে হবে। তার বিবেচনায় এই পদ্ধতির প্রধান দোষ এর পাঠ্যতালিকা শিক্ষার্থীর মানসিক বিকাশের সোপান-উপযোগী নয়। জুনিয়র মাদ্রাসায় 'সুকুমারমতি' বালকদের একদিকে মধ্য ইংরেজি স্কুলের (Middle English School)[৮] যাবতীয় পাঠ্য পড়তে হচ্ছে আর অন্যদিকে পড়তে হচ্ছে আরবি, উর্দু ও দিনিয়াত। হাই মাদ্রাসার অবস্থাও একই রকম। সেখানে শিক্ষার্থীকে হাইস্কুলের বাংলা, ইংরেজি ইত্যাদির সঙ্গে হাদিস, কোরান, তফসির, কালাম, ফেকা, ওসুল ইত্যাদি পড়তে হচ্ছে। এই বিপুল চাপের ফলে তাদের পক্ষে প্রকৃত শিক্ষালাভ সম্ভব হচ্ছে না, যেজন্য শিক্ষার উদ্দেশ্যও কোনো দিক থেকেই তাদের জীবনে সফল হতে পারছে না।

এই সমস্যার সমাধানকল্পে আবদুর রহমান লিখেছেন নবপদ্ধতির মাদ্রাসার পাঠ্যতালিকা শিক্ষার্থীদের সোপান-উপযোগী হওয়া উচিত। শিক্ষার সঙ্গে ধর্মের সংযোগ তিনি আবশ্যক বিবেচনা করেন, কিন্তু সে-সংযোগ এমন হওয়া বাঞ্ছনীয় নয় যা প্রকৃত শিক্ষার প্রতিকূল হয়ে দাঁড়ায়। ধর্মের নামে মাদ্রাসাগুলিতে যে-সমস্ত বিষয় শিক্ষা দেয়া হয় তাতে দেখা যায় শিক্ষার্থীদের দুর্বোধ্য আরবি ভাষার শব্দগুলি মুখস্থ করতে হয়। এতে শক্তি ও সময় অযথা ব্যয় হয়। তাই তিনি মনে করেন ধর্মীয় বিষয়সমূহ মাতৃভাষায় শিক্ষা দিলে অধিকতর সুফল ফলতে পারে। হাই মাদ্রাসায় বড় বড় আলেমদের বৃহৎ বৃহৎ কেতাব পড়িয়ে গৌরব বোধ করার যে-প্রবণতা মুসলমানদের মধ্যে রয়েছে তা ত্যাগ করা উচিত বলে তিনি মনে করেন। এ কথার অর্থ অবশ্য এ নয় যে তিনি এ সব বিষয় বা গ্রন্থ পড়ানোর প্রয়োজন ও সার্থকতা অস্বীকার করেন। তার মতে এসব বিষয় কলেজিয়েট ও ইউনিভার্সিটি সোপানে শিক্ষা দেয়া সমীচীন। আর তা সম্যকরূপে বোঝার জন্য আরবি ভাষার যে-জ্ঞান দরকার তা জুনিয়র ও হাই মাদ্রাসায় শেখানোর ব্যবস্থা করা উচিত। এই ব্যবস্থায় তাদের শিক্ষা সফল হতে পারে বলে তার বিশ্বাস।

মুসলমানদের শিক্ষা প্রসঙ্গে প্রাথমিক ও নারীশিক্ষা সম্পর্কেও আবদুর রহমান আলোকপাত করেছেন। সমাজের উন্নতির জন্য উভয় শিক্ষাকেই তিনি অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে দেখেছেন।

আলোচ্য ভাষণের শেষাংশে ভিন্ন কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে। সমকালে এমন প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছিল যে সাহিত্য সমাজে 'ধর্মচর্চা' হয় কেন? এ প্রশ্নে কী বোঝাতে চাওয়া হয়েছে আবদুর রহমানের কাছে তা স্পষ্ট নয়। তবে তিনি ধারণা করেছেন প্রশ্নটিতে বোধকরি এই বোঝাতে চাওয়া হয়েছে যে সাহিত্যচর্চা করতে গিয়ে সমাজের লেখকেরা ধর্মকে নিয়ে 'টানাটানি' করছেন কেন?[৯] এর উত্তরে সভাপতি দুটি যুক্তি উপস্থাপন করেছেন। প্রথমত জীবনের সঙ্গে যা কিছু ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত তা-ই সাহিত্যের বিষয়। দ্বিতীয়ত সাহিত্য রচনার যে-সব উদ্দেশ্য আছে তার মধ্যে সমাজ সংস্কারও অন্যতম। সমাজের শ্রেয় তো সাহিত্যিক চাবেনই। সুতরাং ধর্ম জীবনের জন্য কোথায় কল্যাণকর আর কোথায় অকল্যাণকর সে-কথা সাহিত্যিক নিশ্চয় বলবেন। তাতে যদি কারো মতের মিল না হয় তবে তিনি শান্তভাবে তার উত্তর দেবেন, কিন্তু সেজন্য অসহিষ্ণু

www.pathagar.com

হওয়া উচিত নয়। সাহিত্য সমাজের লেখকদের কারো কারো রচনার প্রতিক্রিয়ায় সমকালে যে-অসহিষ্ণুতার সৃষ্টি হয়েছিল সে-প্রসঙ্গেই আবদুর রহমান এই কথাগুলি বলেছিলেন।

তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশন

মুসলিম সাহিত্য সমাজের তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় ১৯২৯ সালের মার্চে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলিম হলে। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ও সাধারণ সভাপতি রংপুরের জেলা ও সেসন জজ আবুল মজফফর আহমদ।

অভ্যর্থনা-সভাপতি তার ভাষণে সমাজের জাগরণ ও সার্বিক মুক্তির জন্য 'বীর্যবন্ত' সাহিত্যের প্রয়োজনের কথা বলেন, যে-সাহিত্য জাতীয় মানসের আলস্য ও ভীরুতা দূর করে দেবে। তিনি বিশ্বাস করেন যথার্থ সাহিত্য মানুষের সার্বিক মুক্তি—দেহ, মন ও আত্মার মুক্তি দেবেই। সাহিত্যের কেন্দ্রবিন্দু হবে এই মুক্তি। এর বিপরীতে যে-সাহিত্য তাকে সত্যিকার সাহিত্য বলা যাবে না। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সরাসরি দু'ধরনের লেখার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছেন—এক, 'কামাগ্নিসন্দীপনী' লেখা ; আর দুই, কুসংস্কার-ধর্মান্ধতা জাতীয় বিদ্বেষমূলক লেখা। এসব 'অপসাহিত্যের' বিরুদ্ধে তিনি 'জিহাদ' ঘোষণা করার কথা বলেছেন এবং মুসলিম সাহিত্য সমাজ তাতে সামিল হবে এই আশা ব্যক্ত করেছেন।

সাহিত্যের প্রকাশমাধ্যম প্রসঙ্গে শহীদুল্লাহর মত আর সবার মতো বাংলার পক্ষেই। কিন্তু সেই বাংলার ধরন কেমন হবে? তিনি সংস্কৃতবহুল ও আরবি-ফারসি-উর্দুবহুল দুই ধরনের বাংলার বিপক্ষেই মত প্রকাশ করেছেন। দ্বিতীয় উদ্ধৃতিটি গৃহীত হয়েছে নজরুল ইসলামের 'মোহররম' কবিতা থেকে। 'শিখা'র তৃতীয় বর্ষের সম্পাদক কাজী মোতাহার হোসেন উদ্ধৃত কবিতায় ব্যবহৃত আরবি-ফারসি শব্দবাহুল্য সম্পর্কে শহীদুল্লাহর আপত্তি সমর্থন করেন নি। ফুটনোটে নিজের মত ব্যক্ত করে সম্পাদক লেখেন,

"দুঃখের সহিত আমরা লিখতে বাধ্য হচ্ছি যে, ২ নম্বরের মধ্যে যে মাধুর্য্য লালিত্য ও কাব্য ঝঙ্কারের সমন্বয় হয়েছে তা ডক্টর সাহেব আদৌ লক্ষ্য করেন নাই। আমাদের মতে এই দৃষ্টান্তটী একেবারেই অপ্রযুজ্য। ইহার একটী শব্দও বেমানান বা দুর্ব্বোধ্য হয় নাই। বরং আরবী ফারসী শব্দের সহিত বাংলা শব্দের মিলনে যে মাধুর্য্যের সৃষ্টি হয় এই দুই নম্বর তাহারই একটী চমৎকার দৃষ্টান্ত।"

আলোচ্য বক্তৃতায় ভাষাসংস্কারের প্রতিও আলোকপাত করা হয়েছে। অভ্যর্থনা-সভাপতি কেবল বানান সংস্কার নয়, হরফ সংস্কারেরও পক্ষপাতী। এ ব্যাপারে তার মত যথেষ্ট উদার ও আধুনিক।

তসদ্দক আহমদ ও আবদুর রহমানের মতো মুহম্মদ শহীদুল্লাহও মুসলিম সাহিত্য রচনার কথা বলেছেন। মুসলিম সাহিত্য বলতে তিনি বোঝেন মুসলমানের জীবন, তার সুখ-দুঃখ, আশা-ভরসা, লক্ষ্য-আদর্শ ইত্যাদি নিয়ে রচিত সাহিত্য। এ সাহিত্য কেবল মুসলমানের দ্বারা নয়, হিন্দুর দ্বারাও রচিত হতে পারে এবং তা হবে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সম্পত্তি। তিনিও এই আশা ব্যক্ত করেছেন যে এই সাহিত্যের মধ্য দিয়েই হিন্দু-মুসলমানের পারস্পরিক চেনা-জানা হবে। এর ফলে উভয়ের মিলন সহজ-সম্ভব হবে।

www.pathagar.com

সাধারণ সভাপতি আবুল মজফফর আহমদ ঢাকা থেকে দূরে অবস্থান করলেও মুসলিম সাহিত্য সমাজ সম্পর্কে তিনি অনবহিত ছিলেন না। আবুল হুসেনকে 'বন্ধুবর' বলায় ধারণা হয় দুজনের মধ্যে পূর্বপরিচয় ছিল। যে-লক্ষ্য সামনে রেখে সাহিত্য সমাজের জন্ম ও যাত্রা তা তিনি জানতেন এবং যাত্রারম্ভেই প্রতিষ্ঠানটি যে বাধার সম্মুখীন হয়েছে তা-ও তার অজানা ছিল না। সাহিত্য সমাজের লেখকদের মতো মুজফফর আহমদও চিন্তার স্বাধীনতায় বিশ্বাসী ছিলেন। বিচার-বুদ্ধি দ্বারা পরীক্ষা করার পরই কোনো কিছু গ্রহণ করা উচিত বলে তিনি মত প্রকাশ করেন। কেননা তিনি জানেন 'ভাবধারা' মাত্রই একটি বিশেষ পরিবেশে বা দেশে কার্যকর হলেও অন্য পরিবেশে বা দেশে তা একই রকম কার্যকর নাও হতে পারে। সুতরাং তাকে গ্রহণ করার সময় যুক্তি-বিচারের কষ্টিপাথরে যাচাই করে গ্রহণ করা কর্তব্য। এই মৌলিক চিন্তাই তার মতে সাহিত্যিক আন্দোলনের প্রাণ এবং যুক্তি-বিচার-বিশ্লেষণ হচ্ছে সেই মৌলিক চিন্তার জনক ও পরিপোষক।

মজফফর আহমদ মনে করেন কোনো ব্যক্তি বা জাতি যখন আপন সত্তা সম্পর্কে সচেতন হতে পারে এবং যখন তার মধ্যে ব্যক্তিত্ববোধ জাগ্রত হয় তখনই প্রকৃত সাহিত্যধারার সৃষ্টি হয়। ব্যক্তিত্ববোধ বা আত্মানুভূতি আর স্রষ্টা সম্পর্কে উপলব্ধি মজফফর আহমদের চেতনায় একই পর্যায়ভুক্ত। তাই স্বাভাবিকভাবে মুসলমানের যে-সাহিত্য তিনি চান তা হবে 'ইসলামের অগ্নি-রসে মার্জ্জিত'। এই সাহিত্যের বাহন হবে অবশ্যই মাতৃভাষা। তিনি দৃঢ়ভাবে আশা করেন যে ইসলামের ভাব-সমৃদ্ধিতে বাংলা ভাষা ক্রমশ অধিকতর সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে এবং সেজন্য অনেক আরবি-ফারসি-উর্দু শব্দ ব্যবহার করে বাংলা ভাষার অঙ্গপুষ্ট করতে হবে। তিনি আশা করেন মুসলিম সাহিত্যিকের রচনা-সম্পদে বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়ে উঠলে হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতির একটি 'মনোরম' সমন্বয় ঘটবে এবং তার ফলে হিন্দু-মুসলিম মিলন সম্ভব হবে।

সাহিত্যের সার্থকতা ও উপকারিতা তথা জীবনের সর্বাঙ্গীন বিকাশের জন্য প্রয়োজন শিক্ষার। সভাপতি তাই গুরুত্বের সঙ্গে শিক্ষা প্রসঙ্গটি উত্থাপন করেছেন। কিন্তু এক্ষেত্রে বাঙালি মুসলমানের পশ্চাৎপদতা ও অনীহা খুবই দুঃখজনক। এই অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বিল পাশ হলে সেজন্য যদি অতিরিক্ত কর যোগাতে হয় তবু তাতে আপত্তি না করার জন্য মুসলিম সমাজকে তিনি অনুরোধ করেন। আগের বছরে সভাপতির অভিভাষণে আবদুর রহমানও একই কথা বলেছিলেন।

মজফফর আহমদ পুরুষদের শিক্ষার পাশাপাশি নারীশিক্ষার প্রতিও যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেন। শুধু তাই নয়, মেয়েদের পর্দাপ্রথা তুলে দেয়ার উপর তিনি সবিশেষ গুরুত্ব দেন। কেননা তার বিবেচনায় যে-সব প্রাণহীন প্রাচীন আচার ও অন্ধ সংস্কার মুসলমানের শিক্ষা তথা সাহিত্য প্রসারের পথ রুদ্ধ করছে তার মধ্যে পর্দাপ্রথা সবচেয়ে মারাত্মক। ললিত কলার চর্চা সম্পর্কে যে-মনগড়া বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে তিনিও তার অপনোদন কামনা করেন। এসব আচার-প্রথা-বিধি-নিষেধ যে "মোল্লাশ্রেণীর দৌরাত্ম"—এর ফল একথা তিনি দ্বিধাহীন কণ্ঠে উচ্চারণ করেছেন।

সাহিত্য সাধনা তথা জ্ঞানচর্চার পাশাপাশি আর্থিক সমৃদ্ধি লাভের প্রতিও মজফফর আহমদ গুরুত্ব দিয়েছেন। বাঙালি মুসলমানের আর্থিক অবস্থা যে অতীব শোচনীয় তা তিনি

www.pathagar.com

জানেন। তদুপরি এই সমাজের অধিকাংশ লোকই কৃষিজীবী ও শ্রমজীবী। সেজন্য তিনি অর্থকরী শিক্ষার দ্রুত বিস্তার ঘটানোর পক্ষপাতী। বাঙালি মুসলমান সমাজের আর্থিক বিকাশের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কর্মপন্থা অবলম্বন সাহিত্য সমাজের কর্তব্য বলে তিনি বিবেচনা করেছেন।

অধিবেশনে পঠিত প্রবন্ধ ও আলোচনাদি শুনে সভাপতি অত্যন্ত আনন্দিত ও আশান্বিত হয়েছিলেন। এরই বহিঃপ্রকাশ ঘটে তার একটি ঘোষণায়। তাতে তিনি বলেন—

আমার বুক ভরা ভাব আছে কিন্তু মুখ ভরা ভাষা নেই। আজ দুদিন যে সমস্ত প্রবন্ধ শুনলাম তাতে বড়ই আশান্বিত হয়েছি। আজ ইসলামের গৌরব বৃদ্ধি করতে হলে চিন্তার স্বাধীনতা চাই। চরিত্র গঠন এবং শিক্ষা বিস্তার আমাদের বিশেষ প্রয়োজন। সে জন্য একটী বড় organisation চাই। ইসলাম দীন দুনিয়া দুইয়েরই কল্যাণ চায়। আমাদের বেহেশত মৃত্যুর পর তবে এ ভরসায় বসে থাকলে চলবে না—আমাদের এই দুনিয়াতেই বেহেশত রচনা করতে হবে। একথা আপনারা ভুলবেন না। আপনারা পূর্ণ উদ্যমে কাজ করেন, টাকার অভাব হবে না। আমি দশ হাজার টাকার জোগাড় করতে চেষ্টা করব। আল্লাহু আকবর।[১০]

সভাপতি কোন সম্ভাবনার উপর নির্ভর করে তখনকার দিনের এই বিপুল পরিমাণ অর্থ সংস্থানের স্পু দেখেছিলেন তা বলা সম্ভব না হলেও বোঝা যায় তিনি যথেষ্ট আবেগপ্রবণ হয়ে এই ঘোষণা দিয়েছিলেন। তিনি আদৌ কোনো অর্থ সাহিত্য সমাজকে দিতে পেরেছিলেন কিনা তার প্রমাণ 'শিখা' বা সাহিত্য সমাজের কার্যবিবরণীতে নেই। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সাহিত্য সমাজকে আর্থিক দৈন্যের মধ্য দিয়ে চলতে হয়েছিল। অর্থের অভাবে পাঁচটি সংখ্যা বেরনোর পর 'শিখা' বন্ধ হয়ে যায়। অধিবেশনগুলিতে অভ্যাগতদের একটু জলযোগের ব্যবস্থা করাও অনেক সময় হয়ে ওঠে নি।[১১]

তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশন সম্পর্কে 'সওগাত' পত্রিকায় একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। অধিবেশন ও সভাপতির অভিভাষণ সম্পর্কে উক্ত প্রতিবেদনে বলা হয়—

ইহার (অর্থাৎ মুসলিম সাহিত্য সমাজের—হা.র) একটা বিশেষত্ব এই যে, ইহা কেবল মুসলিম সাহিত্য-সেবীদের মিলন-কেন্দ্র নহে, একটা বিশিষ্ট আদর্শ লইয়াই ইহা গড়িয়া উঠিয়াছে। সুতরাং মামুলী সাহিত্যিক-সম্মিলনী অপেক্ষা ইহার মূল্য অনেক বেশী। তিন বৎসরের জীবনে এই সমাজ সাহিত্যের ভিতর দিয়া বাঙ্গালার তরুণ মুসলিমকে অনেকখানি চিন্তার খোরাক দিয়াছে। এবারকার সম্মিলনীও সমাজের আদর্শ অক্ষুণ্ন রাখিতে সমর্থ হইয়াছে। সভাপতি রঙ্গপুরের জিলা-জজ মিঃ এ. এম. আহমদ সাহেব যে অভিভাষণ পাঠ করিয়াছেন, তাতে তিনি বিচারকের ন্যায় ধীর ভাবেই মুসলিম সমাজ সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন। উহাতে সাহিত্যারিক্ত অনেক কথা আছে বটে, কিন্তু সমাজের আদর্শের দিক দিয়া বিচার করিলেই ঐ সমস্ত কথার প্রাসঙ্গিকতা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে।[১২]

চতুর্থ বার্ষিক অধিবেশন

সাহিত্য সমাজের চতুর্থ বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৩০ সালের মার্চে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলে। এই অধিবেশনের অভ্যর্থনা-সভাপতি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগের অধ্যক্ষ সৈয়দ মোয়াজ্জম হোসেন ও সাধারণ সভাপতি কলকাতার অ্যাডিশনাল চিফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট নাসির উদ্দীন আহমদ।

মোয়াজ্জম হোসেনের বক্তৃতা থেকে জানা যায় সাহিত্য সমাজ প্রতিষ্ঠার পর তিনি উচ্চ শিক্ষার্থে লন্ডন যান। তখনই তিনি নবপ্রতিষ্ঠিত এই সংগঠনটির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশাবাদী

www.pathagar.com

ছিলেন। প্রায় পাঁচ বছর পর দেশে ফিরে দেখতে পান যে তার আশা ব্যর্থ হয় নি, সময়ের সঙ্গে পা ফেলে প্রতিষ্ঠানটি এগিয়ে চলেছে।

মোয়াজ্জম হোসেন তার ইংল্যান্ডবাসের অভিজ্ঞতা থেকে বলেন যে চিন্তার দৈন্য মানুষের সবচেয়ে বড় দৈন্য। এই দৈন্য থেকে যারা মুক্ত, যাদের মন সজাগ ও বুদ্ধিবৃত্তি তীক্ষ্ণ-প্রখর, তারাই বর্ধিষ্ণু, জীবন্ত ও উন্নতিশীল। আজকের বিশ্বে তারাই সর্ববিষয়ে নেতৃত্ব দিচ্ছে। এর পাশে শিক্ষা ও চিন্তার ক্ষেত্রে নিজের সমাজের নিদারুণ পশ্চাৎপদতা তাকে নিরাশ করে। কিন্তু সেই নিরাশার মধ্যেও তিনি আশান্বিত হয়ে ওঠেন যখন দেখেন তার সমাজের তরুণরাও এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন। সাহিত্য সমাজের প্রচেষ্টা ভবিষ্যতে এর কর্ম ও সাধনার ক্ষেত্রকে আরও বিস্তৃত ও বহুধা করতে পারবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

মোয়াজ্জম হোসেনের বক্তৃতা থেকে বোঝা যায় সাহিত্য সমাজের গ্রহিষ্ণু ও চলিষ্ণু জীবনধর্মকে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন এবং তিনি নিজেও তারই সমর্থক ছিলেন। সেজন্য সাহিত্য সমাজকে তিনি অন্তর থেকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। প্রবীণদের সঙ্গে তাদের যে একটি দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছে তা তার অজনা ছিল না। কিন্তু এই শাশ্বত সত্য তিনি জানেন যে দ্বান্দ্বিকতার মধ্য দিয়েই সমাজ এগিয়ে চলে। তবে প্রবীণদের অভিজ্ঞতা, সুচিন্তা ও সাবধানতাকে তিনি অবজ্ঞা করতে বলেন না। জীবনের কল্যাণময়তার ক্ষেত্রে এসবেরও গুরুত্ব আছে। মুসলিম সাহিত্য সমাজও এ মতের বিরোধী ছিল না। একালের জীবনোন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রাচীনের যা-কিছু কল্যাণকর তাকে তারা গ্রহণীয়ই ভেবেছিলেন।

সাধারণ সভাপতি নাসির উদ্দীন আহমদের ভাষণটি যেমন দীর্ঘ তেমনি মূল্যবান। ভাষণটি আদ্যন্ত উদার, মুক্ত ও যৌক্তিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে লেখা। এতে আবুল হুসেন ও আবদুল ওদুদেরই কণ্ঠস্বর শোনা যায়। 'সওগাত' পত্রিকার সম্পাদকের দফতরের বক্তব্য থেকেও ভাষণটির গুরুত্ব অনুধাবন করা যায়। দফতরে বলা হয়—

ঢাকা মুসলিম-সাহিত্য-সমাজের চতুর্থ বার্ষিক অধিবেশনে কলিকাতার এডিশন্যাল চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট, খান বাহাদুর নাসিরুদ্দিন আহমদ যে-সুন্দর অভিভাষণ প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে অনেক প্রণিধানযোগ্য কথা আছে। বর্ত্তমানে মুসলমানেরা ইসলামের মর্ম্মকে অস্বীকার করিয়া যে-ভাবে তাহার অবমাননা করিতেছে, তাহাতে আমাদের সমাজে শ্রদ্ধেয় খান বাহাদুর সাহেবের ন্যায় বহু ব্যক্তির আবির্ভাব একান্ত প্রয়োজন হইয়াছে। ইসলাম যে-সকল মূল নীতিকে আশ্রয় করিয়া মানুষকে উন্নতির পথে, বিচিত্র ভবিষ্যতের পথে অগ্রসর হইতে আহ্বান করিয়াছে, আমরা এখন সেগুলি একরূপ বিস্মৃত হইয়াছি। যুগে যুগে মানুষের—সমাজের সম্মুখে যে-সকল নূতন নূতন সমস্যা উপস্থিত হয় এবং যুগ-প্রধানেরা সেগুলির যে যে সাময়িক সমাধান করিয়া যান, আমাদের অগ্রসরশীল জীবনের কর্ম্মপ্রচেষ্টায় তাহাদের প্রকৃত স্থান ও মূল্য-নির্ধারণে আমরা অনবরত ভুল করিয়া চলিয়াছি। খান বাহাদুর নাসিরুদ্দিন আহমদ সাহেব আমাদের এই ভুলের প্রতি অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার এ কার্য্য সংস্কারকের। সুতরাং তাঁহার উক্তিগুলি যে সকলের কাছে প্রিয় হইবে না, ইহা অত্যন্ত স্বাভাবিক। কিন্তু খান বাহাদুর সাহেবের উক্তিগুলি পাঠ করিবার সময় আমরা যেন একটী প্রাচীন সত্য ভুলিয়া না যাই—হিতজনক, কল্যাণকর অথচ প্রিয় ও মনোহর, এরূপ বাক্য জগতে দুর্লভ।[১৩]

নাসির উদ্দীনের মতে ইসলামে যুক্তিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। দুর্দমনীয় জ্ঞানস্পৃহা ও ব্যাকুল সত্যানুসন্ধানই ইসলামের একটি বড় বিশিষ্টতা বলে তিনি মনে করেন। এই বিশিষ্টতার বলেই জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় প্রভূত উন্নতি সাধন করে মুসলমানরা এক মহান সভ্যতার জন্ম দিতে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু সেই ধারা তারা বজায় রাখতে পারে নি। ফলে

www.pathagar.com

শুরু হয় তাদের অধঃপতন। নাসির উদ্দীনের মতে বুদ্ধিবৃত্তি ও জ্ঞানস্পৃহা পরিত্যাগই তাদের দুর্গতির মূল কারণ। আর সেজন্যই,

জীবন্ত ইসলামের পরিবর্ত্তে তাই আজ দেখতে পাই আচার-পদ্ধতির ইসলামের কঙ্কাল, আর প্রাণবন্ত মুসলমানের স্থানে তাই আজ দৃষ্ট হয় সংস্কারাচ্ছন্ন parrot মুসলমান বা মোল্লা, যার চিন্তার উৎস rituals বা dogma-র পাথর চাপে নিরুদ্ধ হয়ে গেছে। একটু চিন্তা করলে দেখা যাবে এই যে পরবর্ত্তী যুগের ritualistic ইসলাম এ মানবের কোন কল্যাণে আসে নি। পরন্তু মুসলমান জাতিগুলির মধ্যে এক অভিসম্পাতের মত কাজ করেছে।[১৪]

মুসলমানের জীবনে এমন কোনো সমস্যা নেই যার প্রতি নাসির উদ্দীন তার বক্তৃতায় আলোকপাত করেন নি। তার সমাজ-সচেতনতা যে সুতীক্ষ্ণ ছিল এ বক্তৃতায় সে পরিচয় স্পষ্ট ও স্বপ্রকাশ। যুক্তি ও বুদ্ধিবিমুখ ধর্মাবেগ, পরকালের মোহ, বাস্তবতাবোধের অভাব, অতীতমুখিতা, শিক্ষা সমস্যা, আর্থিক সমস্যা, নারীকেন্দ্রিক নানা সমস্যা, হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক সংকট ইত্যাটি বহু কিছুর অবতারণা ও সেগুলি থেকে মুক্তিলাভের উপায় তিনি নির্দেশ করেছেন। এর মধ্যে কোনো কোনো সমস্যাকে তিনি ভিন্নতর ও গভীর দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছেন। বাঙালি মুসলমান যে মূর্খ হয়ে রয়েছে তাতে লাভ কেবল মোল্লাদের নয়, সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য শোষক শ্রেণীরও। এখানে ধর্মনীতি ও শোষণনীতি একাট্টা। তার মতে শোষকদের মধ্যে মোল্লারা হয়েছে 'সবচেয়ে ভীষণ'। কেননা একদিকে এরা টাকা উপায় করে, আর অন্যদিকে মুসলমানদের ভ্রান্ত আদেশ-নিষেধের বেড়াজালে আবদ্ধ রেখে তাদের ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ রুদ্ধ করে রাখে।

পর্দাপ্রথার ক্ষতিকর নানাদিক সম্পর্কে অনেক মুসলিম লেখকই আলোচনা করেছেন। নাসির উদ্দীনও তার বক্তৃতায় সে-সব কথা বলেছেন। কিন্তু এটিকে তিনি নারীত্বের অবমাননার দিক থেকেও দেখেছেন। একথা অস্বীকারের উপায় নেই যে, নারীর যে-পর্দাব্যবস্থা পুরুষেরা প্রবর্তন করেছে তাতে যে-মৌল দৃষ্টিভঙ্গী কাজ করেছে তা হচ্ছে যৌনদৃষ্টি। এ সর্বক্ষণই মনে করিয়ে দিচ্ছে যে মেয়েদের যৌন-জীবন ছাড়া আর কোনো জীবন নেই। পর্দাপ্রথাকে তিনি তাই 'কুৎসিত প্রথা' বলতে দ্বিধা করেন নি।

মুসলিম মানসের একটি প্রধান প্রবণতা সম্পর্কে নাসির উদ্দীন তার বক্তৃতায় কিছুটা আলোকপাত করেছেন। সেটি হচ্ছে তার অতিমাত্রায় পরকালের মোহ। বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একে তিনি 'ভয়াবহ' বলে মন্তব্য করেছেন। নির্মোহ মনে ভেবে দেখলে এই মন্তব্যের সত্যতা অস্বীকারের উপায় থাকে না। মুসলমান তার যাবতীয় কর্মকাণ্ডের পেছনে পরকালের সুখের হিসেব করে, যেন তার কোনো মানবীয় দায় নেই, কর্তব্য নেই। এর ফলে অনিবার্যত ইহকালীন জীবন মূল্য হারায়, এমনকি অস্বীকৃতও হয়। ফলে নানাবিধ দুঃখ-কষ্ট তার জীবনকে ক্লিষ্ট করে। কিন্তু সে আত্মপ্রসাদ লাভ করে এই বিশ্বাসে যে ইহকালে যে যত কষ্ট ভোগ করবে পরকালে সে তত বেশি সুখ ভোগ করবে। নাসির উদ্দীনের মতে এই বিশ্বাসের মূলে আছে 'তথাকথিত' আলেমদের ভ্রান্ত শিক্ষা। এ শিক্ষা প্রকৃত ইসলামের পরিপন্থী।

মাদ্রাসা শিক্ষার প্রতি অতিমাত্রায় মোহের পেছনেও একই বিশ্বাস অন্যতম কারণ হিসেবে কাজ করছে। এ মন্তব্য সেদিন যেমন সত্য ছিল, আজও তা-ই। মাদ্রাসা শিক্ষা একালের জীবনের জন্য কার্যকরী নয় বলে নাসির উদ্দীন তা সমর্থন করেন নি। যে-বিদ্যা পৃথিবীর

www.pathagar.com

বিভিন্ন জাতির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় সমর্থ করে তোলে না তার গুরুত্ব স্বীকারের যুক্তি নেই। তার বিবেচনায় ধর্মজ্ঞান শিক্ষার জন্য মাতৃভাষায় ধর্মগ্রন্থসমূহের অনুবাদ বরং বেশি ফলদায়ক। কেননা মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থায় প্রকৃত ধর্মজ্ঞান লাভ সম্ভব হচ্ছে না।

নাসির উদ্দীন চিন্তাচেতনায় যে সেকিউলার মানুষ ছিলেন তার স্পষ্ট ও উজ্জ্বল পরিচয় রয়েছে এই ভাষণে। তাই ধর্মবিশ্বাসী হয়েও রাষ্ট্রকে তিনি ধর্মীয় প্রভাবমুক্ত রাখার কথা বলতে পেরেছেন এবং তুরস্কের কামাল পাশাকে স্বাগত জানাতে পেরেছেন। বলা যায় তিনি ছিলেন মুসলিম সাহিত্য সমাজেরই সগোত্রীয় এক ব্যক্তিত্ব।

নাসির উদ্দীনের ইতিহাস-জ্ঞান ছিল গভীর। বক্তৃতায় ইউরোপের ইতিহাসের যে-প্রসঙ্গটুকু তিনি এনেছেন তা থেকেই এ ধারণা করা যায়। সমকালীন বিশ্বের মুসলিম সম্প্রদায়ের মতো দুরবস্থা একদিন ইউরোপেও ছিল এবং তারও মূল কারণ ছিল অন্ধ ধর্মীয় বোধ ও বিশ্বাস। ধর্মান্ততা তাদেরও কম ছিল না। ইউরোপ সেই ঘেরাটোপ থেকে বেরিয়ে এসে উন্নতির পথে অগ্রসর হয়েছে। খৃস্টান সম্প্রদায় তা যদি পারে তবে মুসলমানরা তা পারবে না কেন? নাসির উদ্দীন তাই নিরাশ হন নি। বরং লক্ষ্য করেছেন যে আজকের বুদ্ধি ও যুক্তিবাদের যুগে ইউরোপের সংস্পর্শে এসে তুরস্ক, মিশর, আরব প্রভৃতি মুসলিম দেশে নবজাগরণের 'বান' এসেছে। ভারতবর্ষের মুসলমানদের মধ্যেও যুক্তিবাদের প্রসার লক্ষিত হচ্ছে। শারীরিক, মানসিক, আর্থিক, সামাজিক—এককথায় সর্বাঙ্গীণভাবে দুর্দশাগ্রস্ত বাঙালি মুসলমানের জীবনেও স্বাধীন চিন্তার হাওয়া লেগেছে। ঢাকার মুসলিম সাহিত্য সমাজ তারই পরিচয় বহন করছে।

পঞ্চম বার্ষিক অধিবেশন

সাহিত্য সমাজের পঞ্চম বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৩১ সালের ১২ ও ১৩ই এপ্রিল মুসলিম হলে। উল্লেখ্য যে মুসলিম হলে সাহিত্য সমাজের এটিই শেষ অধিবেশন। এরপর হল-কর্তৃপক্ষ এখানে আর কোনো অধিবেশন অনুষ্ঠানের অনুমতি দেন নি। বলা দরকার যে সাহিত্য সমাজের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক মুসলিম হলের প্রথম প্রভোস্ট এ. এফ. রহমান তখন বিদেশে।

আলোচ্য অধিবেশনের অভ্যর্থনা-সভাপতি নিযুক্ত হয়েছিলেন ঢাকা ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজের ইংরেজির অধ্যাপক আবদুর রব চৌধুরী ও সাধারণ সভাপতি ঢাকার প্রসিদ্ধ ইউনিয়নি চিকিৎসক ও পণ্ডিত হাকিম হাবিবুর রহমান (১৮৮১-১৯৪৭)।

অভ্যর্থনা-সভাপতি তার ভাষণে বাঙালি মুসলমান সমাজে বিদ্যমান অগ্রগতিপ্রতিবন্ধক কয়েকটি সমস্যা সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরেন এবং সে-সব সমস্যা নিরসনকল্পে শিক্ষা ও সাহিত্যচর্চার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তার বিশ্বাস শিক্ষা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বাঙালি মুসলমানের সাহিত্যচর্চাও বৃদ্ধি পেতে থাকবে এবং তাদের দানে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে।

সাধারণ সভাপতি শেফাউলমুলক হাকিম হাবিবুর রহমান ছিলেন সমকালীন ঢাকার একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। জন্মসূত্রে অবাঙালি হলেও তিনি বাংলা জানতেন। ঢাকা বিষয়ে তিনি একাধিক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, যার একটি 'আসূদেগানে ঢাকা' (ঢাকায় যারা সমাহিত)।

www.pathagar.com

বইটির বাংলা অনুবাদ করেন মওলানা আকরাম ফারুক ও মওলানা আ. ন. ম. রুহুল আমীন চৌধুরী। হাবিবুর রহমানকে তারা উল্লেখ করেন 'হযরত ওমর ফারুক (রা.)-এর বংশোদ্ভূত মুসলিম জাতির দরদী নায়ক অমর মনীষী বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী স্বনামধন্য চিকিৎসক, সাহিত্যিক, কবি, ইতিহাস গবেষক, রাজনীতিবিদ, সমাজসেবক, সাংবাদিক, দেশসেবক, ভাষাতত্ত্ববিদ, প্রত্নতাত্ত্বিক, গরীবের হিতাকাঙ্ক্ষী, মুসলিম জাগরণের দিশারী, ইসলামী ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক একজন আদর্শ চরিত্রবান মুসলিম মনীষী' হিসেবে।[১৫]

হাবিবুর রহমানের ভাষণটি মূলত ইতিহাসভিত্তিক। মুসলমানরা কিভাবে এদেশে এসেছে, নতুন ভাষা ও সংস্কৃতির জন্ম দিয়েছে ইত্যাদি বয়ানে ভাষণটি পূর্ণ। তিনি যে একজন ইতিহাসবিদ ও পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন তার উজ্জ্বল স্বাক্ষর রয়েছে এই অভিভাষণে।

সমগ্র ভারতের মুসলিম জনসংখ্যার অনুপাতে বাংলায় তাদের সংখ্যা এক তৃতীয়াংশেরও অধিক। অথচ এরাই অন্যদের তুলনায় অধিক দুরবস্থায় পতিত হয়ে আছে। এজন্য আফসোস হওয়া অস্বাভাবিক নয়। তবু মুসলিম সাহিত্য সমাজের তরুণ কর্মীর দল যে কল্যাণকর্মে অগ্রসর হয়েছেন তাতে হাবিবুর রহমান আশান্বিত ও আনন্দিত হয়েছে।

ষষ্ঠ বার্ষিক অধিবেশন

১৯৩২ সালের মার্চের ২৫ ও ২৬ তারিখে বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলে সাহিত্য সমাজের ষষ্ঠ বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনে অভ্যর্থনা-সভাপতি ছিলেন আবুল হুসেন এবং সাধারণ সভাপতি বাংলা সরকারের সমবায় বিভাগে উচ্চপদাসীন কমরুদ্দীন আহমদ।

অভ্যর্থনা-সভাপতি যেহেতু নিজেই সাহিত্য সমাজের অন্যতম প্রধান সংগঠক, ভাবুক ও লেখক ছিলেন সেহেতু তার বক্তৃতাটি নানাদিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। সাহিত্য সমাজের জন্ম, উদ্দেশ্য ও অগ্রগতি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত কিন্তু সমগ্র একটি রূপরেখা তিনি তার ভাষণে উপস্থাপন করেছেন। এই ভাষণ থেকেই জানতে পারা যাচ্ছে মুসলিম হলে ১৯৩১ সালের এপ্রিলের পর সাহিত্য সমাজের অধিবেশন যে বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল তা করা হয়েছিল অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে। বোঝা যায়, যে-কোনো কারণেই হোক, হল-কর্তৃপক্ষ এই নিষিদ্ধকরণকে কতখানি গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন। তার পর থেকে নানা স্থানে তাদের সাধারণ ও বার্ষিক অধিবেশন করতে হয়েছে। স্বীয় জন্মস্থান থেকে বহিষ্কৃত হয়ে সাহিত্য সমাজের এই 'পথে পথে' ঘুরে বেড়ানোর দুর্ভাগ্যের জন্য অভ্যর্থনা-সভাপতির কণ্ঠে একটি অব্যক্ত আফসোসের সুর ধ্বনিত হয়েছে।

আবুল হুসেন তার বক্তৃতায় সাহিত্য সমাজের মৌল উদ্দেশ্য ও সেই উদ্দেশ্য সাধনে তাদের সাফল্যের উপর আলোকপাত করেছেন। তারা আন্তরিকভাবে চেয়েছিলেন মুসলমানের জীবনকে সক্রিয় ও গতিশীল করতে। সেজন্য তারা প্রয়োজনবোধ করেছিলেন স্বাধীনভাবে চিন্তাচর্চার। কিন্তু তাদের সেই চর্চা নির্বাধ হতে পারেনি। তবু তারা নিরস্ত হন নি। ফলে সমাজ যে অনেকখানি এগিয়ে যেতে পেরেছে তাতে সন্দেহ নেই। এই অর্জনটুকু অবশ্যই সাহিত্য সমাজের প্রাপ্য। তার বক্তৃতা থেকে আমরা জানতে পারছি যে আগের বছরের বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতি হাকিম হাবিবুর রহমান মুসলিম সমাজের অতীত ইতিহাস-গবেষণা ও ভিন্ন ভাষার মূল্যবান গ্রন্থরাজি অনুবাদের যে-প্রয়োজনীয়তার কথা

www.pathagar.com

বলেছিলেন সে-প্রয়োজন সাহিত্য সমাজও অনুভব করে এসেছে। সেজন্য দরকার ছিল একটি একাডেমী প্রতিষ্ঠার। সাহিত্য সমাজের তৃতীয় বর্ষের সম্পাদক কাজী মোতাহার হোসেনের ঐ বর্ষের বার্ষিক বিবরণী থেকেও জানা যায় আরবি, ফারসি ও উর্দু গ্রন্থাদির বঙ্গানুবাদ করার জন্য একটি অনুবাদ শাখা স্থাপন করার সংকল্প তাদের ছিল।[১৬] কিন্তু প্রয়োজনীয় অর্থের অভাবে তাদের সে-আকাঙ্ক্ষা সফল হতে পারে নি।

সভাপতি কমরুদ্দীন আহমদ তার অভিভাষণের নাম দিয়েছিলেন 'জীবন-সমস্যা'।[১৭] এই শব্দবন্ধটি তাৎপর্যবাহী। জীবনের সঙ্গে সমস্যার অথবা সমস্যার সঙ্গে জীবনের সম্পর্ক অঙ্গাঙ্গি। জীবনের সমস্যাসমূহের সমাধান মানুষকেই করতে হয় নিজের মেধা-বুদ্ধি-ইচ্ছাশক্তির সাহায্যে। ইসলামের নবী এভাবেই তার নিজের জীবনের ও অন্য মানুষের তথা জগতের কল্যাণসাধন করেছিলেন। এজন্য দীর্ঘকালব্যাপী তাকে সাধনা করতে হয়েছিল।

কমরুদ্দীন আহমদ মনে করেন সেবাধর্ম হচ্ছে জীবনরক্ষার শ্রেষ্ঠ উপায় আর চৌর্যবৃত্তি ও ভিক্ষাবৃত্তি নিকৃষ্ট উপায়। কিন্তু আমাদের দেশে ভিক্ষাবৃত্তির প্রকৃতি সম্পর্কে তিনি যা বলেছেন তার নিহিত অর্থ স্পষ্ট হতে পারে নি বলে মনে হয়। যা-ই হোক, জীবনরক্ষার শ্রেষ্ঠ উপায় সেবাধর্মে নিয়োজিত হওয়ার পূর্বশর্ত হিসেবে তিনি মানুষের প্রতি দরদ ও সহানুভূতি উদ্রিক্ত হওয়ার কথা বলেছেন। তা না হলে মানুষের মধ্যে কর্ম-প্রেরণা জাগে না এবং কর্মপ্রেরণা না জাগলে মানুষের দুঃখমোচনও হয় না। এ সত্য শাশ্বত।

সপ্তম বার্ষিক অধিবেশন

১৯৩৩ সালের ৩রা এপ্রিল ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজ-মিলনায়তনে সাহিত্য সমাজের সপ্তম বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এ অধিবেশনের অভ্যর্থনা-সভাপতি ছিলেন সৈয়দ নূরুল হক ও সভাপতি ঢাকা-বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্দু-ফারসি বিভাগের অধ্যক্ষ ফিদা আলী খান। ফিদা আলী ছিলেন জাতিতে রোহিলা পাঠান, জন্মস্থান ভারতের রামপুর। তাফাজ্জল হোসাইনের স্মৃতিকথা থেকে জানা যায় অসাধারণ পাণ্ডিত্যের অধিকারী ফিদা আলী বলতেন যে তার সাত পুরুষের মধ্যে তিনিই কেবল অসি ছেড়ে মসী ধরেছেন।[১৮] ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হলে তিনি ঢাকা কলেজ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রিডার পদে যোগ দেন। দলাদলি, তোষামোদ বা কারো নিন্দা করতেন না বলে বিশ্ববিদ্যালয়ে তার বিশেষ মর্যাদা ছিল। প্রক্টর ও কলা অনুষদের ডিনের দায়িত্ব তিনি পালন করেছিলেন। অবাঙালি হলেও তিনি যে ভালো বাংলা জানতেন সে-পরিচয় তার বক্তৃতায় পাওয়া যায়। সাহিত্য সমাজের নবম বর্ষের চতুর্থ সাধারণ অধিবেশনে তিনি পারস্য কবি ফেরদৌসীর জীবন ও কাব্য সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা করেন বলে কার্যবিবরণী থেকে জানা যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের তিনি উর্দু অনুবাদ করেছিলেন 'বিষকে রোগ' নাম দিয়ে।[১৯]

অভ্যর্থনা-সভাপতির ভাষণ আমাদের পক্ষে দেখা সম্ভব হয় নি। তবে কার্যবিবরণীতে তার ভাষণের যে-সারমর্ম লিপিবদ্ধ হয়েছে তা থেকে তার বক্তব্যটি মোটামুটি অনুধাবন করা যায়। কার্যবিবরণীতে লেখা হয়েছে :

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মহোদয় অভ্যর্থনা প্রসঙ্গে মুসলিম সাহিত্য সমাজ ও বিভিন্ন জাতির বৃহত্তর সমাজের সম্পর্ক ও প্রগতিপন্থীদের কার্যক্রম বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন। ভাবীযুগে যে এই সমাজ

www.pathagar.com

মুসলিম সমাজের একমাত্র কৃষ্টি কেন্দ্র হইবে, তাহাই নহে, চিন্তা জগতের ইতিহাসে ইহা এক বিশিষ্ট স্থান দখল করিয়া থাকিবে ও যুক্তিবাদী পন্থীদের অগ্রপথিক হিসাবে গণ্য হইবে—ইহার প্রতি তিনি ইঙ্গিত করেন। তিনি দৃঢ়তার সহিত বলেন যে চোখ বুঁজিয়া 'সবকিছু' মানিবার দিন অনেক পূর্বেই অতীত হইয়াছে, আসিয়াছে এখন যুক্তি দ্বারা বিচার করিয়া গ্রহণ করিবার দিন। আমরা সবকিছু জানিতে এবং সম্যকরূপে বুঝিতে চাই। যাহারা আমাদেরকে বুঝাইবার ভার গ্রহণ করিয়াছেন, তাহারা যদি মুক্ত বুদ্ধি ও উদারতা লইয়া অগ্রসর হন তবে চিন্তা জগতে এক নূতন অধ্যায়ের সৃষ্টি হইবে।[২০]

সভাপতির ভাষণটি 'বুলবুল' পত্রিকায় 'মোতাজেলাবাদ সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা' শিরোনামে দু'কিস্তিতে প্রকাশের পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু কার্তিক–পৌষ ১৩৪১ সংখ্যায় প্রথমাংশ ছাপা হওয়ার পর ঘোষণা দেয়া সত্ত্বে–ও এর শেষাংশ আর ছাপা হয় নি। ছাপা না হওয়ার কারণ জানা সম্ভব হয় নি। অথচ এর পরে পত্রিকাটির আরও কয়েকটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল। ফলে সম্পূর্ণ ভাষণটি আমাদের পক্ষে দেখা সম্ভব হয় নি।

ফিদা আলী খানের বক্তৃতা সম্পর্কেও কার্যবিবরণীতে আলোকপাত করা হয়েছে। বিবরণীতে লেখা হয় :

...সভাপতি সাহেব তাহার সুচিন্তিত ও সারগর্ভ অভিভাষণে মুসলিম জগতের জ্ঞানপন্থী চির অনুসন্ধিৎসু মুতাজিলা সম্প্রদায়ের চিন্তাধারার ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশের সংক্ষিপ্ত বিবৃতি প্রদান করেন। বিষয়টি অতিশয় সূক্ষ্ম ও জটিল হইলেও তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্যের নিকট তাহা অতিশয় সহজ আকার ধারণ করিয়াছে। ... যুক্তিবাদ মুতাজিলা সম্প্রদায়ের চিন্তাধারা ও অনুসন্ধানের মূলমন্ত্র, এই যুক্তিবাদের সহিত সাহিত্য সমাজের কি সম্পর্ক এইস্থলে ইহা না বলিলেও চলে। তবু বলিতে হয় যে মুতাজিলাবাদের গোড়ার কথা চিন্তার মুক্তি, বা জ্ঞানের স্বাধীনতা এবং মানব জীবনের মঙ্গলামঙ্গল ও পন্থা নির্ণয়ে যুক্তির স্থান ইত্যাদি জটিল ও সূক্ষ্ম বিষয়গুলির আলোচনা শুধু চিন্তাশীল সাহিত্যিককেই সেদিন আনন্দ প্রদান করে নাই, ইহা সমুদয় শ্রোতৃবর্গেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল।

স্বাধীন চিন্তার প্রশ্রয় দিতে গিয়া চিন্তাবিদগণের জীবনে বহুপ্রকার লাঞ্ছনা পাইতে হইয়াছিল, এমনকি জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করিতে হইয়াছিল এবং ইসলামের সুবর্ণ যুগে এই চিন্তার মুক্তিই ছিল কৃষ্টি জগতের বিশেষ দান এবং তাহাতে বাধা প্রদান করাই ছিল গোঁড়া সম্প্রদায়ের বিশেষত্ব। সভাপতি মহোদয় তাঁহার অভিভাষণের উপসংহারে এই কথারই ইঙ্গিত করিয়াছেন যে সর্ব যুগে ও সর্ব সমাজে উদারতা ও পরমত সহিষ্ণুতাই সর্ব জাতির মনে অকুণ্ঠিত শ্রদ্ধার ভাবকে জাগাইয়া দেয়।[২১]

ফিদা আলীর বক্তৃতা সীমাবদ্ধ ছিল মূলত মোতাজেলা দর্শন ও তার অনুসারীদের মতের সংক্ষিপ্ত বিবরণের মধ্যে। এই বিবরণের ভূমিকাংশটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ। চিন্তা ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে মানুষকে তিনি দু'ভাগে বিভক্ত করে দেখেছেন—আনুগত্যবাদী ও বিচারবাদী। আনুগত্যবাদীরা নিজেদের বিচার–বুদ্ধির উপর কোনো ভরসা করতে পারেন না, অন্যের নিকট থেকে নির্বিচারে গ্রহণ করা মতকেই তারা অভ্রান্ত সত্য মনে করেন। অন্যদিকে বিচারবাদীদের প্রধান আশ্রয় বিচার–বুদ্ধি, একেই তারা সত্যনির্ণয়ের চরম অবলম্বন মনে করেন। ধর্ম সম্বন্ধীয় বিশ্বাস ও মতবাদেও তারা এই বিচার–বুদ্ধির প্রয়োগ করেন। এটি যে খুবই ঝুঁকিপূর্ণ তা তারা জানেন। কেননা আনুগত্যবাদীদের কাছে তাদের বিশ্বাসের বিরুদ্ধাচরণ অসহ্য। সেক্ষেত্রে বিচারবাদীদের নানা বিপত্তির, এমনকি প্রাণহানিরও আশঙ্কা থাকে। কিন্তু তারা সাহসী পুরুষ, আত্মপ্রত্যয়ের দৃঢ়তা তাদের সব ধরনের বিপদের মুখোমুখি হতে শক্তি দান করে।

ইসলামের চিন্তার ইতিহাসের বিচারবাদীদের প্রসঙ্গে ফিদা আলী বলেছেন যে তাদের পক্ষে সংস্কার বা বিশ্বাসবিহীনভাবে বিচার–জীবন শুরু করা সম্ভব হয় নি ধর্ম ও ধর্মতত্ত্ববিষয়ে

www.pathagar.com

বিচারমূলক আলোচনায় প্রথমেই তাদের আল্লাহ, নবী ও ওহীতে নির্বিচারে বিশ্বাস স্থাপন করতে হয়। তা না হলে কেউ মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত গণ্য হতে পারেন না। তবু এই বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও কোনো কোনো বিচারবাদী মুসলিম চিন্তকের উপর নানাভাবে নির্যাতন করা হয়েছে। এমনকি এ নিয়ে হত্যাকাণ্ড পর্যন্ত সংঘটিত হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে মুসলিম সাহিত্য সমাজের 'মুসলিম' শব্দটির ব্যবহার প্রসঙ্গে একটি ভিন্নতর ব্যাখ্যার কথা উল্লেখ করা যায়, যেটি আমাদের প্রথম আলোচনায় আমরা তুলি নি। ব্যাখ্যাটি দিয়েছেন সাহিত্য সমাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত লেখক কাজী মোতাহার হোসেন। একটি সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন যে, তখনকার গোঁড়া মোল্লা-মৌলবিদের ও অশিক্ষিত-অর্ধশিক্ষিত মুসলিম জনসাধারণের মনে কিছুটা সান্ত্বনার প্রলেপ দেয়ার জন্য সাহিত্য সমাজের আগে মুসলিম শব্দটি ব্যবহার করা হয়। মুসলমান সমাজ যাতে তাদের নাসারা, নাস্তিক, ইহুদি বা পৌত্তলিক ভেবে ক্ষিপ্ত হয়ে না ওঠে তারই জন্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে ঐ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছিল।[২২] এটি মোতাহার হোসেনের নিজস্ব ব্যাখ্যা কিনা জানি না, কিন্তু ব্যাখ্যাটির মধ্যে ভেবে দেখবার মতো ইঙ্গিত আছে বলে মনে হয়।

অষ্টম বার্ষিক অধিবেশন

সাহিত্য সমাজের অষ্টম বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৩৪ সালের ৩০ শে মার্চ ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজ-মিলনায়তনে। এ অধিবেশনে অভ্যর্থনা-সভাপতি ও সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন যথাক্রমে অধ্যাপক ওসমান গণি ও খ্যাতনামা লেখক মোহম্মদ বরকতুল্লাহ (১৮৯৮-১৯৭৪)।

এ বছরেরও অভ্যর্থনা-সভাপতির ভাষণ আমরা সংগ্রহ করতে পারিনি। এর কোনো সূত্রও আমরা কোথাও পাই নি। এমনকি কার্যবিবরণীতেও কেবল বক্তার নামোল্লেখ ছাড়া তার বক্তৃতা সম্পর্কে কিছু বলা হয় নি।

সভাপতি মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ এ সময় ঢাকায় ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে কর্মরত ছিলেন। কার্যবিবরণী থেকে জানা যায় এ বছর ৮ই জানুয়ারি তিনি প্রথম বারের মতো সাহিত্য সমাজের অষ্টম বর্ষের চতুর্থ সাধারণ অধিবেশনে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং সভায় পঠিত কামাল উদ্দীনের (কবি সুফিয়া কামালের স্বামী) 'বিবাহ' নামক প্রবন্ধের আলোচনায় অংশ নিয়েছিলেন। এর প্রায় তিন মাসের মাথায় তাকে বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির দায়িত্ব পালন করতে হয়।

সাহিত্য সমাজের আট বছর পূর্তিতে সন্তোষ প্রকাশ করে বরকতুল্লাহ তার বক্তৃতায় বলেন যে এই প্রতিষ্ঠানের মূলে একটি সত্যিকার সাধনা আছে। সমাজের প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই তিনি এর প্রগতির দিকে উৎসুক নেত্রে চেয়ে ছিলেন। তিনি জানেন এর চলার পথ নিষ্কন্টক হতে পারে নি, নানা দুর্যোগ-দুর্বিপাক এর উপর দিয়ে বয়ে গেছে। তবু এ বাঁচার প্রবল আকাঙ্ক্ষাতেই বেঁচে আছে। সেজন্য সমাজের সভাপতি ও সভ্যগণের অপরাজেয় ধৈর্যকে শ্রদ্ধার চোখে দেখা উচিত বলে তিনি মনে করেন। তা না হলে আমাদের নিজেদেরই উপলব্ধির দৈন্য ও অনুদারতার প্রকাশ পাবে।

www.pathagar.com

প্রায় সকল সভাপতির মতো বরকতুল্লাহও বাঙালি মুসলমানের দৈন্যদশার বিবরণ দিয়েছেন। তবে তিনিও হতাশ হন নি যখন দেখেছেন যে শিক্ষিত শ্রেণী নিজেদের দৈন্য ও দুরবস্থা সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছে। এই সচেতনতাই জীবন ও সমাজের অগ্রগতির লক্ষ্যে তাদেরকে নানা মত-পথ-চিন্তার অনুসারী করেছে। এই নানা পন্থা সম্পর্কে বরকতুল্লাহর মত উদার বটে, কিন্তু তা কতখানি গ্রহণযোগ্য সে-সম্পর্কে প্রশ্ন উঠতে পারে। লক্ষ্যটাই আসল, উপায় নয়—এ মত প্রতিষ্ঠার জন্য যে-তুলনাটি তিনি দিয়েছেন সে-সম্পর্কে বলা যেতে পারে যে তুলনামাত্রই সর্বার্থসার্থক নয়। এ প্রসঙ্গে সাহিত্য সমাজের পরের বছরের অধিবেশনের সভাপতি মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলীর (১৮৯৬-১৯৫৪) একটি উক্তি অনুধাবনীয়। তিনি বলেন,

... তরুণদের মনের দরজায় সদাজাগ্রত প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে থাকবে নির্মম ও স্বচ্ছ যুক্তিবাদিতা। যুক্তিকে আশ্রয় করে, বিজ্ঞানকে ভিত্তি করে পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র কিভাবে নতুন করে গড়ে উঠতে পারে, তার অনেক পরিকল্পনা আমাদের সামনে আসছে। সবগুলোর দিকেই আমরা চোখ ভরে তাকাবো। যেটা আমাদের নির্মুক্ত বুদ্ধির কষ্টিপাথরে টিকে যাবে, তাকেই আমরা গ্রহণ কর্ব্বো, আর কোনোটীকে মমতা করে পুষে রাখবো না।[২৩]

বরকতুল্লাহ জানেন সৃষ্টির অর্থই হচ্ছে নতুন রূপদান। নতুন প্রাণের নতুন অনুভূতি দ্বারাই সেটি সম্ভব। তাই এই নবীন সঙ্ঘ মুসলিম সাহিত্য সমাজকে তিনি নব নব সৃষ্টির দ্বারা সকলের আনন্দবর্ধন করতে আহ্বান জানান।

নবম বার্ষিক অধিবেশন

১৯৩৫ সালের ৭ই এপ্রিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হল-মিলনায়তনে সাহিত্য সমাজের নবম বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনে অভ্যর্থনা-সভাপতি ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের অধ্যাপক মোহাম্মদ ইব্রাহিম (১৮৯৪-১৯৬৬) ও সভাপতি মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী।

অভ্যর্থনা-সভাপতি মোহাম্মদ ইব্রাহিম সমকালে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব হিসেবে পরিগণিত ছিলেন। তার জীবন ছিল ঘটনাবহুল। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনা ছেড়ে তিনি বিচার বিভাগের চাকরি গ্রহণ করেন এবং পরে ঢাকা হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হন। অবসর গ্রহণের পর কিছুকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের দায়িত্ব পালন করেন। বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনে তার অবদান স্মরণীয়। চিন্তাবিদ হিসেবেও তার যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে।

মোহাম্মদ ইব্রাহিমের ভাষণটি সম্পূর্ণ-সংগ্রহ করা না গেলেও আংশিক অংশটুকুতেও তার চিন্তাশীল মনের স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। সাহিত্য সমাজের লক্ষ্য ও চারিত্র্য তিনি স্বরূপত উপলব্ধি করেছিলেন এবং বাঙালি মুসলমান সমাজে এই জাতীয় সংগঠনের অতীব প্রয়োজনীয়তার কথা স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করেছিলেন। শুধু তা-ই নয়, মুসলমান সমাজকে আঘাত করার যে-অভিযোগ সাহিত্য সমাজের বিরুদ্ধে উত্থাপিত হয়েছিল তিনি সে-আঘাতকে অপরিহার্য বিবেচনা করেছিলেন। কেননা সে-আঘাতের লক্ষ্য ধ্বংসাত্মক ছিল না, ছিল সম্পূর্ণরূপে গঠনমূলক।

সভাপতি প্রখ্যাত সাংবাদিক ও চিন্তাশীল প্রাবন্ধিক মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী তার বক্তৃতা প্রদানকালে কলকাতায় কর্মরত ছিলেন। ঢাকা থেকে কলকাতা ফিরে মনোরোগাক্রান্ত এই

www.pathagar.com

লেখক ঐ বছরেই কোনো এক সময় বরাবরের মতো কর্মস্থল ত্যাগ করে নিজগ্রাম সাতক্ষীরা জেলার বাঁশদহায় চলে যান এবং মৃত্যু পর্যন্ত (৮ই নভেম্বর, ১৯৫৪) নিরলসভাবে সাহিত্যচর্চা করেন। ওয়াজেদ আলীর চিন্তাধারায় বিশ্বাসের সঙ্গে যুক্তির একটি দ্বন্দ্ব ছিল। কিন্তু তার অনেকগুলি রচনা এই দ্বন্দ্ব থেকে মুক্ত থাকতে পেরেছে। আলোচ্য ভাষণটিও সেই জাতীয় একটি রচনা। বস্তুত চতুর্থ বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতি নাসির উদ্দীন আহমদ ছাড়া এমন দীর্ঘ, যুক্তিনিষ্ঠ, সাহসী ও সত্য ভাষণ আর কোনো সভাপতি দিয়েছেন বলে আমাদের মনে হয় না। ভাষা ও রচনাভঙ্গি বাদ দিলে ভাষণটিকে আবুল হুসেন বা আবদুল ওদুদেরই তারুণ্য ও মুক্তবুদ্ধি বিষয়ক কোনো রচনা বলে মনে হবে।

ওয়াজেদ আলীর ভাষণ সম্পর্কে 'বুলবুল' পত্রিকার মাঘ-চৈত্র ১৩৪১ সংখ্যায় একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। প্রতিবেদনে লেখা হয় :

সভাপতি মি. মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী তাঁর সুন্দর সুলিখিত অভিভাষণটিতে বাঙ্গালী মুসলমান সমাজে নির্মুক্ত বুদ্ধির ক্রমবিকাশের ইতিহাস আলোচনা করেন। সাহিত্যের ভিতর দিয়ে—কোন্ কোন্ প্রভাবের বশবর্তিতায়—মুসলিম চিত্তের বর্তমান প্রকাশ, ভবিষ্যতে কোন্ রূপে তার সার্থকতা, যুক্তিবাদ ও বিজ্ঞানবাদের আশ্রয়ে মানুষজীবনের ভাবী পরিণতি—প্রভৃতি বিষয় সভাপতির বর্ণনা ও বিশ্লেষণ সৌকর্য্যে অভিভাষণটি পরম উপভোগ্য হয়ে উঠেছে।

কার্যবিবরণীতেও, মাত্র দুটি বাক্যে, এই ভাষণ সম্পর্কে প্রায় অনুরূপ মন্তব্য করা হয়—"তাঁর সুপ্রশংসিত প্রবন্ধে মুসলিম সাহিত্য সমাজের বীজমন্ত্র 'বুদ্ধির মুক্তি'র বিশদ ব্যাখ্যা করা হয়। বাংলাদেশে এই 'বুদ্ধির মুক্তি'-বাদ কিভাবে ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করেছে তার একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তিনি দেন।"[২৪]

ওয়াজেদ আলী সাহিত্য সমাজকে দেখেছেন কালের প্রেক্ষাপটে। তাই সঙ্গতভাবেই একে তিনি 'কালের সৃষ্টি' বলে অভিহিত করেছেন। আদিম যুগের ভূতের পুজো, প্রকৃতির পুজো, প্রাণী-দেবতার পুজো এবং মানুষ-দেবতার পুজো থেকে এক সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের ও মানুষের-মাধ্যমে-পাওয়া অলৌকিক জ্ঞানের আরাধনায় মানুষের বিশ্বাস অগ্রসর হয়েছে। কিন্তু এখানেই তার চিন্তা থেমে থাকে নি। কাল যত এগিয়েছে ততই বিশ্বাসকে বুদ্ধি দিয়ে মার্জিত করার আকাঙ্ক্ষা বহু দ্বন্দ্বের মধ্যেও তার মনে সবল হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর প্রমাণ তিনি বাঙালির সমকালীন ইতিহাস থেকে দিয়েছেন। কালের গরজে শাস্ত্রশাসনের পক্ষে-বিপক্ষে যুক্তি উপস্থাপনের প্রয়োজন কতখানি প্রবল হয়ে দাঁড়িয়েছে তা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩), ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-'৯৬) মওলানা আকরম খাঁ (১৮৬১-১৯৬১), মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী (১৮৭৫-১৯৫০) প্রমুখের কর্মকাণ্ড ও রচনা থেকে পাওয়া যায়।

মুসলিম সাহিত্য সমাজও মানব-মুক্তির এই গতিশীলতারই ফল। তাই অনিবার্যভাবে এই বিকাশের, বিশেষ করে মুসলিম বুদ্ধিবৃত্তিক চিন্তাধারার সংক্ষিপ্ত প্রেক্ষাপটে সাহিত্য সমাজের জন্মপ্রক্রিয়াকে ওয়াজেদ আলী স্বাভাবিকরূপে দেখেছেন এবং তাকে স্বাগত করেছেন।

ওয়াজেদ আলী কবি ছিলেন না, নকশাজাতীয় স্বকথিত 'প্রায় গল্প' ছাড়া আর কোনো সৃষ্টিধর্মী রসসাহিত্য তিনি রচনা করেন নি। কিন্তু এই বক্তৃতার কোনো কোনো অংশে কবিত্বের স্পর্শ লেগেছে। মনোরম ভাষাভঙ্গি ও বিজ্ঞানমনস্ক যুক্তিশীল মনোভঙ্গির মেলবন্ধনে বক্তৃতাটি অত্যন্ত মনোগ্রাহী হয়েছে।

www.pathagar.com

দশম বার্ষিক অধিবেশন

১৯৩৬ সালের ৩১শে জুলাই সাহিত্য সমাজের দশম বার্ষিক অধিবেশন হয়। এটিই সমাজের শেষ বার্ষিক অধিবেশন। অধিবেশনটি কোথায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল তা জানা যায় নি। এই অধিবেশনে অভ্যর্থনা-সভাপতি ও সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন যথাক্রমে আবদুর রহমান খান ও কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬-১৯৩৮)।

অভ্যর্থনা-সভাপতি এর আগে দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছিলেন। সাহিত্য সমাজের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। একে তিনি খুব কাছ থেকে দেখেছিলেন। তাই এর জন্মেতিহাস ও বাধাবিঘ্নের মধ্য দিয়ে অগ্রসরতার কথা তার অজানা ছিল না। সবদিক বিবেচনা করে তিনি মন্তব্য করেন যে সারা বাংলায় সাহিত্য সমাজের মতো একটি প্রতিষ্ঠানের জন্মভূমি হওয়ার গৌরব ঢাকা নগরীরই প্রাপ্য।

সাহিত্যের সৃষ্টিশীলতাকে আবদুর রহমান অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ দৃষ্টিতে দেখেছেন। এ একদিকে যেমন সমাজের সৃষ্টি তেমনি অন্যদিকে সমাজের স্রষ্টাও বটে। সমাজ সাহিত্যকে সৃষ্টির উপাদান যোগায়, আবার সাহিত্য সমাজের গতিপথ নির্দেশ করে। সাহিত্যকে এ তাৎপর্যে গ্রহণ করতে হলে মুক্তবুদ্ধির চর্চা আবশ্যক। কেননা একমাত্র মুক্তবুদ্ধিই সমাজের প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি করতে পারে এবং তার দোষ-গুণ বিচার করে তাকে সুনিয়ন্ত্রিত করতে সক্ষম হয়। এজন্য সাহিত্য সমাজ মুক্তবুদ্ধিকে তার আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছে। এর ফলে নিরঙ্কুশভাবে না হলেও সবকিছুকে বিচার-বুদ্ধির সাহায্যে গ্রহণ করার জন্য মুসলিম সমাজে একটি সাড়া জেগেছে।

সভাপতির ভাষণটি মূলত তার একটি প্রকাশিত পত্র সম্পর্কে কয়েকজনের আলোচনার সূত্র ধরে রচিত। এই ভাষণ থেকে জানা যাচ্ছে তার কলকাতার বাড়িতে একদিন কাজী মোতাহার হোসেনের সঙ্গে সমকালীন সাহিত্য সম্পর্কে কিছু আলোচনা হয়। সে-আলোচনায় হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের প্রসঙ্গ ওঠে। এই আলোচনার মোটামুটি ভাবটি শরৎচন্দ্র 'বর্ষবাণী' পত্রিকায় চিঠির আকারে লিখে পাঠান। সেখান থেকে লেখাটি হবীবুল্লাহ বাহার (১৯০৬-৬৬) 'অবাঞ্ছিত ব্যবধান' নাম দিয়ে তার সম্পাদিত 'বুলবুল' পত্রিকায় পুনঃপ্রকাশ করেন (বৈশাখ ১৩৪৩) এবং এ সম্পর্কে মুসলিম লেখকদের মতামত আহ্বান করেন।

মোতাহার হোসেন আলাপ প্রসঙ্গে দীর্ঘকাল পাশাপাশি বসবাসরত হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে অবাঞ্ছিত ব্যবধান সম্পর্কে আফসোস প্রকাশ করেন এবং তা দূর করার আবশ্যকতার কথা বলেন। এই দুঃসাধ্য সাধনের উপায় সম্পর্কে কাজী মোতাহারের ভাবনা সম্পর্কে শরৎচন্দ্র জানতে চান। উত্তরে মোতাহার হোসেন জানান যে সাহিত্যের মাধ্যমেই তা সম্ভব। হিন্দু লেখকেরা যদি শুধু হিন্দু পাঠকের জন্য সাহিত্য রচনা না করে মুসলমানদের কথাও একটু ভাবেন, স্নেহ ও সহানুভূতির সঙ্গে তাদের কথা বলেন তাহলে দেখা যাবে বাইরের বিভেদ যা-ই থাক, একই আনন্দ একই বেদনা উভয়ের শিরার রক্তে বয়। শরৎচন্দ্র তখন বলেন—

... এ কথা আমি জানি। কিন্তু অনুরাগের সঙ্গে বিরাগ, প্রশংসার সঙ্গে তিরস্কার, ভালো কথার সঙ্গে মন্দ কথাও যে গল্প-সাহিত্যের অপরিহার্য অঙ্গ। কিন্তু এ-তো তোমরা না করবে বিচার, না করবে ক্ষমা। হয়ত এমন দণ্ডের ব্যবস্থা করবে যা ভাবলেও শরীর শিউরে উঠে। তার চেয়ে যা আছে সেই ত নিরাপদ।[২৫]

এরপর শরৎচন্দ্র আরও কিছু কথা বলেন। তখন মোতাহার হোসেন জিজ্ঞাসা করেন তবে কি এমনি নন-কোঅপারেশন চিরদিন চলবে? উত্তরে শরৎচন্দ্র জানান যে, না, তা চলবে না।

www.pathagar.com

কেননা সাহিত্যসাধকদের জাতি, সম্প্রদায় আলাদা নয়—অন্তরে তারা এক। সেই সত্য উপলব্ধি করে এই অবাঞ্ছিত সাময়িক ব্যবধান মুসলিম সাহিত্যিকদেরই আজ দূর করতে হবে।

'বুলবুল' সম্পাদকের আহ্বানে শরৎচন্দ্রের এই লেখা সম্পর্কে মতামত প্রকাশ করেন মিজানুর রহমান, লীলাময় রায় ছদ্মনামে অন্নদাশংকর রায় (১৯০৪–), মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, ইব্রাহীম খাঁ (১৮৯৪–১৯৭৮) ও কাদের নওয়াজ, যা পত্রিকাটির পরবর্তী চারটি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

এরমধ্যে অন্নদাশংকর রায়, ওয়াজেদ আলী ও মিজানুর রহমানের আলোচনার প্রসঙ্গ শরৎচন্দ্র তার ভাষণে উল্লেখ করেছেন। তার নিজের বক্তব্য সম্পর্কে উল্লিখিত আলোচকদের মতামতের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি এই অভিভাষণে নতুন করে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের উপর আলোকপাত করেছেন।

উপসংহার

মুসলিম সাহিত্য সমাজের বার্ষিক অধিবেশনসমূহের প্রদত্ত অভ্যর্থনা সভাপতি ও সাধারণ সভাপতিদের অভিভাষণগুলিতে সাধারণভাবে যে-বৈশিষ্ট্যটি চোখে পড়ে তা হচ্ছে প্রায় প্রত্যেকেই সমকালীন বাঙালি মুসলিম সমাজের প্রধান প্রধান সমস্যাকে চিহ্নিত করেছেন এবং তাদের নিজস্ব ভাবনা অনুযায়ী সে-সব সমস্যার সমাধানের পথ-নির্দেশনা দিয়েছেন। যদিও তাদের চিন্তায় তাদের স্বসমাজ বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে কিন্তু প্রতিবেশী হিন্দু সমাজকে তারা দৃষ্টির অন্তরালে রাখেন নি। বিশেষ করে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক নিয়ে তারা যে যথেষ্ট ভাবিত ছিলেন তার পরিচয় তাদের ভাষণগুলিতে রয়েছে। মুসলিম সাহিত্য সমাজ যে-লক্ষ্য নিয়ে গঠিত হয়েছিল সভাপতিদের ভাষণগুলিতেও সেই লক্ষ্যবিন্দুর প্রতি গুরুত্ব পড়েছে। সবক্ষেত্রে সাহিত্য সমাজের চিন্তা-দর্শনের সঙ্গে তাদের মতামতের ঐক্য হয়তো লক্ষ্য করা যাবে না, কিন্তু এটি লক্ষ্য করা যাবে যে তারা সকলেই তাদের সমস্যাক্লিষ্ট সমাজ নিয়ে দারুণভাবে উৎকণ্ঠ এবং তার মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় আন্তরিক।

প্রায় প্রাণহীন নীরক্ত জড়বৎ মুসলিম সমাজকে প্রাণ-স্পন্দিত করার জন্য সভাপতিরা সর্বাগ্রে গুরুত্ব দিয়েছেন মাতৃভাষায় সাহিত্যচর্চার প্রতি। এই ক্ষেত্রটিতে তারা সম্পূর্ণ দ্বিধাদ্বন্দ্বহীন। এ. এফ. রহমানের দৃষ্টিতে সাহিত্যচর্চা কেবল জাতির জীবনীশক্তির পরিচায়ক নয়, তার উন্নতিরও সহায়ক। এর সঙ্গে তার আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদাবোধের সম্পর্ক সুনিবিড়। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ মনে করেন যথার্থ সাহিত্য মানুষের সার্বিক মুক্তি—দেহ, মন ও আত্মার মুক্তি দেবেই। এই মুক্তিকে লক্ষ্যবিন্দু করেই সাহিত্যচর্চা করা প্রয়োজন। আবদুর রহমান সাহিত্যের সৃষ্টিশীলতাকে তাৎপর্যপূর্ণ দৃষ্টিতে দেখেছেন। তার মতে এ একদিকে যেমন সমাজের সৃষ্টি, তেমনি অন্যদিকে সমাজের স্রষ্টাও বটে। সুতরাং বাঙালি মুসলমান সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সাহিত্যসাধনাকে তারা একটি অত্যাবশ্যকীয় করণীয় হিসেবে দেখেছেন।

এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর কোন জাতীয় সাহিত্য মুসলিম সমাজের উন্নতির জন্য সহায়ক হবে সেই প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে। এ প্রশ্নে কেউ কেউ ইসলামী বা মুসলিম সাহিত্যের পক্ষে

www.pathagar.com

তাদের মত প্রকাশ করেছেন। তবে মুসলিম সাহিত্য বলতে সবাই একরকম বোঝেন নি। তসদ্দক আহমদের মতে মুসলমানদের সাহিত্যকে ইসলামের আদর্শে গড়ে তুলতে হবে, তাকে প্রকৃত ইসলাম দ্বারা অনুপ্রাণিত করতে হবে। মজফফর আহমদ মুসলমানের যে-সাহিত্য চান তাকে হতে হবে 'ইসলামের অগ্নি-রসে মার্জিত'। আবদুর রহমান মনে করেন একদা মুসলিম-মানসে পুথি সাহিত্যের যে একটি 'চমৎকার প্রভাব' ছিল তা যদি ক্রমবিকাশ লাভ করতে পারত তাহলে তা নতুনতর রূপে সমকালীন মুসলমানের সাহিত্যের অভাব পূরণ করতে পারত। কিন্তু তা যে সম্ভব হয় নি সেজন্য তিনি মুসলমানদের একটি 'কৃত্রিম ভাবধারার মধ্যে হাবুডুবু' খাওয়াকে দায়ী করেছেন। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ মুসলিম সাহিত্য বলতে বুঝিয়েছেন মুসলমানের জীবন, তার সুখ-দুঃখ, আশা-ভরসা, লক্ষ-আদর্শ ইত্যাদি নিয়ে রচিত সাহিত্য। তার মতে এ সাহিত্য কেবল মুসলমানের দ্বারা নয়, হিন্দুর দ্বারাও রচিত হতে পারে এবং তা হবে হিন্দু-মুসলমানের উভয় সম্প্রদায়ের সম্পত্তি।

কিন্তু মুসলিম রচিত সাহিত্যের প্রকৃতি যা-ই হোক না কেন, প্রায় সকল সভাপতি এই বিশ্বাস ব্যক্ত করেছেন যে সাহিত্যচর্চার মাধ্যমেই হিন্দু-মুসলমানের বৈরী সম্পর্ক দূরীভূত হয়ে তাদের মধ্যে মিলন সম্ভব হবে। তসদ্দক আহমদ তো স্পষ্ট বলেছেন এই মিলন রাজনৈতিক প্যাক্ট দ্বারা সম্ভব হবে না, সম্ভব হবে সাহিত্যের মধ্য দিয়ে পারস্পরিক চেনা-জানার মাধ্যমে। সাহিত্যের মাধ্যমে হিন্দু-মুসলিম বিরোধ অবসানের সম্ভাবনার কথা কেবল মুসলিম লেখক-বুদ্ধিজীবীরাই বলেন নি, অনেক হিন্দু লেখক-বুদ্ধিজীবীও বলেছেন। শরৎচন্দ্রের বক্তৃতায়ও সে-পরিচয় পাওয়া যাবে। তার মতে সাহিত্যিক হচ্ছেন সত্য-সাধক ; যারা সত্য-সাধক তাদের মধ্যে কখনো বিরোধ-সংঘাত থাকতে পারে না। সভাপতিদের এ ধারণা অনেকটা সরল বটে কিন্তু এতে সে-যুগের একটি সাধারণ বিশ্বাসই প্রতিফলিত হয়েছে।

লক্ষ্যণীয় যে যারা ইসলামী বা মুসলিম সাহিত্য রচনার কথা বলেছেন তাদের ধারণায় সাহিত্য সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ দৃষ্টি প্রতিফলিত না হলেও তারা কোনো সাম্প্রদায়িক দৃষ্টি-সংকীর্ণতা থেকে এ জাতীয় সাহিত্য রচনার কথা বলেন নি। বরং সে-ধরনের সাহিত্যকে তারা নিন্দা করেছেন। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ জাতীয় বিদ্বেষমূলক সাহিত্যকে স্পষ্টত 'অপসাহিত্য' বলেছেন, আর আবদুর রহমান কোনো কোনো হিন্দু লেখকের রচনায় মুসলমানের নিকৃষ্ট চিত্র অঙ্কনের প্রতিবাদে পাল্টা রচনার মাধ্যমে তার বদলা নেয়ার মনোভাবকে ক্ষুদ্রতা বিবেচনা করেছেন।

সাহিত্য সম্পর্কিত আলোচনায় ভাষা প্রসঙ্গ স্বাভাবিকভাবেই আসে। সাহিত্য সমাজের বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতিদের আলোচনায় তা কেবল স্বাভাবিকভাবে নয়, বিশেষভাবে এসেছে। কেননা বাঙালি মুসলমানের গ্রহণযোগ্য ভাষা নিয়ে দীর্ঘকাল যাবত তাদের মধ্যে বিতর্ক চলে এসেছে। অবশ্য সাহিত্য সমাজের জন্মকালপর্বে সেই বিতর্ক অনেকখানি হ্রাস পেয়েছে। বাঙালি মুসলমান রচিত সাহিত্যের ভাষা যে তার মাতৃভাষা বাংলাই হবে এ নিয়ে কারো মনে আর দ্বিধা নেই। বিতর্কের ভগ্নাবশেষ যেটুকু আছে সে হচ্ছে সাহিত্যের ভাষায় ইসলামী শব্দের আমদানি নিয়ে। যেমন তসদ্দক আহমদ বলেছেন সাহিত্যে ইসলামের আদর্শ ফুটিয়ে তোলার ক্ষেত্রে আবশ্যকমতো ইসলামী ভাবাপন্ন শব্দ ধীরে ধীরে বাংলা ভাষায় প্রচলন করতে হবে। কিন্তু মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বাংলা ভাষায় সংস্কৃত বা আরবি-ফারসি যে-কোনো ধরনের শব্দ-বাহুল্যের বিপক্ষে মত দিয়েছেন। এ ব্যাপারে আরও প্রশংসনীয় মত প্রকাশ করেছেন আবদুর রহমান। তিনি বলেছেন ভাষা সাহিত্যের বাহনমাত্র, প্রকৃত সাহিত্যের

www.pathagar.com

পরিচয় রয়েছে তার ভাবে ও প্রকাশের ভঙ্গিতে। যেখানে এই দুটি জিনিস আছে সেখানে ভাষায় সংস্কৃত বা আরবি-ফারসি শব্দের ন্যূনাধিক্যে সাহিত্যের ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না। অথচ আবদুর রহমান ইসলামী সাহিত্য রচনার পক্ষপাতী। ভাষা প্রসঙ্গে তার এই মত যে যথার্থ সাহিত্য দৃষ্টিসঞ্জাত তাতে সন্দেহ নেই।

সভাপতিদের বক্তৃতায় সাহিত্যের পরেই গুরুত্ব পেয়েছে শিক্ষা প্রসঙ্গ। কারো কারো বক্তৃতায় সাহিত্যের সূত্রেই শিক্ষা প্রসঙ্গটি এসেছে। কেননা উন্নত সাহিত্য সৃষ্টির জন্য উন্নত শিক্ষা অত্যাবশ্যক, কেবল স্রষ্টার দিক থেকে নয় — ভোক্তার দিক থেকেও। যারাই শিক্ষা প্রসঙ্গে অলোকপাত করেছেন তারা সকলেই মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের প্রতি জোর দিয়েছেন। এমন মতও প্রকাশ করা হয়েছে যে মাদ্রাসায় ধর্মীয় শিক্ষা আরবি বা উর্দু-মাধ্যমের বদলে বাংলা ভাষায় দেয়া হলে তা অধিকতর ফলপ্রসূ হবে।

শিক্ষা প্রসঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষা, নারী শিক্ষা, অর্থকরী শিক্ষা ইত্যাদি সকল প্রয়োজনীয় শিক্ষার প্রতি সমান গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। আবদুর রহমান ও মজফফর আহমদ সমাজের কাছে আবেদন জানান যে যদি বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন করা হয় এবং সেজন্য অতিরিক্ত কর দিতে হয় তবু মুসলিম সমাজ যেন তার বিরোধিতা না করে। নারী শিক্ষা যাতে অবাধ হতে পারে সেজন্য মজফফর আহমদ পর্দা প্রথা তুলে দেয়ার পক্ষে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। তার বিবেচনায় যে-সব প্রাণহীন প্রাচীন আচার ও অন্ধ সংস্কার মুসলিম নারীর শিক্ষাপ্রসারের পথ রুদ্ধ করে রেখেছে তার মধ্যে পর্দাপ্রথা সবচেয়ে মারাত্মক। এটি মুসলমানের সাহিত্যপ্রসারের পথকেও রুদ্ধ করে রেখেছে।

মাদ্রাসা শিক্ষা নিয়ে মুসলিম লেখক-বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে কত যে আলোচনা-প্রত্যালোচনা তর্ক-বিতর্ক হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। আমাদের আলোচিত ভাষণসমূহে যারা মাদ্রাসা শিক্ষা বিষয়ে আলোকপাত করেছেন তাদের মধ্যে আবদুর রহমান মাদ্রাসা শিক্ষার জোরালো সমর্থক না হলেও তিনি কেবল নবপদ্ধতির মাদ্রাসা শিক্ষাকে সমর্থন করেছেন এই কারণে যে নবপদ্ধতির মাদ্রাসা শিক্ষা প্রচলনের পর মুসলমানরা আধুনিক শিক্ষার প্রতি কিছুটা আকৃষ্ট হয়েছে। তার মতে এই শিক্ষাব্যবস্থায় ত্রুটি যা আছে তা সংশোধন করে এরই মাধ্যমে মুসলমান সমাজে শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা পেতে হবে। অন্যদিকে নাসির উদ্দীন আহমদ মাদ্রাসা শিক্ষার কোনো পদ্ধতিই সমর্থন করেন নি। তার বিবেচনায় যে-বিদ্যা পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় সমর্থ করে তোলে না তার গুরুত্ব স্বীকারের যুক্তি নেই। তিনি মনে করেন ধর্মজ্ঞান শিক্ষার জন্য মাতৃভাষায় ধর্মগ্রন্থসমূহের অনুবাদ বরং বেশি ফলদায়ক।

ধর্মীয় আচার-বিধি পালন সম্পর্কে যে-সকল সভাপতি বক্তব্য রেখেছেন তারা সকলেই বিষয়টিকে যৌক্তিক ও ধর্মের অন্তর্নিহিত তাৎপর্যগত দিক থেকে দেখেছেন। তসদ্দক আহমদ বলেছেন যে ধর্মের বাহ্যিক ক্রিয়ানুষ্ঠান পালন করলেই প্রকৃত ধর্ম পালন হয় না, ধর্মের মূল উদ্দেশ্য সত্যকে অন্তরে গ্রহণ করা ও সেই অনুযায়ী কাজ করা। একটি মন্তব্যে তিনি অবশ্য গড় মুসলিম-মনোভাবেরই পরিচয় দিয়েছেন। তার মতে কথাবার্তা, কাজকর্ম প্রত্যেক বিষয়ে যে-ধর্মাচারণ আবশ্যক তা শেখার জন্য হযরত মুহম্মদের ন্যায় আদর্শ ও মহামূল্য কোরানের বাণী থাকতে মুসলমানকে 'অন্যত্র যাওয়ার প্রয়োজন নেই'। আবদুর রহমান লক্ষ্য করেছেন মুসলমানরা ধর্মের বাহ্যিক আচার-আচরণ নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করে এবং সেজন্য প্রাণ দিতেও

www.pathagar.com

কুণ্ঠিত নয়, কিন্তু ধর্মের মর্মবস্তু সম্পর্কে উদাসীন। এই উক্তির অর্থ হচ্ছে ধর্মের নির্দেশানুযায়ী তারা জীবন ও চরিত্র গঠন করে না। নাসির উদ্দীন আহমদ এর যে-কারণ ব্যাখ্যা করেছেন তা হচ্ছে মুসলমানরা অতিমাত্রায় পরকালের মোহে ধর্ম-পালন করে, যেন তাদের কোনো মানবীয় দায় নেই, কর্তব্য নেই।

সভাপতিরা আরেকটি বিষয়ে সকলে একমত পোষণ করেছেন। তারা এই প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন যে সত্যান্বেষণের প্রধান ও সর্বোৎকৃষ্ট পথ হচ্ছে যুক্তি ও বিচার-বুদ্ধি। আবদুর রহমান, মজফফর আহমদ, মোয়াজ্জম হোসেন, নাসির উদ্দীন, বরকতুল্লাহ, ওয়াজেদ আলী প্রমুখ সকলের এ সংক্রান্ত বক্তব্যের ভাষা যার যেমনই হোক, সিদ্ধান্ত একই। আর এই দৃষ্টিকোণ থেকেই তারা বাঙালি মুসলমানের, কোনো কোনো ক্ষেত্রে সমগ্র মুসলিম সমাজ-জীবনের নানাবিধ গলদ উন্মোচন করেছেন ও তার যৌক্তিক সমাধানের পথান্বেষণের প্রয়াস পেয়েছেন। এদিক থেকে তাদের রেনেসাঁসপন্থী আধুনিক মানুষ বলতে তেমন বাধা নেই। মুসলিম সাহিত্য সমাজের লেখক কর্মীরাও আন্তরধর্মে তা-ই ছিলেন। সুতরাং একথা আমরা নির্দ্বিধায় বলব যে সাহিত্য সমাজের বার্ষিক অধিবেশনসমূহে সভাপতির দায়িত্ব পালন করার জন্য সংগঠকরা যোগ্য ব্যক্তিদেরই নির্বাচন করেছিলেন।

তথ্যপঞ্জি

১. উদ্ধৃত, আবুল হুসেনের অভিভাষণ, পৃ. ১০৮

২. *রেখাচিত্র*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২০

৩. 'বার্ষিক সম্মেলনের বিবরণ', *শিখা*, ১ম বর্ষ

৪. খোন্দকার সিরাজুল হক, *মুসলিম সাহিত্য সমাজ : সমাজচিন্তা ও সাহিত্যকর্ম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৪

৫. ঐ, পৃ. ৫৭

৬. নিউ স্কিম বা নবপদ্ধতির মাদ্রাসা শিক্ষা ১৯০৮ সালে প্রথম পরীক্ষামূলকভাবে চালু হয় ঢাকা, চট্টগ্রাম ও হুগলী মাদ্রাসায়। তারপর ১৯১৫ সাল থেকে সারা দেশে এই শিক্ষাব্যবস্থা চালু হয়। এর পাঠ্যতালিকা সম্পর্কে আবুল ফজল লিখেছেন, "... পাঠ্যতালিকায় ঘটল আমূল পরিবর্তন — ফার্সী সম্পূর্ণ বাদ পড়লো, শরিয়াৎ বা দীনিয়াৎ অংশও হলো ছাঁটাই। সে জায়গায় আসন পেলো কিছু কিছু ইংরেজী, বাংলা, অংক, আর হাল আমলের ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি বিষয়ের ছিটেফোঁটা, অর্থাৎ মাদ্রাসার সাবেকী পাঠ্যতালিকার সঙ্গে এ যুগের হাইস্কুলের পাঠ্যতালিকার একটা আপোষরফা করে উদ্ভাবিত হলো নতুন একটি শিক্ষা ব্যবস্থা। মাদ্রাসা শিক্ষার বহুকালের পর্দাটাকে একটুখানি ফাঁক করে তাতে আধুনিক শিক্ষার কিছুটা আলো হাওয়া ঢোকার পথ করে দেওয়াই ছিল এ নতুন শিক্ষারীতির উদ্দেশ্য।" *রেখাচিত্র*, পৃ. ৬-৭

৭. অভিভাষণ, পৃ. ৬১

৮. যে-বিদ্যালয়ে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত পড়ানো হতো তার নাম ছিল মিডল ইংলিশ স্কুল।

৯. 'শিখা'র ৪র্থ বর্ষের (১৩৩৭) সম্পাদক মোহাম্মদ আবদুর রশীদও জানিয়েছেন যে অনেকে তাকে বলেছিলেন সাহিত্য সমাজ যদি ধর্ম সম্পর্কে আলোচনা বর্জন করত তাহলে সকল স্তরের লোক এতে যোগ দিত। সম্পাদক মন্তব্য করেছেন ধর্ম সম্পর্কে প্রচলিত মত-বিশ্বাস বিনা বিচারে মেনে নিয়ে সাহিত্য সমাজ যদি অগ্রসর হতো তাহলে তার 'স্পিরিট' বজায় থাকত না। পৃ. ২৪

১০. পরিশিষ্ট, *শিখা*, ৩য় বর্ষ, ১৩৩৬

www.pathagar.com

১১. ৮ম বার্ষিক অধিবেশন সম্পর্কে কার্যবিবরণীতে এ প্রসঙ্গে লেখা হয়, "... অন্যান্য বারের মত সাহিত্য সমাজ সমাগত সুধীবৃন্দের জ্ঞানের খোরাক জোগানোর কাজে কৃতকার্য হলেও ঠিক অন্যান্য বারের মতই বিশেষ জলযোগের বন্দোবস্ত করতে সমর্থ হয় নাই।" আহমদ নূরুল ইসলাম, পৃ. ১৯৭

১২. চৈত্র ১৩৩৫, পৃ. ৬৬৮-৬৯

১৩. চৈত্র ১৩৩৬, পৃ. ৫৫৯

১৪. অভিভাষণ, পৃ. ৮৬

১৫ উদ্ধৃত ; মুনতাসীর মামুন, 'সব মাজার মাজার নয়', *দৈনিক ভোরের কাগজ*, ১০ অক্টোবর, ১৯৯৭

১৬. *কামোহোর (৩য় খণ্ড)*, পৃ. ১০৩-৪

১৭. এটি প্রকাশিত হয়েছিল 'জয়তী' পত্রিকার বৈশাখ ১৩৩৯ সংখ্যায়। সম্পাদক আবদুল কাদির পাদটীকায় জানিয়েছিলেন প্রকাশিত অংশটি অভিভাষণের সারাংশ। আবদুল কাদিরের পুত্র সিকান্দার দারাশিকোহ তার পিতার বরাত দিয়ে বর্তমান লেখককে জানিয়েছেন যে ভাষণটির লিখিত রূপ এটুকুই ছিল। তবে সভাপতি মৌখিকভাবে এর সঙ্গে আরও অনেক কথা বলেছিলেন।

১৮. স্মৃতিকণা, *মুক্তধারা*, ১৯৮৪, পৃ. ৪৭

১৯. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্দু-ফারসি বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আবদুল্লাহ ও ড. উম্মে সালমার নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্য।

২০. আহমদ নূরুল ইসলাম, পৃ. ১৮৩-৮৪

২১. ঐ, পৃ. ১৮৪

২২. *কামোহোর (২য় খণ্ড)*, পৃ. ১৮৭-৮৮ ও ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩১-৩২

২৩. অভিভাষণ, পৃ. ১৩৬

২৪. আহমদ নূরুল ইসলাম, পৃ. ২০১

২৫. 'অবাঞ্ছিত ব্যবধান', *বুলবুল*, বৈশাখ ১৩৪৩, পৃ. ১৮

www.pathagar.com